পূজা ও সমাজ।

শ্রী অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি প্রণীত

শিলচর,

এরিয়েন প্রেসে, শ্রীনীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২১ সন।

প্রকাশক—

শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী বি, এ

হেডমাষ্টার, হাইস্কুল

ফতেহাবাদ, চট্টগ্রাম।

মূল্য ১।০

কাপড়ে বাঁধা ১॥০

প্রাপ্তি স্থান—গ্রন্থকারের নিকট (শিলচর হাইস্কুল শিক্ষক)
এই ঠিকানায় এবং আমার নিকট [illegible]োক্ত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক—

নিবেদন।

এই সামান্য পুস্তক খানিতে শিক্ষিতমহোদয়গণের কৃপাদৃষ্টিপাত হবে কি না জানি না। যদি হয়, পরম সৌভাগ্য মনে করিব। এই গ্রন্থে শারদীয় দুর্গাপূজার স্থূলতাৎপর্য্যসহকৃত আমাদের জাতীয়চরিত্র ও সমাজ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ইহাতে অনেক অভাব-ত্রুটী, ভুল-ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উদারমতি সহৃদয় সুধীগণ দয়া করিয়া গ্রন্থের সকল দোষ মার্জ্জনীয় বলিয়া মনে করিলে কৃতার্থ হইব।

বিদ্যালয়বিধায়ক বিবধ বিধান, প্রকৃতিপ্রবেশ পদার্থপরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা অত্রত্য নর্ম্মালস্কুলের অধ্যক্ষ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা সহ একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

শিলচর
১৩২১ সাল

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র শর্ম্মা।

ভূমিকা।

(গ্রন্থপরিচয়।)

গ্রন্থের নাম "পূজা ও সমাজ"। এই নাম পড়িয়া কেহ হয়ত মনে করিবেন যে, এই পুস্তকে পুরাণোক্ত পূজার বিধি ব্যবস্থা ও হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার সমালোচনা নিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের প্রতি পাদ্য বিষয় অন্যরূপ। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের পূজাপ্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে পূজার প্রকরণ ভিন্ন প্রকার। গ্রন্থকার দুর্গোৎসব পূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু সেই উৎসবের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দুর্গোৎসব কেবল হিন্দুর উৎসব নহে, ইহা বিশ্ববাসীর উৎসব। পূজার ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্রই এইরূপ উদার মত সংরক্ষিত হইয়াছে। পূজার সহিত সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উপাসকের মনপ্রাণ তাহার উপাস্য দেবতার আদর্শে গঠিত হয়। কিন্তু উপাসক যদি তাহার আদর্শদেবতাকে উপযুক্তরূপে উপলব্ধি করিতে না পারে, তবে উপাসকের অধোগতি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অধোগতির ইহাই যে একমাত্র কারণ, গ্রন্থকার তাহা উত্তমরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন্ দেবতাকে কি গুণের আদর্শ ধরিয়া কি প্রণালীতে তাঁহার প্রকৃত পূজা করিতে হয়, গ্রন্থকার তাহার উত্তম ব্যবস্থা দিয়াছেন। শ্রীপঞ্চমীর দিনে অঞ্জলি ভরিয়া পুষ্প

বিষয়

চতুর্থ খণ্ড ।

পৃষ্ঠা।

তৃতীয় খণ্ড।

সূচি পত্র।

প্রথম খণ্ড।

বিষয়

দ্বিতীয় খণ্ড।

...তে পাওয়া যায়। বহুদিন পূর্ব্বে ৺রামকমলের ... এইরূপ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পণ্ডিত ... সেই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। ... ও বিশুদ্ধ।

...াবশ্যক। জাতিতে ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ে বিষ্ণু- ... প্রতিপত্তিহীন। যাহারা গ্রন্থকারের না... বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ ... গ্রন্থখানি নাটকও নহে, নভেলও নহে, সুতরাং ... হউক, যখন ব্রাহ্মণ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থ ... উপার্জ্জিত অর্থব্যয়ে ইহা মুদ্রিত করাইয়াছেন এবং ইহার প্রচা... আমাদিগের দ্বারস্থ হইয়াছেন, তখন অন্ততঃ তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের এখনও কি এইরূপ গ্রন্থ এবং এইরূপ গ্রন্থকারের আদর করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই? অলমতিবিস্তরেণ।

নিবেদক

শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী।
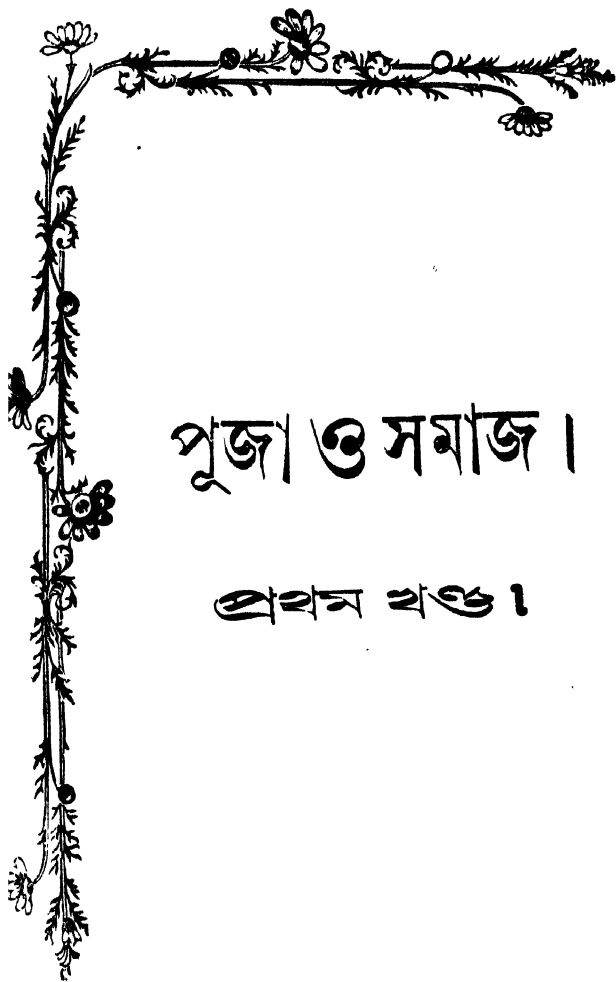
পূজা ও সমাজ।

প্রথম খণ্ড।

पूजा ओ समाज ।
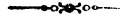
गणेशस्तोत्रम् ।

भगवन् गणेश !

ओङ्कारमिव माङ्गलिक
मर्च्चनाविधौ सुरगणाग्रवन्द्यम् ।
दिव्योज्ज्वल-कलेवरं
नमामि भवन्तं ज्ञानावतारम् ॥ १ ॥

द्वाविह महाप्रदीपौ
नभसि भानु र्बुद्धिगुहासु भवांश्च ।
स्थूलमेकेन रूपं
दर्श्यते जगतो भवताच्च सूक्ष्मम् ॥ २ ॥

अम्बर मध्यासीनो
ध्वान्तं ध्वंसयति पुनाति च लोकान् ।
ग्रहपरिवृत-ग्रहपतिः
सविता च भवान् किलान्तरम्बरस्य ॥ ३ ॥

इयमपि तेजःपुञ्जं
यस्य शिवमयशासनादक्षरस्य ।
मम-कर्म्मसु प्रवृत्तं
कर्म्मसु नोदयितृ बोधयत् सुप्तान् ॥ ४ ॥

পূজা ও সমাজ।
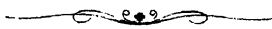
গণেশস্তোত্র।

বেদমন্ত্র-শিরে যথা মঙ্গলপ্রণব
সকল দেবের মাঝে আগে পূজা তব ;
অমল উজল বপু জ্ঞান-অবতার
নমি দেব গণপতি চরণে তোমার ॥ ১ ॥

তোমরা উভয়ে মহাপ্রদীপ শোভন,
তুমি হৃদাকাশে, অই গগনে তপন ;
তপন প্রকাশে স্থূল জগতের রূপ,
তবালোকে নরকুল হেরে সূক্ষ্ম রূপ ॥ ২ ॥

গ্রহগণ-পরিবৃত গ্রহ-অধিপতি
অম্বরে মিহির, তুমি থাকিয়া অন্তরে
দু'য়ে মিলি জগতের হর তম-স্তুতি,
পূত, আলোকিত বিশ্ব, দুই পুণ্য করে ॥ ৩ ॥

অমৃত, অক্ষর যিনি, যাঁর শিবময়
অলঙ্ঘ্য শাসনে ধর তেজোময় কায়,
নিদ্রিতে জাগায়ে কর করমে প্রেরণ,
সমব্রতী সমধর্ম্মা তোমরা দুজন ॥ ৪ ॥

तं नौमि देवदेवं
त्वत्तो विदित्वा महतो महान्तम् ।
स्थितिं विश्वस्य गतिञ्च
परां, परेशं विश्वतो विभान्तम् ॥ ५ ॥ युग्मम्

नैशं नीलनिर्म्मलं
समुदित-शशितारं नभोमण्डलम् ।
जीमूतपटलावृतं
वार्षिकं व्यनक्ति च यन्महिमानम् ॥ ६ ॥

चिरप्रसुप्तविशालः
सौम्योऽथवा तुङ्गतरङ्गभीमः ।
गुरुगम्भीरोदारं
गायति च जलधिर्यस्य महिमानम् ॥ ७ ॥

स्निग्धमरकतश्यामं
पीतपरिणतशस्याभिरामं वा ।
क्षेत्रमन्यतो मरुभू
निर्जल-द्रुमलता दग्धदारुणा ॥ ८ ॥

सिंहशार्दूलसृगाल-
वृकव्यालालूकभल्लुकाकुलम् ।
भीममपि निजरसस्य
मरण्यं व्यनक्ति च यन्महिमानम् ॥ ९ ॥ युग्मम्

দেবের দেবতা যিনি মহতের মহান্
তাঁহারে জানিতে চাই প্রসাদে তোমার,
পরাগতি স্থিতি যিনি বিশ্বের নিদান,
সেই প্রভু পরমেশে করি নমস্কার ॥ ৫ ॥

সুনীল নির্ম্মল নৈশ অনন্ত আকাশ,
অনন্ত তারকারাশি, শীতল চন্দ্রমা,
জীমূত-পটল কিম্বা করে পরকাশ
দিগন্ত ছাইয়া যাঁর অনন্ত মহিমা ॥ ৬ ॥

প্রশান্ত অথবা তুঙ্গ তরঙ্গ-ভীষণ,
চিরমুক্ত মহাকায় ভৈরব-গর্জ্জন,
গায় সিন্ধু নিরবধি অনন্ত উদার
গভীর উদাত্ত রাগে মহিমা যাঁহার ॥ ৭ ॥

মরকত মণি হেন মনোহর শ্যাম,
পরিণত পীতবর্ণ শস্যে অভিরাম,
স্থানে স্থানে ক্ষেত্র কত, কোথাও বা মরু
নিদারুণ, জলশূন্য, শূন্য লতা তরু ॥ ৮ ॥

কোথাও বা কত সিংহ-শৃগাল-শার্দ্দূল-
উলুক-ভল্লুক-বৃক-ব্যাল-সমাকুল
বনরাজি, নিজরসে সুন্দর-ভীষণ,
যাঁহার মহিমা সদা করে বিঘোষণ ॥ ৯ ॥

प्रलम्बश्मश्रुजटिलाः
प्रतिवनं नीड़निचिता महाद्रुमाः ।
योगिन इव महाव्रता
ध्यायन्ति सततं यस्य महिमानम् ॥ १०

शैलस्तुषारासार
मजस्रमशनिकरका-वृष्टिपातम् ।
प्रचण्डभञ्झातपञ्च
सहमानो रटयति यन्महिमानम् ॥ ११

प्रतिक्षणमुत्सवमयं
पृथ्वीयं विपुलं सूतिकागृहम् ।
नवजातस्मित-मधुरं
गायति च सततं यस्य महिमानम् ॥ १२

सैव लेलिहानजिह्व
मविरलप्रज्ज्वलन्महाश्मशानम् ।
अविलम्बविकटोदरं
रटयति प्रकटं यस्य महिमानम् ॥ १३

ममैव जगतः पितरं
पितरञ्च भवतो भवतः प्रसादात्
सन्तं तमोऽप्यमोघं
द्रष्टुमिच्छामीति भजे भवन्तम् ॥ १४

দীঘল প্রলম্ব জালে জটাশ্মশ্রুময়
প্রবীণ, নির্ম্মিত-নীড়-বিহগ-আশ্রয়,
বনে বনে বনস্পতি যেন তপোধন
চির-ব্রত-ধারী, যাঁর ধেয়ানে মগন ॥ ১০ ॥

শৈলরাজি শিলাবৃষ্টি অশনি-সম্পাত,
অজস্র তুষার, শীত, রৌদ্র, ঝঞ্ঝাবাত,
সহে সুখে, প্রকৃতির প্রচণ্ড পীড়নে
অচল অটল স্থির, যাঁহার শাসনে ॥ ১১

এ পৃথিবী সুবিপুল সূতিকা-আলয়,
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ মহোৎসবময়,
নব নবজাত-শিশু-স্মিত-সমুজ্জ্বল,
গাহিছে সতত যাঁর মহিমা-মঙ্গল ॥ ১২

এ বটে আবার মহা ভীষণ শ্মশান,
অবিরল জ্বালাময় জিহ্বা লেলিহান,
ক্ষুধিত অতৃপ্ত দগ্ধ উদর বিকট,
রটিছে সতত যাঁর মহিমা প্রকট ॥ ১৩

তোমার আমার পিতা, পিতা জগতের,
পর-সত্য পরমেশ পূজ্য সকলের;
তাঁরে নিরখিতে চাই তোমার কৃপায়,
শরণ লইনু আমি তাই তব পায় ॥ ১৪

चित्तवानपि मदान्धो
मोहाभिभूतोऽचेतसोऽचेताः ।
नापश्यं नवाऽभजं
हन्त क्वचिदपि तमानन्दरूपम् ॥ १५

विश्ववन्द्य वरेण्य
दर्शय विश्वशरणं मे प्रसन्नः ।
तव च पुण्यकिरणलवो
महाप्रयाणे भवतु मे सहायः ॥ १६

द्राक् प्रतिहत्य तमोऽन्धं
प्रादुर्भवतु ज्योतिर्मे दिव्यम् ।
भव भवसुत ! सुदक्षिणो
दक्षिणगति मोऽस्मभूत् देहान्ते ॥ १७

इति गणेशस्तोत्रम् ।

অচেতন হ'তে আমি হই অচেতন,
মোহমদে চির-অন্ধ, যদিও চেতন,
না হেরিনু না ভজিনু এ ভব-ভবনে
সেই চিদানন্দ রূপ কভু এ জীবনে ॥ ১৫

দেখাও দেখাও দেব! মূরতি তাঁহার,
বিশ্ব-বরণীয় যিনি বিশ্বমূলাধার ;
তব পুণ্য-কিরণের কলামাত্র, হায়!
মহাযাত্রাকালে যেন হয় হে সহায় ॥ ১৬

মহাঘোর অন্ধ তমঃ চকিতে নাশিয়া
উঠুক পরমজ্যোতি হৃদয় ভাতিয়া,
হও দেব! সুদক্ষিণ, শঙ্কর-তনয়!
দেহান্তে দক্ষিণ-গতি নাহি যেন হয় ॥ ১৭

ইতি গণেশস্তোত্র।

कार्त्तिकेयस्तोत्रम् ।

अतनुविभवस्मरहरतनूजं
मानिगजाननगणेशाग्रजम् ।
महाशक्तिपार्व्वतीप्रियसुतं
प्रणमामि पावनपावके त्वाम् ॥ १

समरेषु सुरानीकनायकं
भास्करकिरणभास्वरसायकम् ।
निर्ज्जितदुर्ज्जयदानवमल्लं
समुद्धृतत्रिदिवमहाशल्यम् ॥ २

सेनावल्लभमव्ययवीर्य्यं
स्थिरान्तः-सारमनन्तशौर्य्यम् ।
वह्निकच्छुलितललितलावण्यं
चिरपरिचिताम्लानजयमाल्यम् ॥ ३

কার্ত্তিকেয়স্তোত্র।

বিপুলবিভব স্মরহর শিব,
তুমি তনুজ তাঁহার,
জ্ঞানী গজানন দেব গণপতি,
ভ্রাতা অনুজ তোমার;
শকতিরূপিণী গিরিরাজসুতা,
তাঁর প্রিয়সুত তুমি,
পাতকীপাবন চরণে তোমার
নমি গো পাবকি! আমি॥ ১

সুরসেনাপতি তুমি মহাশূর,
রণশিরে অগ্রসর,
সহস্রকিরণ- কিরণ-ভাস্বর
করে দিব্য ধনুশর।
জিনিলা দানব মল্ল দুরজয়,
যত দেবের মঙ্গলে,
ধন্য! ত্রিদিবের মহাশল্য তুমি
উপাড়িলা ভুজবলে॥ ২

অন্তরে তোমার অমিত অব্যয়
রাশীভূত বীর্য্যসার,
অনন্ত তোমার লীলা শৌর্য্যময়
দয়িত! দেবসেনার;
উছলে উথলে ললিত লাবণ্য
বীর-অঙ্গে চিরতরে,
চিরতরে চারু অপাংশু অম্লান
শোভে জয়মাল্য শিরে॥ ৩

जितमनसिजं स्थिरनवयौवनं
सुन्दररूपगुणमुग्धभुवनम् ।
चिरविधृतभुवनहितमहाव्रतं
नमामि कुमारमुदारसत्त्वम् ॥ ४ विशेषकम्

सौन्दर्य्यरुचेः शुचिरुचिरुचिरं
शचीपतिचापचित्रकलापम् ।
भुवि तव प्रेषयेति मयूरं
याचे भगवन् प्रणयसहचरम् ॥ ५

तवेह विचरतु वाहनं क्षणं
माभूदिति खलभुजगदंशनम् ।
नालं पारीक्षिन्नाहिसत्रं
भंक्तुं तेषां वत विषदन्तम् ॥ ६

অনঙ্গে জিনিয়া লভিলা কুমার!
চির-নবীন যৌবন,
উদার-সুন্দর রূপে গুণে তব
মোহিত তিন ভুবন,
জীবন ব্যাপিয়া ত্রিভুবন-হিত
ব্রত মহান্ উদার,
মহাসক্ত তুমি, চরণে তোমার
দেব! করি নমস্কার ॥ ৪

শোন সুরবর! সুষমা-রসিক!
করি এ মিনতি পায়,
প্রিয় সহচর তব শিখিবর,
পাঠাও তাহারে ধরায়;
ইন্দ্রধনু হেন সে শিখি-কলাপ
রঞ্জিত নানা বরণে,
উজলিত চারু কান্তি তার, তারে
পাঠাও ভবভবনে ॥ ৫

ক্ষণেকের তরে থা'ক ধরাপরে
প্রিয় বাহনপ্রবর,
হইবে কুঞ্চিত দংশনে বিরত
খলরূপী বিষধর;
পরীক্ষিৎসুত- অত্রিসত্রে কত
ভুজঙ্গ হইলা হত,
খল-ভুজঙ্গের বিষদন্ত হায়!
রৈল অটুট অক্ষত ॥ ৬

তারকমিব নিপীড়িতস্বর্গং
মমাধিবসন্তং হৃদয়দুর্গম্ ।
কামং নাম কর্ম্মণা ক্রূরং
জহি সুর ! হরসূনো ! মহাসুরম্ ॥ ৭

অপহর হরসুত হৃদয়দৌর্ব্বল্যং
বিতর চ সুচরিত্র ! চরিত্রবলম্ ।
কুর্ব্বন্ যেন কর্ম্ম করণীয়ং
পরার্থজীবনং যাপয়েয়ম্ ॥ ৮

হিতায় জগতামনন্যকামঃ
শক্তিং যাচে মা ভব বামঃ ।
পিতরৌ জগতাং যথা চ ভবতঃ
ভবতাং প্রসন্নৌ মম বৃত্ততঃ ॥ ৯

ইতি কার্ত্তিকেয়স্তোত্রম্ ।

দানবের পতি পাপিষ্ঠ তারক,
যার নিঠুর পীড়নে
ব্যথিত কাতর ত্রিদিব ত্রিদশ,
তাহারে বধিলা রণে;
তেমতি সংহার কর হরসূনু!
কামরূপী মহাসুরে
ক্রূরকর্ম্মা সেই করি অধিকার
বিরাজে এ হৃদিপুরে ॥ ৭
ঘুচাও দীনতা এ হৃদে আমার
এই প্রার্থনা কেবল
পুণ্যশীল তুমি মহাশক্তিশালী
দেও হে চরিত্র-বল;
চরিত্রের বলে পালিব ধরম,
সাধিব করম যত,
পরার্থে জীবন করিব যাপন,
সার্থক হইবে ব্রত ॥ ৮
জগতের হিত সতত কামনা,
কামনা নাহিক আন,
সাধিতে শকতি মাগি তব ঠাঁই,
মোরে হওনাক বাম,
বিশ্বজগতের জনকজননী,
জনকজননী তব,
চরিত্রে আমাব যেন তুষ্ট রয়,
এ হেন বিধান কর ॥ ৯

ইতি কার্ত্তিকেয়স্তোত্র।

लक्ष्मीस्तोत्रम् ।

मातर्लक्ष्मि !

अकिञ्चिदपि ते प्रयाचमान-
श्चरणे मनसाऽवतिष्ठमानः ।
अकिञ्चनोऽहं शिरसा नत्वा
वन्दे बद्धवचनाञ्जलिस्त्वा ॥ १

मय्यकृपां भवतीं श्रयमाण
श्चिरञ्च भारती मभजमानः ।
अपूर्णकामोऽसेवितधर्म्मा
सर्व्वथाऽहतो न लभे शर्म्म ॥ २

লক্ষ্মীস্তোত্র।

মা লক্ষ্মি!

নতশিরে, নতমনে,
তব চরণে,
অঞ্জলি রচিয়া, ক্ষুদ্র
ক'টী বচনে,
দৈন্য লয়ে, হরিপ্রিয়ে!
করি বন্দনা,
নাই কিছু, করিনা'ক
কিছু প্রার্থনা॥ ১

চিরদিন করিয়াছি
পদে অর্চ্চনা,
কোন দিন কর নাই
মোরে করুণা।
ভজি নাই মনসাধে
ভারতী দেবী,
পালি নাই ধর্ম্ম, হায়!
তোমারে সেবি,
মিলিল না স্বস্তি-সুখ,
জীবনে কেবলি দুখ,
পূরিল না কোন আশা,
বাসনা যত,
সকল রকমে আমি
অভাগা হত॥ ২

तथापि किञ्चिदिष्यते वक्तुं
क इहार्हति त्वदन्यः श्रोतुम् ।
वृद्धैर्नवमिति नोपादेयं
नव्यैरपि संस्कृतमिति हेयम् ॥ ३

को न वेद देवि ते प्रभावं
लघुरपि येन याति गुरुभावम् ।
मृदुमधुरभाषी भवति मूकः
कवयति खलु येन चाजमूर्खः ॥ ४

कोकिलायते किल वाचालः
सिंहायते च मनुजशृगालः ।
वाच्योऽपि च याति प्राशस्त्यं
त्वदनुकम्पित इति ध्रुवसत्यम् ॥ ५

তথাপি তোমারে কিছু
কহিবার আছে,
তোমা বিনা ক'ব আর
কাহারই কাছে?
শুনিবে দীনের কথা
আছে হেন জন কোথা?
উপেখিবে নবজ্ঞানে
প্রবীণ-দলে,
নব্যদলে অনাদর
সংস্কৃত ব'লে॥ ৩

কেবা নাহি জানে দেবি!
তব মহিমা?
লঘু, লঘুতর, কত
লভে গরিমা।
বোবা তবু মিষ্টভাষী
বক্তা হয় সে,
কবি নাম ধরে সেই
অজমূর্খ যে॥ ৪

বাচালের কণ্ঠে পিক-
স্বরলহরী,
নরে যে শৃগাল বটে,
সেই কেশরী,
নিন্দনীয় পাপী পায়
পূজা আদরে,
ধ্রুবসত্য এ সকল
তোমারি বরে॥ ৫

अशनं वसनं विद्यास्वादं
लभेत कस्तव विना प्रसादम् ।
त्वदधीनं धनमूलं सौख्यं
गृहिनामधुना तथाहि सख्यम् ॥ ६

समृद्धये धनकनकसमृद्धा
दीनास्तरुणास्तथा च वृद्धाः ।
सेवन्ते त्वां सततं सर्व्वे
लोकेऽस्मिन् वर्द्धितधनगर्व्वे ॥ ७

सुतः पितरं भ्रातरं भ्राता
विहाय पूज्यं यौवनमाप्तः ।
मन्यमान इव तव तु छायां
हैमकुसुमैरर्च्चयति जायाम् ॥

অশন, বসন, বিদ্যা
বিদ্যাভবনে,
কে পারে লভিতে তব
কৃপা বিহনে ?
বিষয়-সুখের মূল,
বন্ধুতার অনুকূল,
ঐশ্বর্য্য, বিভব, সব
তোমারি করে,
ভোগস্বার্থে গৃহী এবে
তোমারে বরে ॥ ৬

ঋদ্ধি-তরে ঋদ্ধিমান্
ধন-কনকে,
দীন, যুবা কিবা বৃদ্ধ,
এ মর্ত্ত্যলোকে,
সতত তোমারে দেবি !
সেবে সকলে,
ধনে মত্ত, গরবিত,
ধনেরই বলে ॥ ৭

উদ্দাম-যৌবন-বশে,
মজিয়া বিষয়-রসে,
সহোদরে সহোদর
পুত্র পিতারে,
নাহি পূজে পূজনীয়
স্নেহ-আধারে ;
মনে ভাবি বুঝি তব
জীবন্ত ছায়া,
হেমফুলে অর্ঘ্য রচি
অর্চ্চয়ে জায়া ॥ ৮

लोकस्तव वत मायामुग्ध
श्चपलाचञ्चलकाञ्चनलुब्धः ।
काङ्क्षति नो माधवपदरत्नं
स्निग्धशीत मनर्घमनवद्यम् ॥ ८

पण्याङ्गनासङ्गीतशाला-
बहुलमणिमण्डितहर्म्म्यमाला: ।
अङ्केषु येषां विभान्ति तेषु
निशि निशि विद्युद्दीपोज्ज्वलेषु ॥ १

হায়! মর্ত্ত্যবাসী তব
মায়া-বিমুগ্ধ,
চপলা হেন চঞ্চল-
কাঞ্চন-লুব্ধ,
প্রেমময় মাধবের,
কিম্বা রমা! উমেশের
অনন্ত পদ-রত্ন
শীতল-কান্ত,
করে না'ক আকিঞ্চন
চিত-বিভ্রান্ত। ৯

রাজে ধরামাঝে কত
কত নগরী,
নগরে নগরে কত,
সৌধমালা শত শত,
মণ্ডিত রতনে, শোভে
শূন্য বিদারি;
রাজে ধরামাঝে কত
কত নগরী।
শোভে কত নাট্যশালা,
বিদ্যুতের দীপমালা,
উজলিয়া দশ দিশি
প্রতি রজনী,
প্রতিনিশি বারাঙ্গনা-
সঙ্গীতধ্বনি! ॥ ১০

मनोहरपण्यवीथिषु पुरेषु

धनजनरथगजहयप्रायेषु ।

पौरा दीनदुर्लभानिष्टान्

त्वत्प्रसादात् भुञ्जते भोगान् ॥ ११ युग्मम् ।

कुटिलगति समुच्छ्रितमाश्चर्य्यं

तथेदमूर्जस्वलमैश्वर्य्यम् ।

रविबिम्बमिव तुदति मे नेत्रं

तिमिरदुष्टमभिमुखगतमात्रम् ॥ १२

কত গাড়ী, হয়, হাতী,
কত জনতা,
কত পণ্য মনোহারী,
সজ্জিত সারি সারি,
কত বা বিপণি, ক্রেতা,
কত ব্যস্ততা,
কত বা ঐশ্বর্য্য, ধন,
কত মত্ততা!
হেন পুরে পুরবাসী
তব প্রসাদে,
ভুঞ্জে কত সুখ সদা
মনের সাধে,
দীন জন যাহা নাহি
কভু আস্বাদে ॥ ১১

ঊর্দ্ধে, অতি ঊর্দ্ধে গত,
মধ্যাহ্ন-ভানুর মত,
ঐশ্বর্য্যের ঝলমল
কিরণ-ছটা,
বিচিত্র, অরাল-গতি
বিলাস-ঘটা,
এ দুটী নয়ন, হায়!
তাকাতে না পারে তায়,
অমনি ফিরিয়া আসে
চায় যখনি,
কাতর, তিমিররোগে
ঝলসে মণি! ॥ ১২

अलिकुलचुम्बितकमलमण्डिते
कमलासने ! तव पदलाञ्छिते ।
अधः सरसि चाभिवर्त्तमानं
भवति विज्वरं विदग्धनयनम् ॥ १३

चन्द्रकरपुलकितकुमुदे सरसि
दिशि दिशि निशि तारकिते च नभसि ।
नीलनिर्म्मले पदाङ्कलक्ष्मी
हरति मनो मे मातर्लक्ष्मि ! ॥ १४

ভ্রমর-চুম্বিত-
কমল-মণ্ডিত
সরসে, যখন
এ দগ্ধ নয়ন,
ঊর্দ্ধ হ'তে নীচে
ফিরিয়া চায়,
কমল-আসনে,
কমল-চরণে,
তব দেবি! রমা!
শীতল সুষমা
নিরখি নিরখি
অমনি জুড়ায়॥ ১৩

নীল-নির্ম্মলে
নভোমণ্ডলে
অনন্ত তারা,— পদাঙ্ক তব
রাজে, রাজে যামিনী;
নীল-নির্ম্মলে
সরসী-জলে
শশাঙ্ক-কর-পরশে হাসে
কুমুদিনী হ্লাদিনী।
নাহি উপমা,
হেন সুষমা,
মম চিত্ত-হারিণী,
অয়ি লক্ষ্মি জননি!॥ ১৪

व्रततीषु नवपल्लवाधरासु
सुकुमारकुसुमालङ्कारासु ।
तरुवल्लभासु कुञ्जवनान्ते
लोचनानि केषां न रमन्ते ॥ १५

यतिगृहमेधिनो होमगेहे
श्रुतशीलमहतः पूतदेहे ।
उषाया इव मुखे च सत्याः
या श्रीस्तां त्वां नतोऽस्मि भक्त्या ॥ १६

বনে বন-সুন্দরী,
প্রণয়িনীবল্লরী-
নব-নধর-পল্লব-
অধর শোভা,
সুন্দর ফুল-ভূষণ
মানস-লোভা,
নিরখি, নিরখি
প্রণয়ী শাখী,
তিরপিত, প্রীত,
কার না আঁখি? ॥ ১৫

ধর্ম্মে রত, জ্ঞানবান্,
পূত-চরিত্র, মহান্,
হেন সাধু-গৃহস্থের
পূজা-মন্দিরে,
হেন গৃহী-সন্ন্যাসীর
পুণ্য শরীরে,
সতীনারী মুখে, আর
মুখে অরুণ-উষার,
কান্তি রূপে রাজ তুমি
কান্তি-রূপিণি!
ভক্তিভরে ও চরণে
নমি জননি! ॥ ১৬

प्रजातजन्यजायमानानां
जगतीह पुंयोषित्प्रजानाम् ।
जयाभ्युदयविधौ विष्णुजाया
त्वमसि हि भर्त्तुरेकः सहायः ॥ १७

भवधव मनाथनाथं वन्दे
प्रणतश्चारुचरणारविन्दे ।
द्रष्टुमिच्छामि हि तं प्रसन्नं
त्वया समं मम मनसि निषस्मम् ॥ १८

इति लक्ष्मीस्तोत्रम् ।

এ জগতে নরনারী
সহস্র শত,
হয়েছে, হতেছে, আর
হইবে যত,
তাদের কল্যাণে, কিবা
উন্নতি-তরে,
পতি তব মহাব্রতী,
তুমি হরিপ্রিয়া সতী
একেলা সহায় হও
মঙ্গল-করে ॥ ১৭

অনাথের নাথ যিনি
ত্রিলোক-স্বামী,
চারু-পাদ-পদ্মে নত
বন্দি মা! আমি,
বাঞ্ছা, সেই দেবদেব
রাজে হৃদয়ে,
রাজে তব সনে যেন
প্রসন্ন হ'য়ে ॥ ১৮

ইতি লক্ষ্মীস্তোত্র।

भारतीस्तोत्रम् ।

नमस्ते भारति जननि !
कविकुञ्जचारिणि !

युगे युगे नवीने नववेशधारिणि !
युगे युगे सवीणे जनमनोमोहिनि !

शुभ्रवराननकौमुदी-
स्नातपूतपुलकिता भवति जगती
युगे युगे त्वं हि कवि-जननी ।

विना तव करुणा मधुना
हा हन्त कविता सुदीनाऽशरणा,
कुरु कृपादृष्टिं वाणि जननि ;

नदतु तव सुललिततन्त्री
नवरागतानं श्रमतापहन्त्री
कुञ्जकानने कलनादिनी,
सञ्जीवनी, ह्लादिनी ।

निषीद देवि मे हृदये,
स्निग्धनिर्म्मलप्रेमेन्दोरुदये
जयगीतिं हि गास्यामि जननि !

ভারতীস্তোত্র।

নমি ভারতি জননি!
কবিকুঞ্জচারিণি!

যুগে যুগে নবীনা নববেশধারিণী,
যুগে যুগে বীণাকরে মানসমোহিনী,

বরাননকৌমুদী-
আলোকিত জগতী
পুলকিত, যুগে যুগে ত্বং হি কবি-জননী।

বিনা তব করুণা
কবিতাশ্রী মলিনা,
চাহ কৃপানয়নে, জননি!

বাজাও বীণা মধুরে,
নবরাগে, উদারে,
কুঞ্জকাননে কলনাদিনী,
শ্রমতাপদুঃখহরা, সঞ্জীবনী, হ্লাদিনী।

উর দেবি! হৃদয়ে,
প্রেম-শশি-উদয়ে
জয়গীতি গাহিব, জননি!

ত্রিকালত্রিভুবনবন্দ্যে
শারদে বরদে প্রণতোঽভিবন্দে
ব্রহ্মকলা-কারুণ্য-রূপিণি !
জয় জয় ব্রহ্মবাদিনি !

প্রার্থনা ।

সুচরিতপুণ্যং সন্নীতিপূর্ণং
কাব্যমিব শান্তবীরকরুণরসাশ্রয়ম্,
ঊর্দ্ধ গগনচারি- নির্ম্মলঘনবারি-
লালসচাতকস্যেব সঙ্গীতময়ং
কুরু মম জীবিতং জননি !
প্রসীদ সুদীনে জননি !

কুরু মম জীবিতং প্রসূনিত-ফলিতং
তরোরিব ফলচ্ছায়াবিতরণনিরতম্ ;
দিশি দিশি ধাবিতং বিহিতভুবনহিতং
স্রোত ইব কৃতকৃত্যং সাগরসঙ্গতং ;
অভয়ামৃতপদগতিরতি
কুরু চ জীবিতং ভারতি !

ইতি ভারতীস্তোত্রম্ ।

ত্রিভুবন-বন্দিতা,
তুমি চির নন্দিতা,
নমি পদে বরদে জননি!
জয় জয় ব্রহ্মকলা-রূপা-রূপিণি।

প্রার্থনা।

পুণ্যদেব চরিত-সুনীতিভরা,
শান্তবীরকরুণরসেরই ঝরা,
সুকাব্য হেন, এ দীন জীবন
কর গো জননি অয়ি বীণাপাণি!
নির্ম্মলঘনবারি চাতক চাহে,
ঊর্দ্ধনভবিহারী আনন্দে গাহে,
এ শুষ্ক জীবন, সঙ্গীতময়
কর গো তেমতি ভারতি জননি!
পর-তরে জীবিত, প্রসূনিত-ফলিত,
রাজে তরুরাজি, রাজে কারুণ্য,
ফল ছায়া বিতরে; তেমতি তব বরে
হয় যেন এ জীবন জীব-শরণ্য;
দিশি দিশি ছুটিয়া ধরা-হিত সাধিয়া,
সাগরে মিশিয়া তটিনী ধন্য,
অভয়পদে অমৃত হ্রদে
কর জীবনের গতি-রতি পুণ্য,
ঘুচায়ে দৈন্য।

ইতি ভারতীস্তোত্র।

জগদম্বাস্তোত্রম্ ।

নমস্তে জননি বিশ্বজননি !
কারুণ্যরূপিণি বিশ্বব্যাপিনি !

সুবিমলং গগনং সরিতাশ্চ সলিলং
বিকচকমলামোদি মেদিনীতলম্ ।
ইহ তু শরদি মে হৃৎকমলকুড্মলং
বিকাসয় নিধায় তে চরণযুগলম্ ॥ ১

রাজরাজেশ্বরি হি রাজীবপদং
দৃষ্টং যদি তব, তুচ্ছং রাজপদম্ ।
ইহ কৈব কেবলানন্দ-স্ফূর্ত্তিঃ
রাজতে যদি হৃদি তব চারুমূর্ত্তিঃ ॥ ২

হুতাশনো দহতি বহতি বা পবনো
বারিদো বর্ষতি তপতি বা তপনঃ ।
সর্ব্বমিহ কর্ম্মণি প্রবর্ত্তমানং
হেতুরত্র তব তবাধিষ্ঠানম্ ॥ ৩

জায়তে পুনঃ প্রলীয়তে নিত্যং
সর্ব্বমনিত্যং ত্বমসি বস্তু নিত্যম্ ।
নোদ্ভিন্নং যে সৃষ্টিলয়রহস্যং
জানে দ্রষ্টুং কিমিবাসি নমস্যম্ ॥ ৪

জগদম্বাস্তোত্র।

নমি পদে জননি! বিশ্বজননি!
তুমি কৃপারূপিণী বিশ্বব্যাপিনী।

নভঃ, নদী-জল এবে প্রসন্ন-বিমল,
বিকচ কমলে আমোদিত ধরাতল;
দেও দেবি দয়াময়ি! চরণযুগল,
ফুটুক শরতে মম হৃদয়-কুট্মল॥ ১

তুচ্ছ রাজপদ, যদি পাই দরশন
রাজ-রাজেশ্বরি! তব রাজীবচরণ;
বহিবে আনন্দধারা না জানি কেমন!
জাগে যদি হৃদে, তব মূরতি মোহন॥ ২

দহে হুতাশন কিবা বহে সমীরণ,
বরষে বারিদ, রবি বিতরে কিরণ;
অধিষ্ঠান কর তুমি সবার ভিতর,
যে যার কাযেতে তাই রত নিরন্তর॥ ৩

নিত্য আসে যায় ভবে অনিত্য সকল,
নিত্য, সনাতন তুমি,—তুমিই কেবল;
বুঝি না সৃজন-তত্ত্ব প্রলয়-রহস্য,
জানি পূজ্যতমা তুমি আমার নমস্য॥ ৪

न योगं यागं नच वेद वेदं
जीव-परात्मनोर्न वेदाभेदम् ।
त्वां वेद जननीं न प्रकृति-पुरुषं
दयामयि ! मयि मूढ़े मा कुरु रुषम् ॥ ५

न जाने ते पितरौ न मे भीति
स्तव देवि ! चरणे भवेद् यदि भक्तिः ।
सरूप मरूपमिति वा ते स्वरूपं
विचारणं शिशोर्न मे युक्तरूपम् ॥ ६

न जाने सत्यं तव देवि ! तत्त्वं
जाने तथ्यं मातासि मम त्वम् ।
न जाने मूलं न चापि ते कुलं
जाने त्वं खलु निखिल-विश्व-मूलम् ॥ ७

याचे परमेश्वरि भगवति दुर्गेऽ
वतरेह वर्त्तसे यदि वै स्वर्गे ।
विभूषय प्रेम्णाऽखिल-नर-हृदयं
विरचय त्रिदिव मिह च देवि ! सदयम् ॥ ८

নাহি জানি যোগ, যাগ, নাহি জানি বেদ,
জীবে শিবে কিম্বা কভু জানি না অভেদ,
কে প্রকৃতি কে পুরুষ কিছুই না জানি,
মূর্খ আমি, জানি শুধু তুমিই জননী,
দয়াময়ি অয়ি দেবি! করি এ মিনতি
ক'রনা ক'রনা রাগ অবোধের প্রতি॥ ৫

কে তোমার মাতা পিতা যদিও না জানি,
কি ভয় আমার তাহে হে বিশ্বজননি!
সরূপ স্বরূপ তব কিম্বা রূপহীন,
এ বিচার তনয়ের নহে সমীচীন;
তোমার চরণে যদি
ভক্তি থাকে নিরবধি,
ভয় কি আমার তবে বল ভবরাণী!
তোমার স্বরূপতত্ত্ব যদিও না জানি॥ ৬

তোমার স্বরূপ তত্ত্ব জানি না'ক আমি,
জানি এইমাত্র সার মা আমার তুমি;
জানি না তোমার মূল, নাহি জানি কুল,
জানি—তুমি এ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূল॥ ৭

এস দেবি ভগবতি অয়ি বিশ্বরমে!
স্বরগেই থাক যদি এস তবে নেমে;
বিশ্বমানবের বুকে দেও প্রেম-হার,
কর মা স্বরগ সৃষ্টি এ ভবে তোমার॥ ৮

नहि याचे रूपं चपला-तरलं
याचेऽन्तःकरणवशीकरणबलम् ।
न कुलं न पदं न च याचे वित्तं
शारदजलमिव याचेऽमलचित्तम् ॥ ९

याचे कामासुरदलने शक्तिं
न वै पर-हिंसा-पर-चित्तवृत्तिम् ।
याचे नान्नं धान्यादि-विकारं
याचे चान्नं चिरसुन्निवारम् ॥ १०

याचे खलु बाल-सरल-स्वभावं
न च परिणत-परिचित-परात्म-भावम् ॥
न याचे सुरासुरवाञ्छितनाकं
याचे जननि तवामृतमयमङ्कम् ॥ ११

इति जगदम्बास्तोत्रम् ।

চাই না'ক রূপ, তাহে কিবা প্রয়োজন,
এই হাসে আর নাই বিজুলী যেমন;
দেও মা শকতি হেন দেও বল মনে,
রণে জয়ী হই যেন ইন্দ্রিয়ের সনে।
চাই না'ক কুল মান, চাই না বিভব,
চাই না লভিতে কিম্বা পদের গৌরব,
চাই দেবি দয়াময়ি! চিত্ত নিরমল,
স্বচ্ছ অনাবিল যথা শরতের জল ॥ ৯

চাই না'ক মনোবৃত্তি হিংসাপরায়ণ,
চাই শক্তি কামাসুরে করিতে দলন;
বর মাগি তব ঠাঁই—
হেন অন্ন যেন পাই,
চির-তরে ক্ষুধা তৃষ্ণা করে পলায়ন,
চাই না মা তবে আর পার্থিব ওদন ॥ ১০

চাই মা শিশুর শুদ্ধ সরল স্বভাব,
চাই না'ক কুটিলের আত্ম-পর-ভাব;
চাই না অমরা, যার সুষমা অতুল,
পাই যদি মা তোমার সুধামাথা কোল ॥ ১১

ইতি জগদম্বাস্তোত্র।

शिवस्तोत्रम् ।

ओं परमात्मने नमः

ओं शिवाय शान्ताय नमः ।

पितुरपि पिता मातुश्च माता
गुरुरसि गुरोस्त्वं ज्ञानदाता ।
विभुरपि विभोर्धातुश्च धाता
नरपतिपतिस्त्वं विश्वपाता ॥ १

अणुरपि महीयांस्त्वं त्वमेक
स्त्वमसि च गतो व्यक्तीरनेकः ।
स्वयमपरिणामो विश्वदेहो
विचरसि सदा विश्वे विदेहः ॥ २

अवतरसि काले त्वं हि लोके
निपतति यदाऽयं दुःखशोके ।
विशसि नृषु हन्तुं शक्तिरूपः
सदयमिह भूभारानरूपः ॥ ३

प्रकृतिरिति या ख्यातोत माया*
तव भगवतः शक्तिस्त्वमेया ।
त्वमसि खलु शक्तिः शक्तिमांस्त्वं
सृजसि हरसि त्वं पासि नित्यम् ॥ ४

---

* ख्याता+उत इति सन्धिविच्छेदः ।

শিবস্তোত্র।

হে ব্রহ্মন্! তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমিই পিতার পিতা, মাতার মাতা। তুমিই জ্ঞানদাতা গুরু, গুরুর পরমগুরু। তুমি প্রভু, প্রভুরও প্রভু তুমিই। তুমিই বিধাতার বিধাতা; তুমিই রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী, সার্ব্বভৌম সম্রাটের সম্রাট্; তুমিই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় পালয়িতা॥১

তুমি সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম, মহান্ হইতেও মহান্। তুমি এক, অদ্বিতীয়; এক হইয়াও আবার অনেক; অব্যক্তাবস্থায় এক, ব্যক্তাবস্থায় অনেক। হে ব্রহ্মন্! যদিও তোমার শরীর নাই, তথাপি তুমি শরীরী, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই তোমার শরীর। তুমি এই বিশ্বে অনন্তকাল বিচরণ করিতেছ অথচ বিশ্বের ন্যায় তোমার কিছুমাত্র পরিণাম বা বিকার নাই॥২

হে ভগবন্! যখন পৃথিবীর লোকসকল শোকে দুঃখে নিপতিত হয়, তখনই তুমি অবসর বুঝিয়া ধরাতে অবতীর্ণ হইয়া থাক। তুমি শক্তি-রূপে, লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া লোকের শোক, তাপ, দুঃখভার হরণ করিয়া থাক॥৩

সাঙ্খ্যকার যাহাকে প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন অথবা বেদান্ত-দর্শনে যাহা মায়া বলিয়া অভিহিত হইয়াছে তাহা তোমারই শক্তি। হে ভগবন্! তোমার সেই শক্তি অপরিমেয়, মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। প্রকৃতিই হউক আর মায়াই হউক, তাহা তোমার সেই শক্তির নামান্তর মাত্র, অন্য কিছু নহে। শক্তি তোমারই, আবার তুমিই শক্তি, তুমিই শক্তিমান্। তুমি সেই শক্তিসহযোগে প্রতিনিয়ত এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাক॥৪

क्वचिदपि विना हेतुं न कार्य्यं
गुणगुणिषु सिद्धं साहचर्य्यम् ।
जगति रचिते हेतुश्च शक्ति
स्त्वमसि हि स य स्तद्वान् स्वतोऽस्ति ॥ ५

त्वमिदमहमन्नेयश्च नेदं
त्वमसि तदपि ज्ञेयोऽतिवादम् ।
पुनरकरणो ज्ञातासि च त्वं
त्वमनुपहितं ज्ञानं समस्तम् ॥ ६

अमृतमसि कृत्स्नं मङ्गलं त्वं
त्वमसि च परं सत्यं शरण्यम् ।
अधिवससि भक्तान्तर्निकुञ्जं
त्वमसि परमात्मन् पुण्यपुञ्जम् ॥ ७

त्वमसि हि पुरस्तात् त्वञ्च पश्चात्
सततमध ऊर्द्ध्वं त्वं समन्तात् ।
त्वमसि च वहिर्गुह्ये च गुह्यात्
त्वमतिनिकटे दूरेऽपि दूरात् ॥ ८

বিনা কারণে কোথাও কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, কার্য্য থাকিলেই কারণ থাকিবে। কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান যুক্তি ও বিজ্ঞান-সম্মত। আবার গুণ ও গুণীপদার্থে নিত্যই সহচরভাব বা অবিনাভাব সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। গুণ আছে গুণী নাই, ধর্ম্ম আছে ধর্ম্মী নাই, অথবা গুণী আছে গুণ নাই, ধর্ম্মী আছে ধর্ম্ম নাই—এরূপ হইতে পারে না, ইহা প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ। জগৎ সৃষ্টপদার্থ, কেননা জাগতিক প্রত্যেক পদার্থেরই উৎপত্তি, স্থিতি, ও ধ্বংস এই অবস্থাত্রয় পরিদৃষ্ট হয়। জগৎ সৃষ্ট পদার্থ—অতএব কার্য্য। কার্য্য থাকিলেই কারণ থাকিবে; এই জগতের কারণ কে? সর্ব্ববাদিসম্মত উত্তর—শক্তি। শক্তি একটী গুণ বা ধর্ম্ম। শক্তি থাকিলেই শক্তিমান্ থাকিবে। সেই শক্তি যাঁর, তিনিই তুমি। তুমি কোথা হইতে শক্তি পাইলে? কোথা হইতেও পাও নাই, শক্তি তোমার নিজস্ব, স্বভাবসিদ্ধ ॥ ৫

হে ব্রহ্মন্! তুমিই অহং অর্থাৎ অহংজ্ঞানাভিমানী জীবাত্মা। তুমি ইদং-পদবাচ্য অর্থাৎ এই চরাচরবিশ্ব তুমিই, অথচ তোমাকে ইদং-পদবাচ্য বলা যাইতে পারে না, কেননা এই দৃশ্যমান জগৎ ছাড়িয়াও তোমার সত্ত্বা রহিয়াছে। আমাদের ন্যায় তোমার কোন ইন্দ্রিয় নাই, অথচ তুমি জ্ঞাতা, সর্ব্বজ্ঞ। জ্ঞাতা বলিলেও আপেক্ষিকত্ব থাকে, তাই বলি তুমি এক অখণ্ড অনুপহিত জ্ঞানরাশি। তুমি অজ্ঞেয় হইয়াও জ্ঞেয়, কিন্তু তর্কের দ্বারা নহে; তুমি যে তর্কের অতীত ॥ ৬

হে পরমাত্মন্! তুমি অমৃত, তুমি মঙ্গল, তুমি পরম সত্য, শরণ্য, তুমি পুণ্যপুঞ্জ। তুমিই অমৃত, মঙ্গল সত্য এবং পুণ্যরূপে ভক্তের হৃদয়নিকুঞ্জে বাস করিয়া থাক ॥ ৭

সম্মুখে তুমি, পশ্চাতে তুমি, অধোতে তুমি, ঊর্দ্ধে তুমি, তুমি সর্ব্বত্র সতত বিরাজমান। বাহিরে তুমি, অন্তরে তুমি, তুমি নিকট হইতেও অতি নিকটে, দূর হইতেও অতি দূরে। ভগবন্! তোমার মহিমা অনন্ত ॥ ৮

नहि कृतिकृतस्तुत्यापि तोषो
भवति भवतोऽस्तुत्या न रोषः ।
मलिनयति चित्तं चाटुवादः
स्तवन इह दिव्यात्मप्रसादः ॥

स्तवनमननध्यानेन पूर्णं
विकलयति लोकस्त्वामपूर्णः ।
न तव किमुपास्तेरन्यथात्वं
ख-कुसुममिव ब्रह्मन्नसत्यम् ? ॥ १०

कलुषितमतिः क्षन्तव्य ईश
स्तवन इति मे याचे स दोषः ।
कमिह शरणं यामि त्वदन्यं
हर मम परात्मन्नात्मदैन्यम् ॥ ११

विशतु तव वाणी कर्णमूलं
मनतु रसना ते नाम पुण्यम् ।
नयनमपि पश्येत् त्वां समन्तात्
नमतु च मनस्त्वां त्वत्प्रसादात् ॥ १२

इति शिवस्तोत्रम् ।

হে ব্রহ্মন্! কোন্ কৃতীব্যক্তি স্তব করিয়া তোমাকে প্রসন্ন করিতে পারেন? স্তব করিলেও তুমি সাধারণ মানুষের ন্যায় সুখী হইবে না, স্তব না করিলেও তুমি রাগ করিবে না। তবে তোমার স্তব করা কি নিরর্থক? না, তা নয়। লোকে ইহা দেখা যায় যে, চাটুবাদ চাটুকারের মনকে মলিন করে, কিন্তু তোমার স্তব করিলে দিব্য আত্মপ্রসাদ জন্মে, অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হয়॥ ৯

তুমি পূর্ণ, অনন্ত; মানব অপূর্ণ, সান্ত। অপূর্ণ মানব পূর্ণের সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারে না, তাই তাহারা তোমার স্তব, ধ্যান ও মনন করিতে যাইয়া তোমাকে বিকল করে অর্থাৎ তোমার অংশমাত্রই গ্রহণ করে,— অসীমকে সসীম করে, দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ করে, অমূর্ত্তের মূর্ত্তি গঠন করে। এইরূপ সর্ব্ববিষয়ে সীমাবদ্ধ না করিয়া তোমার ধ্যানাদি করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক নয় কি? ॥ ১০

আমার চিত্ত অত্যন্ত কলুষিত, আমি ত তোমার স্বরূপ ধারণা করিতে একান্ত অক্ষম। আমি তোমার স্তব করিতে যাইয়া তোমার নিকট যে অপরাধে অপরাধী, সেই অপরাধ ক্ষমা করিও এই ভিক্ষা চাই। হে পরমাত্মন্! তুমি ব্যতীত আর কাহার শরণ লইব? আমার দীনতা দূর কর॥ ১১

হে পরমাত্মন্! হে ভগবন্! আমি তোমার নিকট ইহাই ভিক্ষা চাই যেন তোমার মধুর বাণী আমার কর্ণকুহরে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, আমার রসনা যেন সর্ব্বদাই তোমার সুধামাখা নাম জপ করিতে থাকে, আমার নয়ন দুটী যেন তোমার ভুবনমোহনরূপ জগতের প্রতি পদার্থে অহরহঃ দেখিতে পায়, আর আমার মন যেন তোমারই দয়ায় তোমারই চরণে নিয়ত প্রণত থাকে॥ ১২

ইতি শিবস্তোত্র।

পূজা ও সমাজ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দুর্গোৎসব।

শারদীয় দুর্গাপূজা বঙ্গের অতুলনীয় মহোৎসব। আজ সেই উৎসবের দিন সমাগত। কি একটা আনন্দপ্রবাহে আজ সমগ্রদেশ প্লাবিত। প্রকৃতিদেবী যেন সেই উৎসবে যোগদান করিয়া কি এক অপূর্ব্ব পবিত্র শোভা বিস্তার করিতেছে। প্রসন্নসলিলা সরসীর বক্ষে ঢল ঢল প্রফুল্ল-কমল মৃদুমারুতহিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে। স্থলপদ্ম, শেফালিকা প্রভৃতি কুসুম ফুটিয়া ভূমিভাগ আমোদিত করিতেছে। বর্ষার সেই বারিধারা নাই, তুমুল করকাসম্পাত নাই, অশনির ভীষণ গর্জ্জন নাই, জলপ্লাবন নাই, পথে কর্দ্দম নাই, আছে কেবল মধ্যে মধ্যে নির্ম্মল আকাশে নিরম্বু-ধবল মেঘের ধ্বনি। প্রকৃতি আজ হাস্যময়ী। বঙ্গের ঘরে ঘরে আনন্দলহরী উঠিতেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সমভাবে বিমল আনন্দে মাতোয়ারা। বৎসরান্তে আত্মীয়স্বজনের সহিত মিলন-আশায় মাসাধিক কাল পূর্ব্ব হইতেই প্রবাসী উৎসুকচিত্তে পূজার দিন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বৃদ্ধ জনকজননী পুত্রের নিরাপদে গৃহ-প্রত্যাগমন কামনা করিয়া দেবতার নিকট মনের প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, প্রবাসী-পতির সমাগম-আশে বিরহিণী কামিনী ব্যাকুল মনে দিন গণিতেছিল, শিশু-পুত্র পিতার সস্নেহ চুম্বন ও নব বস্ত্রের আশায় অধীর হইয়াছিল। অবশেষে পূজার দিন আসিল। ভগবতীর কৃপায় এক বৎসর পরে পুন-র্মিলন হইল। আহা! সে মিলন কত সুখের! কত মধুর! পতি-প্রণয়িণী, জনক-জননী, ভ্রাতাভগিনী সকলের মনই কেমন একটা প্রেম, স্নেহ ও ভালবাসার চুম্বকাকর্ষণে আকৃষ্ট! সকলেই যেন প্রেমানন্দসুরা পান করিয়া মত্ত হইয়াছে। আজ সকলই মধুময়! এ দৃশ্য দর্শনে বৈদিকযুগের সেই সরস-সরল আশা-উৎসাহপূর্ণ জীবনসঙ্গীতটী মনে পড়ে।

"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বী র্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥"

মধুর বায়ু বহিতে থাকুক, নদীসকল মধু ক্ষরণ করুক, আমাদের বুদ্ধি মধুময়ী হইয়া সন্তোষামৃত পান করুক॥ রজনী, উষা, মধুময়ী হউক, পৃথিবীর ধূলা মধুময় হউক। আকাশ মধুময় হউক, আমাদের পিতা মধুময় হউক। বৃক্ষ মধুময় হউক, সূর্য্য মধুময় হউক, আমাদের ধেনুসকল মধুময়ী হউক।

দেখিতে দেখিতে পূজার একদিন, দুইদিন, তিনদিন কাটিয়া গেল। এক বৎসরের জন্য মায়ের পূজা ফুরাইল। পূজা ফুরাইল, কিন্তু একটা মধুর ভাব মনে জাগাইয়া দিল। আমরা মাতৃপূজা করি, ইহা ভাবিয়া মনে আর আনন্দ ধরে না। দশমীর দিনে ধনী ধনগর্ব্ব ভুলিয়া দরিদ্রকে, বিদ্বান্ বিদ্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া মূর্খকে, অভিজাতব্যক্তি জাত্যভিমান পরিহারপূর্ব্বক নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তিকে প্রেমালিঙ্গনে আপ্যায়িত করিতেছেন। ইহা সাময়িক হইলেও সামান্য লাভ নহে।

দুর্গাপূজা একটী আশ্চর্য্য বিধান। বাঙালীর প্রায় সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে, সকলপ্রকার উৎসবেই আজকাল প্রাণহীনতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই সার্ব্বজনীন মহোৎসবে কেমন একটা সজীবতা, কেমন পবিত্রভাবের একতানতা, জাতীয়তার কেমন একটা সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়, ভাবিলে প্রাণমন পুলকে নাচিতে থাকে। ইহার মূলে যে গভীর দার্শনিকতত্ত্ব ও

নিগূঢ় সমাজতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তাহাই চিরকালের জন্য এই উৎসবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে।

দার্শনিকতত্ত্ব।

সকল বেদের সার উপনিষদ্, সকল দর্শনের শিরোমণি বেদান্তদর্শন। ইহারা ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ। উপনিষদের অভিপ্রায় এবং বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা হিন্দুমাত্রেরই শিরোধার্য্য। জ্ঞানী আচার্য্যগণের এই অনুশাসন যে "আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েদ্ বেদান্তচর্চ্চয়া।" নিদ্রার কাল ব্যতীত সকল সময় আমরণ বেদান্তচর্চ্চায় যাপন করিবে। মহা প্রতিভাশালী শঙ্কর উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার। বর্ত্তমানযুগের অগ্রণী মনস্বী রামমোহন বঙ্গদেশে বেদান্তদর্শনের মতানুসরণে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এমন কি, পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণও বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনায় পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক সমালোচক সোপেনহৌর (Scopenhaur) বলেন—"In the whole world there is no study so beneficial and elevating as that of the Upanishads.' It has been the solace of my life, it will be the solace of my death*."

সমগ্রপৃথিবীতে উপনিষদের ন্যায় কোন গ্রন্থেরই অধ্যয়ন এত উন্নতি-বিধায়ক ও উপকারী নহে। ইহা আমার জীবনে শান্তিস্থল, মরণেও শান্তিবিধান করিবে।

জগদ্বিখ্যাত আচার্য্য মোক্ষমূলরের অভিমত এই যে, এমন একদিন

---

* Sacred Books of the East Vol. I.

আসিবে যেদিন হিন্দুর অন্ততঃ বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনে অব্যুৎপন্ন ব্যক্তি ইউরোপীয়দর্শনে সুপণ্ডিত হইয়াও, আপনাকে দার্শনিক বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন*।

বাস্তবিক উপনিষদ্ ও বেদান্তদশন জ্ঞানবিচারের চরমসীমা। ব্রহ্ম বা চৈতন্যরূপিণী জগজ্জননীকে দর্শনই জ্ঞানের চরম ফল। এই জ্ঞানীজন-সমাদৃত শাস্ত্রে নিবদ্ধ মহাবাক্য সকলের সার তাৎপর্য্য জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া সমাজে শক্তির মহিমা প্রচার করিবার মঙ্গল অভিপ্রায় দুর্গোৎসবে দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, এক অনন্তশক্তি মহাপুরুষ নিত্য-বর্ত্তমান আছেন। তিনি সত্যস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। তিনি ব্রহ্ম। "সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম"। ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যিনি ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপী, অসীম, নিরবধি, ভূমা, মহান্। ব্রহ্ম মঙ্গলস্বরূপ, তাই তাঁহার এক নাম শিব অর্থাৎ মঙ্গল। "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ।

ব্রহ্ম আছেন কোথায়? তিনি আকাশে, জলে, স্থলে, ধনীর ভবনে, দীনের কুটীরে সর্ব্বত্র বিরাজমান, সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। যিনি সূর্য্যের মধ্যে থাকিয়া সূর্য্যকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই আমাদের অন্তরে থাকিয়া বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত করিয়া থাকেন। তিনি সাক্ষীরূপে আমাদের অন্তরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। আমরা গোপনে যাহা করি, যাহা

* "If hitherto no one would have called himself a philosopher who had not read and studied the works of Plato and Aristotle, of Descartes and Spinoza, of Locke, Hume and Kant in the original, I hope that the time will come when no one will claim that name who is not acquainted at least with the two prominent systems of ancient Indian Philosophy, the Vedanta and the Samkhya." Six Systems of Hindu Philosophy by Maxmuller.

ভাবি, সমস্তই তিনি অবগত হন। তাঁহার কাছে কিছুই লুকাইবার যো নাই।

তিনি কি করেন ?

তাঁহার প্রধান কর্ম্ম কি ? 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যাঁহা হইতে সাধিত হয়, তিনি ব্রহ্ম।

তাঁহার তিন প্রধান কর্ম্ম, বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার। ইহাই শাস্ত্রীয় ভাষায় ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ। জগৎ তাঁহার কার্য্য, তিনি জগতের কারণ। ব্রহ্ম, জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কোন জিনিষ গড়িতে হইলে চেতনকর্ত্তা কোন অচেতন পদার্থ লইয়া তাহা গড়িয়া থাকে। চেতনকর্ত্তা নিমিত্তকারণ; যে জড়পদার্থ দিয়া অন্য পদার্থের নির্ম্মাণ হয়, তাহা উপাদান কারণ। এই যে তোমার হাতে সোণার আংটিটী রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া কি মনে পড়ে ? কোন কর্ম্মকাব (সচেতন ব্যক্তি) কতকটুকু সোণা লইয়া ইহা গড়িয়াছে। সোণা না হইলে এই আংটী তৈয়ার হইত না। সোণাই আংটীর উপাদানকারণ। কর্ম্মকার নিমিত্তকারণ। সেই প্রকার জগতের উপাদানকারণ কি ?

মনুষ্যাদি চৈতন্যপদার্থ জড়পদার্থ লইয়াই কোন একটা জিনিষ গড়িতে সমর্থ হয়। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, তিনি জগৎকর্ত্তা, নিমিত্তকারণ, একথা বুঝা গেল, কিন্তু তিনি কোন্ উপাদান লইয়া জগৎ গড়িলেন ? সাংখ্যদর্শন বলেন জড়া-প্রকৃতিই (Root-matter) জগতের উপাদানকারণ। সাংখ্যমতে দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে—চৈতন্য ও জড়। জড়জগতের মূলে জড়াপ্রকৃতি। চৈতন্য ও জড়াপ্রকৃতি উভয়ের সাহায্যে জগৎ-সৃষ্টি হইয়াছে। বেদান্তদর্শন এ কথা মানেন না। বেদান্তমতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় পদার্থ (জড়াপ্রকৃতি) মানিবার কোন প্রয়োজন নাই। সৃষ্টি-

কার্য্যে চৈতন্যপুরুষ অন্য কোন পদার্থের সাহায্যগ্রহণ করেন নাই, আবশ্যকও হয় নাই। উপাদান ব্যতীত পদার্থান্তর গড়িবার শক্তি ক্ষুদ্র-জীবের নাই, ব্রহ্মের যদি না থাকে তবে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা অর্থ-শূন্য হইয়া পড়ে। জ্ঞানী, ভক্ত সকলেই একথা স্বীকার করেন যে ব্রহ্ম অনন্ত-বিচিত্রশক্তিবিশিষ্ট। যদি তাই হয়, তবে ব্রহ্ম কেন স্বীয় অসীমশক্তিতে জগৎ গড়িতে পারিবেন না? যদি না পারেন, তবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, একথা বলিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্, একথা নাস্তিক ভিন্ন সকলেরই স্বীকার্য্য।

অবস্থাভেদে একই ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ এই দুই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা কল্পনা করিতে পারিলেই নির্গুণব্রহ্মের অর্থবোধ হওয়া কতকটা সম্ভব। জগতের দুই অবস্থা—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্যক্তাবস্থার নামই সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা অব্যক্ত।

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥"

সৃষ্টির পূর্ব্বে আলো ছিল না, বায়ু ছিল না, কিছুই ছিল না, ছিল কেবল দুর্ভেদ্য অন্ধকার ও গভীর নিস্তব্ধতা। তখন সমস্ত বিশ্ব যেন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল।

ভক্ত কেশবচন্দ্র এ অবস্থার যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ইহা পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যাস্বরূপ।

"The Supreme Brahmo of the Veda and the Vedanta dwells hid in Himself. Here sleeps the mighty Jehovah with might yet unmanifested. Eternal and awful silence reigns on all sides. Not an event stirs the ocean of time, not an object is to be seen in the vast ocean of space. Not a breath ruffles the serene bosom

of sleeping Infinity. Impenetrable darkness above and below, before and behind !" .. ..

... ... "Who can realize the Infinite Being? Who can comprehend the mysterious One? Thought cannot approach Him. The mind understands Him not who or what He is."

শক্তি আছে, শক্তির বিকাশ হয় নাই, কোন ক্রিয়া নাই। এ অবস্থায় ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়া থাকে। কখন বা শক্তি সুপ্ত, কখন বা জাগ্রত। যখন শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না (যথা সৃষ্টির পূর্ব্বে), তখন ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ (God Absolute), এ অবস্থায় ব্রহ্ম আমাদের বোধের বিষয় নহে। জগতের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া ব্রহ্মকে আমরা বুঝিতে পারি না। শক্তির বিকাশ-অবস্থায় যখন শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় তখন ব্রহ্ম সগুণ।

আমাদের কাল-গণনায় কত লক্ষ কোটী বৎসর এই ভাবের অব্যক্তাবস্থা চলিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে ? অকস্মাৎ কেন জানি তাঁহার ইচ্ছা হইল আমি জগৎ নির্ম্মাণ করিব। তাই ইচ্ছামাত্র নিজশক্তি সহযোগে তিনি জগৎ গড়িলেন।

(হরি হে) কে জানে মহিমা তোমার !
ছিলে একা সবার আগে, কালে ইচ্ছা উঠ্‌লো জেগে,
কর্‌লে সৃষ্টি, হ'ল জগৎ, কেন, বুঝ্‌বে সাধ্যকার ?
কে জানে মহিমা তোমার।

ব্রহ্ম ত সকলস্থানেই আছেন, দেখা যায় না কেন ? একটা আবরণ আছে, তাহার নাম অজ্ঞান। এই অজ্ঞান-আবরণটা সরিয়া গেলেই ব্রহ্মদর্শন হইতে পারে। "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।"

আমাদের জ্ঞান, অজ্ঞানাবৃত আছে বলিয়াই কেমন একটা মোহ, চিত্ত-ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই জন্যই ব্রহ্ম আমাদের দৃষ্টিগোচর হন না। অজ্ঞান আমাদের জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে সুতরাং জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না, ব্রহ্মদর্শনও হয় না। এই অজ্ঞান দূর করা মানবের পরম-পুরুষার্থ।

মলিন চিত্তমুকুরকে একেবারে মলশূন্য করিতে পারিলেই তাহাতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়িবে। সমল মন যে পর্য্যন্ত নির্ম্মল না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্মদর্শন ঘটিবে না। জ্ঞান-ভানুর কিরণে পাপপঙ্কিলতা বিশোধিত হইলেই মনশ্চক্ষু ব্রহ্মকে দেখিতে সমর্থ।

প্রধানতঃ তিন প্রকারে ব্রহ্মদর্শন হয়। পুরাকালে আর্য্য ঋষিগণ প্রকৃতিতে ব্রহ্মসম্ভোগ করিয়া পুলকিত ও কৃতার্থ হইতেন। "অদিতি-নন্দিনী উষাবিনোদিনী"ও "শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী"র মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া কত ভাবুক কবি ব্রহ্মাস্বাদকরতঃ আত্মহারা হইতেন। কবিবর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (Wordsworth) প্রকৃতির ভীষণ-রমণীয় দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া ভগবৎপ্রেমে ডুবিয়া যাইতেন।

যোগিগণ আত্মাতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া আত্মতৃপ্ত থাকিতেন।

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ উপনিষদ্।

ব্রহ্মকে সহজে দেখা যায় না, তিনি যে জগতের প্রতিপদার্থের ভিতরে লুকাইয়া আছেন। তিনি আমাদের হৃদয়গুহাতে বর্ত্তমান, কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত। এই পুরাণপুরুষকে জ্ঞানিজন অধ্যাত্মযোগবলে অবগত হইয়া হর্ষশোকের অতীত হইয়া থাকেন।

যোগিগণ ওঁকার সাধনা করিতেন। ব্রহ্মবাচকশব্দের মধ্যে ওঁকার তাঁহাদের মতে শ্রেষ্ঠ প্রতীক। মহিম্নস্তবে ওঁকারের একটী ব্যাখ্যা আছে—

ত্রয়ীং তিস্রোবৃত্তী স্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরান্
অকারাদ্যৈর্ব্বর্ণৈ স্ত্রিভিরপি দধত্তীর্ণবিকৃতি।
তুরীয়ন্তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধান মণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ! গৃণাত্যোমিতিপদম্॥

ওম্ এই পদের অ, উ, ম্ এই তিন বর্ণে ঋক্, যজু, সাম এই তিন বেদ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন ভুবন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন পৌরাণিক দেবতাকে বুঝাইয়া থাকে। হে আশ্রয়দাতা পরমেশ্বর! ওঁকারে তোমরই নির্গুণ, তুরীয়, বিকারাতীত অবস্থাকে বুঝায়, আবার প্রপঞ্চাকারে স্থূলব্যক্ত অবস্থাকেও বুঝায়। চণ্ডীতে আছে—

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান
মুদ্গীত-রম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্!

তুমি অতি পবিত্র ঋক্, যজুঃ এবং রমণীয়পদপাঠযুক্ত গানার্হ সাম-সকলের নিধান, তুমি শব্দরূপা, তুমি শব্দব্রহ্ম, ওঁকার।

মৃন্ময়, হিরণ্ময় বা প্রস্তরময় প্রতিমার সাহায্যে কোন কোন সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ভক্তকবি রামপ্রসাদ, পরমহংস রামকৃষ্ণের পবিত্রজীবনী একথার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতিতেই হউক, আর আত্মাতেই হউক, অথবা প্রতিমার সাহায্যেই হউক, ব্রহ্মদর্শন লাভ হইলেই মানবজীবন সফল হইল। যিনি যে রূপেই ব্রহ্মসম্ভোগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আমাদের প্রণম্য। তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া আমরা ধন্য

হইতে পারি। মৃন্ময়াদি মূর্ত্তি অবলম্বনে যে সাধনপথ তাহা বিরুদ্ধপথ, এইরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, কিন্তু তাহা কি সত্য? আমি রামেশ্বরসেতুবন্ধ যাইতে ইচ্ছা করিয়া যদি ক্রমাগত কেবল উত্তরদিকেই চলিতে থাকি, তবে অভীষ্টস্থানে কস্মিন্‌কালেও পঁহুছিতে পারিব না। কেননা আমি বিরুদ্ধ পথে চলিয়াছি, পরন্তু যদি আমি গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারি, তবে বিপরীতপথে চলি নাই একথাই বুঝিতে হইবে।

ভগবৎসৃষ্ট সৌরমূর্ত্তিতে ঋষিগণ ভগবৎশক্তি উপলব্ধি করিয়া সেই শক্তিরই উপাসনা করিতেন! "ভর্গো দেবস্য ধীমহি"। যিনি সূর্য্যের ভিতরে থাকিয়া সূর্য্যকে তেজোময় করেন, সেই জ্যোতির্ম্ময় দেবতাকে ধ্যান করি। গায়ত্রী-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আর্য্যগণ ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং তাঁহাদের বংশধরদিগকেও সেইরূপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। যোগিগণ ওঁকার সাধনাবলে অন্তরের অন্তস্তলে বিরাজমান পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে তন্ময় হইয়া প্রশান্তচিত্তে কেবল বিমল আনন্দামৃতপানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করিতেন।

ওঁকার জপের অর্থ কি? ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মের সৃজ্যাশক্তি, পালনীশক্তি ও সংহারশক্তির চিন্তন ও মনন। যোগিরা ব্রহ্মশক্তিরই ধ্যান ধারণা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতেন। স্বভাবভক্ত কবিরা স্বভাবের মনোহর দৃশ্য দেখিয়া ভগবৎপ্রেমে ও ব্রহ্মসত্তায় ডুবিয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখসম্ভোগ করিতেন। তাঁহারাও ব্রহ্মশক্তিরই মহিমায় মোহিত হইতেন, তাঁহারাও ব্রহ্মশক্তিরই নীরবস্তাবক, নিষ্কাম উপাসক। আবার মানব-হস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম জড়প্রতিমা অবলম্বনে যে সকল সাধক সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারাও সেই এক ব্রহ্মশক্তিরই পূজক। বস্তুতঃ ব্রহ্ম-মহিমায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া জড় উড়িয়া গেলে কেবল চৈতন্যশক্তির বিদ্যমানতা অনুভব করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ হয়।

বাহ্যপ্রকৃতিতে, প্রতিমাতে বা হৃদয়াভ্যন্তরে ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া প্রণবজপকারী যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত বা কর্ম্মী যিনিই যে ভাবে সাকার বা নিরাকারের পূজা করুন না কেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে শক্তিরই উপাসক। যিনি যে দেবতারই উপাসনা করুন না কেন, তিনি শক্তিরই ভক্ত। তিনি শক্তিরই স্তব করেন, শক্তিরই কীর্ত্তন করেন, শক্তিরই ধ্যান করেন। মহাগ্রন্থের মহাবাক্য ও সাধুমহাত্মাদিগের বচনই যে কেবল শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ তাহা নয়; উহা নিত্যপ্রত্যক্ষ সত্য।

সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থা আমাদের বোধাতীত। তাহা দার্শনিকের আলোচ্য হইতে পারে, আমাদের নহে। আমরা কিন্তু জন্মিয়াই জগৎ দেখিতেছি। আমরণ জগতের সঙ্গেই আমাদের মাখামাখি ভাব। জগতে আমরা প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ, পলে পলে, শক্তির ক্রিয়া দেখিয়া আসিতেছি। শূন্যে, বিনাসূত্রে কোটী কোটী ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণীবিশিষ্ট সশৈলা সসাগরা ধরিত্রী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে। ইহা শক্তিরই কার্য্য। এই যে প্রভাতে বালসূর্য্য উদিত হইয়া, মধ্যাহ্নে মাথার উপর উঠিয়া খরতর কিরণ বিকীরণ করিয়া ধীরে ধীরে সায়ংকালে সমুদ্রের অতলজলে ডুবিয়া যায়, এ কাহার কার্য্য? শক্তির। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই স্তন্যপূর্ণ মাতৃস্তন পান করিয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে; কাননে কত কুসুম ফুটিয়া চতুর্দ্দিক সুরভিত করে; সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র বীজ দিগন্ত-বিসারি শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট ফলপল্লবশোভিত মহামহীরুহে পরিণত হয়; এ সকল কাহার কার্য্য? শক্তির। মহাসিন্ধু অজগরতুল্য তরঙ্গ-বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়া থাকে,—শক্তি আছে, শক্তিরূপিণী বিশ্বজননী আছেন। ঘোর ঘনঘটা গগন ছাইয়া বজ্রনির্ঘোষে বলিয়া দেয়, শক্তি আছে, শক্তিরূপিণী বিশ্বজননী আছেন। চকিতে চপলা বিকট হাসি হাসিয়া বলিয়া যায়, শক্তি আছে, শক্তিরূপিণী বিশ্বজননী আছেন। প্রবল-

বাত্যা প্রবাহিত হইয়া প্রাসাদ ও পাদপ উৎপাটিত করিয়া তুমুলশব্দে বলিয়া যায়, শক্তি আছে, শক্তিরূপিণী বিশ্বজননী আছেন। বালারুণ, উষার সুষমা লইয়া হাসিয়া বলে,—শক্তি আছে, শক্তিরূপিণী বিশ্বজননী আছেন। তারকাবেষ্টিত শারদচন্দ্রমা নির্ম্মলগগনে হাসিয়া বলে, শক্তি আছে, শক্তিরূপিণী বিশ্বজননী আছেন। মানব যখন বিপৎসাগরে পড়িয়া কূল কিনারা পায় না, তখন কে যেন প্রাণের ভিতর থাকিয়া বলিতে থাকে, ভয় নাই, আমি আছি। মানব যখন পাপে ডুবিয়া অধঃ-পাতে যাইতে থাকে, তখন কে যেন অস্ফুটস্বরে ভিতর হইতে বলিতে থাকে, আর পাপের পথে যাইও না, আর ডুবিও না, একবার আঁখি মেলে দেখ, এই যে আমি আছি।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে শক্তির ক্রিয়া অবিরত চলিতেছে। ব্রহ্ম এক, নিত্য, মহান্, বিশ্বব্যাপী; তাঁহার শক্তিও একা, নিত্যা, মহতী, বিশ্ব-ব্যাপিনী। ব্রহ্ম কখনও শক্তি হইতে বিচ্যুত নহেন। ব্রহ্ম ও তদীয় শক্তি একান্ত একীভূত। শক্তি ও শক্তিমান্ যে অভিন্ন তাহা জাগতিক পদার্থে দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তিমান্ যে অবশেষে শক্তিমাত্রে পর্য্যবসিত হয় তাহাও প্রত্যক্ষীভূত।

কুম্ভকার কলস গড়িল, একথার অর্থ এই যে কুম্ভকারের শক্তিতে উহা তৈয়ার হইল। প্রথমতঃ কুম্ভকারের ইচ্ছা, তারপর মৃত্তিকা লইয়া ক্রিয়া। হস্তদ্বারা মাটিকে পিটিয়া পিটিয়া কলসনির্ম্মাণকালে হস্তের বল প্রয়োগ করা হইয়াছিল; হস্ত যদি বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অবশ অসাড় হইত, তবে কলস নির্ম্মাণ অসম্ভব হইত। কুম্ভকারের ইচ্ছাশক্তি ও হস্তাদি দেহাবয়বশক্তিই কলস গড়িয়াছে। এই প্রকার সর্ব্বত্রই কার্য্যের কারণ শক্তি, একথা বলা যাইতে পারে।

অগ্নি বলিলে আমরা তাপ ও দাহিকাশক্তিই বুঝি। ঐ শক্তি না

থাকিলে অগ্নির অগ্নিত্ব থাকে না। তবেই অগ্নি অর্থে শক্তিবিশেষ। এই প্রকারে কার্য্যকারণসম্বন্ধ ও বস্তুধর্ম্ম চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানীভাবুকগণের মনে কেবল শক্তিই জাগে। এই প্রকার বিচারে ব্রহ্ম আর চিন্ময়ী শক্তি একই বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞানিগণ ব্রহ্ম বা সেই বিশ্বব্যাপিণী শক্তিকেই 'আদ্যাশক্তি' প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সেই চিন্ময়ী মহাশক্তিই আমাদের আরাধ্যা ভগবতী দুর্গা। দুর্গাপূজা ও ব্রহ্মউপাসনার একই তাৎপর্য্য।

কবি মানসপটে যে মানসচিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, চিত্রকর কুম্ভকার, ভাস্কর প্রভৃতি শিল্পীগণ সেই চিত্রকেই স্থূলতর মূর্ত্তি দিয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত করে।

চিন্ময়ী নীরূপা শক্তিকে কবি রূপ দিয়াছেন। কবি সাধারণের অবোধ্য সূক্ষ্ম অশরীরী তত্ত্বকে, অস্ফুট ভাবকে, স্থূল ও স্পষ্ট করেন এবং রূপ প্রদান করিয়া জীবন্ত করিয়া তোলেন, তবে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয়। কবি অসীমকে সসীম করেন, অমূর্ত্তের মূর্ত্তি আঁকিয়া চোখের সাম্‌নে ধরেন। কবির স্বভাবই এইরূপ। দুর্গাপূজায় কবি, শক্তির ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ফলকে আঁকিয়া জগতে শক্তিপূজার, মাতৃপূজার প্রচার করিলেন। মানব-সমাজে, নিখিল প্রাণী-জগতে, জড়জগতে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া খণ্ড খণ্ড অসংখ্য শক্তির ক্রিয়া অবিরাম দেখা যাইতেছে। এই খণ্ড খণ্ড শক্তির সমষ্টি সমগ্র-মহাশক্তির উপাসনাই দুর্গাপূজা। এই মহাশক্তি জড়শক্তি নহে। চৈতন্য কর্ত্তা, জড় কৃত, চৈতন্য জ্ঞাতা, জড় জ্ঞাত, চৈতন্য ভোক্তা, জড় ভুক্ত। চৈতন্য ও জড়ে এই প্রভেদ। দ্বৈতবোধে এই প্রকার অনুভূতি। চৈতন্যশক্তিতেই জড়ের শক্তি। চিন্ময়ীশক্তিই বিশ্বজননী, জড়শক্তি বিশ্ব গড়িতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্রহ্ম ও চিন্ময়ীশক্তি বা ভগবতী দুর্গা একই

বস্তু। একথার প্রমাণস্বরূপ কয়েকটী শ্রুতি ও চণ্ডীবাক্য এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রুতি। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

বেদান্তসূত্র। "জন্মাদ্যস্য যতঃ।"

এই শ্রুতি ও সূত্রের একই অর্থ, অর্থাৎ তিনি ব্রহ্ম, যিনি জগৎ গড়িয়াছেন, যিনি জগৎ পালন ও সংহার করিয়া থাকেন।

চণ্ডী। "ত্বয়ৈতৎ ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি! ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥"

দেবি! তুমি এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছ, তুমি সৃজন কর, তুমি পালন কর, তুমিই সংহার কর।

শ্রুতি। "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়।

চণ্ডী। "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"

এই জগতে আমি একা অদ্বিতীয়া, আমার আবার দ্বিতীয় কে আছে?

"ত্বয়ৈকয়াপূরিতমম্বয়ৈতৎ।"

মা! একমাত্র তুমিই জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ।

শ্রুতি। "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ।" ব্রহ্মই অমৃত।

চণ্ডী। "সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে"। দেবি! তুমি অমৃত, তুমি অক্ষরা, নিত্যা।

শ্রুতি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। এই সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম।

গীতা। "নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব"। হে সর্ব্ব! তোমাকে নমস্কার।

চণ্ডী। "সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে"। দেবি! তুমি সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বেশ্বরী ও সর্ব্বশক্তিশালিনী।

"সর্ব্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ"।

দেবি! তুমি সর্ব্বাণী, তোমাকে নমস্কার।

শঙ্করের বেদান্তভাষ্য। "অস্তি তাবন্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্।" নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম আছেন।

চণ্ডী। "সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে"।

শ্রুতি। "নিত্যঃ, সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বগতঃ"।

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" এক সর্ব্বব্যাপী দেবতা সকল ভূতের অন্তরাত্মা।

চণ্ডী। "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়াসর্ব্বমিদং ততম্।"

সেই দেবী নিত্যা, জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি, তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্‌ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।"

যে দেবী চৈতন্যরূপে এই সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।

"যচ্চকিঞ্চিদ্ কচিদ্‌বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বম্ ... ...॥"

দেবি! তুমি বিশ্বাত্মিকা। এই জগতে যত কিছু বস্তু আছে, সে সকলের মধ্যে যে শক্তি বিদ্যমান, তাহা তুমি। আকাশের (ether) শব্দগুণ, মৃত্তিকার গন্ধগুণ, সূর্য্যের তেজঃশক্তি প্রভৃতি তুমিই। তোমার শক্তি বিশ্বব্যাপিনী।

এই সকল বাক্য পরস্পর মিলাইয়া দেখিলে, ব্রহ্ম আর ভগবতী দুর্গা এক বস্তু বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

নারায়ণ হইতেও দেবী ভগবতী ভিন্ন নহেন, চণ্ডীতে এ কথাও পাওয়া যায়।

"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা।" তুমি অনন্তবীর্য্যশালিনী বিষ্ণুশক্তি।

"স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।" দেবি নারায়ণি! তুমি স্বর্গ ও মুক্তিদায়িনী, তোমাকে নমস্কার।

শাক্তধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে, ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা আসিতে পারে না। শাক্তধর্ম্ম সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

"দেব্যা যয়া তত মিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃস্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥" চণ্ডী।

যে দেবী নিজশক্তিতে এই বিশ্ব গড়িয়াছেন, যিনি সমস্ত দেবগণে মূর্ত্তিমতী শক্তি, সেই অম্বিকার চরণে আমরা ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন!

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এই চিন্ময়ীশক্তি রক্তমাংসের শরীর লইয়া জীবলোকে উপস্থিত হন কি না? এই প্রশ্নের উত্তর চণ্ডী দিয়াছেন,—

"দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥"

মহাদেবী মহাশক্তি নিত্যা হইলেও দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যখন আবির্ভূতা হন, তখন তিনি জন্ম পরিগ্রহ করিলেন, এরূপ বলা হইয়া থাকে। অবতারবাদে বিশ্বাস থাকুক আর নাই থাকুক, অজ্ঞান, অভক্ত আমরা মাকে চোখে দেখিতে পারি আর নাই পারি, মায়ের পূজায় সন্তানের কি কোন আপত্তি থাকিতে পারে?

ভক্ত, আরাধ্য দেবতাতে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনার জন করিয়া লইতে ভালবাসেন। ঈশ্বরকে যিশু পিতা, মহম্মদ প্রভু, অর্জ্জুন

সখা, যশোদা পুত্র, রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ মা বলিয়া জানিতেন ও ডাকিতেন। ভগবতীদুর্গা বিশ্বজননী, আমাদের সকলেরই জননী। দুর্গাপূজা মহাশক্তির পূজা, বিশ্বমাতার পূজা।

মায়ের সন্তান মোরা, মা-মূর্ত্তি ভুবন ভরা,
গাহিব মায়ের জয়, জয় দুর্গা রবে;
মায়ের সন্তান মোরা, মা-মূর্ত্তি কি মনোহরা,
করিব মায়ের পূজা, ধন্য হ'ব তবে।
আমরা মায়ের ছেলে, ডাক্‌ব শুধু মা মা ব'লে,
মা ডাকে মায়ের মনে আনন্দ অপার;
আমরা অবোধ ছেলে, বসিব মায়ের কোলে,
এত মধুমাখা কোল কোথায় আছে কার?
মায়ের সন্তান মোরা, মা-মূর্ত্তি কি মনোহরা,
করিব মায়ের পূজা, ধন্য হ'ব তবে;
মায়ের সন্তান মোরা, মা-কীর্ত্তি ভুবন ভরা,
গাহিব মায়ের জয়, জয়দুর্গা রবে।

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা॥" চণ্ডী।
নমো নমঃ বার বার, শতবার তাঁরে নমস্কার,
যে দেবী সকল ভূতে মাতৃরূপে রাজে অনিবার।

সমাজতত্ত্ব।

আমরা জীবনে কি চাই? চাই উন্নতি ও সুখ। এমন নির্বোধ পৃথিবীতে কেহই নাই, যে নিজের অধঃপতন চায়, দুঃখ চায়।

লোকের স্বভাব, দলবদ্ধ হইয়া বাস করা। একা থাকিতে কেহই ভালবাসে না। এমন কি, পশু পক্ষীরাও দল বাঁধিয়া থাকিতে ভালবাসে। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই সমাজসৃষ্টির মূল কারণ। পশুপক্ষ্যাদির সমাজ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য সমগ্র মানবজাতির এক সাধারণ নাম মানব-সমাজ। কিন্তু নানা অনিবার্য্য কারণে এক মানবসমাজই বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ বা জাতি ব্যক্তির সমষ্টি। সমাজস্থ অধিকাংশ ব্যক্তির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; আবার উন্নত সমাজের অধিকাংশ লোকই উন্নত। কোন সভ্য সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিও অসভ্যসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অপেক্ষা নানা বিষয়ে অধিকতর সুখ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। সমাজের সহিত ব্যক্তির, ব্যক্তির সহিত সমাজের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ব্যক্তির জন্য সমাজ, সমাজের জন্য ব্যক্তি। ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, উন্নতি অবনতি, সমাজের উন্নতি অবনতির সহিত বিজড়িত। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় সুখ ও উন্নতিলাভের জন্য চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় ও কর্ত্তব্য, সেইরূপ সমাজের উন্নতির জন্যও বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক।

উন্নতি ও সুখ কিসে হয়? শক্তিতে সুখ ও উন্নতি, শক্তিহীনতায় দুঃখ ও দুর্গতি। উন্নতি অর্থ উর্দ্ধগতি। উর্দ্ধে উঠিতে হইলেই বল-প্রয়োগের প্রয়োজন। দুর্ব্বল অলস ব্যক্তি মুখে উন্নতির কথা বলিলেও প্রকৃতপক্ষে সে উন্নতি চায় না। গতি তাহার ভাল লাগে না, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে তাহাকে গতিলাভ করিতেই হইবে। সেই গতি নিম্নদিকে।

যে সমাজে সকল লোকই দুর্ব্বল অথবা দুর্ব্বলের সংখ্যা অধিক, সেই সমাজ দুর্ব্বল, সুতরাং অনুন্নত। সেই সমাজের গতি নিম্নদিকে।

শক্তির বৃদ্ধিতে সুখসমৃদ্ধি ও উন্নতি। সকল সভ্যসমাজমধ্যে প্রধানতঃ চারিটী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা দেহশক্তি, জ্ঞানশক্তি, হৃদয়-শক্তি ও ধনশক্তি। প্রথম তিনটী মানুষের নিজশক্তি, শেষোক্তটী আগন্তুকশক্তি।

সেই সমাজই সম্যক্ উন্নত, যে সমাজ নির্ব্বিরোধে সমভাবে এই চারিটী শক্তির উৎকর্ষসাধনে তৎপর। সেই সমাজই আদর্শ সমাজ, যেখানে প্রতিব্যক্তির সমগ্র মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল প্রকার সুবিধা আছে। কেবল একটীমাত্র শক্তির উৎকর্ষে ও অন্য শক্তিগুলির অনাদরে সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এই চারিটী শক্তির সমবায়ে হইয়া থাকে। সমাজসম্বন্ধে এই মূলতত্ত্ব দুর্গোৎসবে দেখিতে পাওয়া যায়।

দুর্গোৎসবে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এই চারি দেবতার মূর্ত্তি পূজা হইয়া থাকে। বলদেবতা কার্ত্তিক, জ্ঞানদেবতা গণেশ, ধনদেবতা লক্ষ্মী, এবং হৃদয়োৎকর্ষবিধায়িনী, কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর পূজায় ঐ শক্তিচতুষ্টয়ের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। এই চারি দেবতার যুগপৎ আরাধনাদ্বারা সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করার মৌন উপদেশ দুর্গাপূজায় নিহিত আছে।

সকল শক্তির মূলাধার একমাত্র আদ্যাশক্তি ভগবতীর পূজা করিলেই সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ হইতে পারে সত্য, কিন্তু সমাজের উন্নতির পক্ষে কোন্ কোন্ শক্তির উপাসনা একান্ত আবশ্যক, তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য গণেশাদি দেবপূজার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে।

গণেশদেবতা।

জ্ঞান-ধর্ম্ম।

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" গীতা।

"শিবো মমাত্মা মম শক্তিরাত্মা
জ্ঞানং গণেশো মম চক্ষুরর্কঃ।
বিভেদভাবং ময়ি যে ভজন্তি
মামঙ্গহীনং কলয়ন্তি মন্দাঃ।" তন্ত্র।

"জ্ঞানং গণেশঃ"। সিদ্ধিদাতা গণেশ জ্ঞানাবতার। জ্ঞানের আরাধনায় মানবের চিত্তান্ধকার ও অমঙ্গল দূর হয়, কর্ম্মে সিদ্ধি লাভ হয়। জ্ঞানই মানুষকে পশু হইতে পৃথক্ করিয়া থাকে। আলোক, জীবের চির-আকাঙ্ক্ষিত। পেচক ভিন্ন অন্ধকারে থাকিতে কে চায়? নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার কাহার ভাল লাগে? মানব যে কারণে আলোক ভালবাসে, জ্ঞানও সেই কারণেই ভালবাসে। জ্ঞানালোকস্পৃহা মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি। আলোক ও জ্ঞান এক জাতীয় পদার্থ, উভয়েই প্রকাশাত্মক, প্রভেদ এই যে, সূর্য্যালোক বিনা চেষ্টায় লভ্য, জ্ঞানালোক পুরুষকার-সাধ্য।

জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। "ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্ম্মঃ"। জ্ঞানের ন্যায় ধর্ম্ম ত্রৈলোক্যকে উজ্জ্বল, আলোকিত করে। জগতের স্রষ্টা কে? তাঁহার সহিত জীবের কি সম্বন্ধ? তাঁহাকে কি উপায়ে লাভ করা যায়? ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা জ্ঞানের নিকট, দর্শনের নিকট পাওয়া যায়। ধর্ম্মের উৎপত্তি মানবের স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি হইতে।

প্রকৃতির নানাবিধ বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী-দর্শনে মুগ্ধ, সরল শিশুর ন্যায় আদি মানব-সমাজের বক্ষে যে সকল ভাবলহরী খেলা করিয়াছিল তাহাতেই ধর্ম্ম জীবন লাভ করিয়াছে। এবং ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া মানবের রুচি, জ্ঞান ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ধর্ম্মেরও অবস্থান্তর ঘটিয়াছে।

ধর্ম্মের লক্ষণ নিরূপণ করিতে যাইয়া আর্য্য ঋষি বলিয়াছেন,—"যতোঽভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" যাহা হইতে অভ্যুদয় অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ পরম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা ধর্ম্ম। ইহাই যদি ধর্ম্মের লক্ষণ হয়, তবে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কখনও অবনতি বা অমঙ্গল হইতে পারে না। যখনই কোন সমাজ অবনত হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, সেই সমাজ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। জাতীয় উন্নতির মূলে ধর্ম্ম, অবনতির মূলে অধর্ম্ম; ব্যক্তিগত উন্নতির মূলে ধর্ম্ম, অবনতির মূলে অধর্ম্ম। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস একথার সত্যতা প্রমাণ করিয়া থাকে! এ দেশে ধর্ম্মবিপ্লব এতই অধিক ও অসংখ্য বার হইয়াছে যে, এখন আর লোকে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে না। ধর্ম্ম এখন বাহিরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ৺ কবিবর রজনীকান্ত যথার্থই বলিয়াছেন, ধর্ম্মহীনতাই এখন আমাদের ধর্ম্ম হইয়াছে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ উচ্চ ধর্ম্মের ধার ধারেন না, জনসাধারণ ধর্ম্ম বুঝিতে চায় না। এখন আর ধর্ম্মকে আমরা রক্ষা করিতেছি না, ধর্ম্মও আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে না। ধর্ম্মহীন হইয়া কোন সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। সত্য-ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া আমরা পাপে ডুবিতেছি।

বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মজীবন লাভের একটা মহৎ চেষ্টা ও উপায় থাকা আবশ্যক। অনেকেই ধর্ম্মকে বৃদ্ধকালের জন্য রাখিয়া দেন। যখন

ইন্দ্রিয়সকল দুর্ব্বল, অপটু হইয়া পড়িবে, অথবা কোন কোন ইন্দ্রিয়শক্তির একেবারেই লোপ হইবে, যখন জরা ব্যাধি আসিয়া শরীরটাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিবে, তখন কি আর ধর্ম্ম উপার্জ্জনের সময় থাকে? ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা কি এতই সহজ? আবার বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত যে জীবনটা থাকিবে তাহারই বা স্থিরতা আছে কি? যাহারা সৌভাগ্যবশতঃ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া থাকেন, তাহাদের কাছেও ধর্ম্মের কথা বড় একটা শুনা যায় না।

জ্ঞান, চরিত্র ও ধর্ম্ম ইহারা সহোদর ভ্রাতা। চরিত্রবান্ না হইয়া কেহ ধার্ম্মিক হইতে পারে না। অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে কে ধার্ম্মিক বলিবে? তবে অধঃপতিত সমাজে এরূপ হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ চরিত্রগঠন ধর্ম্মজীবন লাভের প্রধান সহায়। ইহা এক দিনে সম্পন্ন হয় না। আবাল্য বহু দিন কঠোর ব্রত-নিয়ম পালন করিয়া সৎপথে বিচরণ করিবার অভ্যাস দৃঢ় হইলে সুচরিত্র গঠিত হইতে পারে। নীচ-ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ, উদার স্বার্থ-সংরক্ষণে বলবতী চেষ্টা, শত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কর্ত্তব্য পালনে নিরন্তর উদ্যম, ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। আত্মরক্ষার পুরুষোচিত চেষ্টা, আবার আত্মত্যাগের উদার অভিনয়, উভয়ই ধর্ম্ম। চারিত্র্যহীন ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কর্ম্মহীন ধর্ম্ম পঙ্গু, জ্ঞানহীন ধর্ম্ম অন্ধ, ভাবভক্তিহীন ধর্ম্ম শুষ্ক, নীরস। সুচরিত্র লাভ করিয়া মহৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারিলেই ধর্ম্ম সফলতা লাভ করে।

আর্য্য ঋষিগণ বিদ্যার দুই ভাগ করিয়াছেন—পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। ব্রহ্মবিষয়িণী বিদ্যার নাম পরাবিদ্যা। যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে, যে পবিত্র গ্রন্থচয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়, তাহার নাম ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি এই শ্রেণীর গ্রন্থ। কেহ কেহ এইরূপ

মত পোষণ করেন যে, হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থগুলি জীবনের নশ্বরতা, দেহের ক্ষণ-ভঙ্গুরতা, বিষয়ের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া লোকদিগকে কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিয়া দেয়। কিন্তু,

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা, ধর্ম্মমাচরেৎ॥"

আমি অজর, অমর এই রূপ ভাবিয়া ধীমান্ ব্যক্তি বিদ্যা ও বিষয় চিন্তা করিবেন, এবং যম আসিয়া কেশে ধরিয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবেন। এই অমূল্য উপদেশ পালন করিয়া চলিলে আমাদের সকল দিক্ই বজায় থাকে। আমরা চিরকাল বিদ্যা অর্জ্জন করিব, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিব। বিষয় ভোগ করিব, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা ও ধর্ম্ম অর্জ্জন করিব।

বাস্তবিক, 'ঈশ্বরারাধনং মহৎ', ঈশ্বর-আরাধনারূপ পুণ্য মহৎ কর্ম্ম সম্যক্‌রূপে সম্পাদন করিতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্থক। অনলে, অরুণে, চন্দ্রে তাঁহার দিব্য জ্যোতির, বিশ্বের সর্ব্বত্র তাঁহার বিরাট বিকাশের, এবং হৃদয়ে তাঁহার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির অনুভূতিতেই ব্রহ্মবিদ্যা চরিতার্থ। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল ভজন-পূজনেই ঈশ্বরের আরাধনা শেষ হয় না। তাঁহার সৃষ্ট জীবের হিত-সাধনেই তাঁহার বিশেষ প্রীতি হইয়া থাকে।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় কি? কি উপায়ে অজ্ঞান নাশ করিয়া ব্রহ্ম-দর্শন হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর উপনিষদে পাওয়া যায়,—

"তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্।"

ষড়ঙ্গবেদ, তপস্যা, দম ও কর্ম্মে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা এবং সত্য ইহার আশ্রয়।

ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে তপস্যা চাই, কর্ম্ম চাই, দম অর্থাৎ স্থির-

চিত্ততা ও ইন্দ্রিয়-সংযম এবং বেদাধ্যয়ন চাই। সত্যকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করা চাই। জ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত এবং চিত্তকে স্থির করিয়া তপস্যা করিতে হইবে, কর্ম্ম করিতে হইবে।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" দুর্ব্বল ব্যক্তি ব্রহ্মলাভ করিতে পারে না। লৌকিক বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলেও সত্যকে অবলম্বন করিয়া সাধনা করিতে হইবে। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। বলহীন লোক কোন বিদ্যাই লাভ করিতে পারে না।

অপরাবিদ্যা।

পুরাকালে ভগবদ্বিষয়িণী বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হই-য়াছিল, কিন্তু অধুনা জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা ও জীবন-সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে সাক্ষাৎভাবে জীবনধারণোপযোগী শিক্ষণীয় বিষয় সকল (বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি) সাধারণ্যে সমধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। এই বিষয়গুলির জ্ঞানই পূর্ব্বে অপরা বিদ্যা নামে অভিহিত হইত। যদিও আধ্যাত্মিক বিদ্যাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ অতীন্দ্রিয়, অর্থশূন্য (Transcendental nonsense) বলিয়া উড়াইয়া দেন, তথাপি একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য রাখিয়া পরা ও অপরা এই উভয়বিধ বিদ্যার অনুশীলনেই সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি। কেবল পরা বা কেবল অপরা বিদ্যা লইয়া ব্যক্তি বিশেষ উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সমাজের সম্যক্ উৎকর্ষ-সাধন হইতে পারে না। সমাজে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতি উভয়েরই

প্রয়োজন। প্রচীন হিন্দুসভ্যতায় এই দুই-ই ছিল। পার্থিবতা ব্যতীত পৃথিবীর লোক থাকিতে পারে না, সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। আর্য্য সমাজে ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা যথেষ্ট ছিল, সঙ্গে সঙ্গে গণিত, জ্যোতিষ, কাব্য, সাহিত্যাদিরও অনুশীলন ছিল। তবে আধ্যাত্মিকতাই হিন্দু সভ্যতার বিশেষত্ব। এখন সে সভ্যতার প্রাণ নাই, প্রাণহীন প্রতিকৃতি আছে। বর্ত্তমান সভ্যতাও 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হইয়া সশরীরে এদেশে আসিতে পারে নাই—ছায়াপাত হইয়াছে। আমরা উভয় সভ্যতার প্রাণহীন ছবি ও ছায়া লইয়া আছি। এখন আমরা আধ্যাত্ম বিদ্যা ছাড়িয়া অপরাবিদ্যার উপাসনায় নিযুক্ত, কিন্তু তাহাতেও কতটা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছি, ভাবিবার বিষয়। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতিতে জাতির স্বস্তি-শান্তি, বিজ্ঞান ও ভাষার উৎকর্ষে জাতির অভ্যুদয় ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভাষা ও বিজ্ঞানে আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি?

অতি সামান্য ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য লইয়া যে কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করা যায় না কেন, তাহার ফল সামান্য বা ক্ষুদ্র ভিন্ন মহৎ হইতে পারে না। বিদ্যার্থিগণ কি আকাঙ্ক্ষা লইয়া বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করেন? কি আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া বিদ্যাভ্যাসে রত হন? কয়েকটা পরীক্ষা পাশ ও চাকরিই অধিকাংশ ছাত্রের জীবনের লক্ষ্য। অভিভাবকেরাও তাহাই কামনা করেন। এই ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে গেলে পাশ ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞান লাভ হওয়া সম্ভবপর নহে। ছাত্রগণ পুস্তকের মসীময় ছত্রগুলি জ্বররোগীর কুইনাইনের বড়ির ন্যায় গলাধঃকরণ করিয়া কোন প্রকারে জীবিকানির্ব্বাহের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে।

শিক্ষার চারিটী ফল,—ধর্ম্ম, জ্ঞান, সচ্চরিত্র ও পুস্তকের বিদ্যা। তন্মধ্যে পুস্তকের বিদ্যাই যৎকিঞ্চিৎ লাভ হয়, অপরগুলির সঙ্গে অনেকেরই বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হয় না। চাকরি লাভ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট,

শ্রান্ত-ক্লান্ত যুবক পাশের সহায়ভূত পুস্তকগুলিকে চিরকালের জন্য বিদায় দিয়া থাকে। বাঙালীর প্রায় সকল বিষয়েই অকালপক্কতা দৃষ্ট হয়। অকালে যৌবনোদ্গম, ইহা অকালকুসুমের ন্যায় ভয়োৎপাদক "অকাল কুসুমানীব ভয়ং সঞ্জনয়ন্তি হি।" অকালে সন্তানোৎপাদন, অকালে বার্দ্ধক্য বা জরা, অকালে সংসারে প্রবেশ, অকালে চিরতরে সংসারত্যাগ। পাশ্চাত্যদেশে চিরজীবন ছাত্রাবস্থা, তথায় অধিকাংশ লোক সংসারে প্রবেশ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিতে থাকেন, আর বাঙালী সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াই ভারতীর পায় চিরবিদায় যাচে। "Knowledge is power" 'জ্ঞানই শক্তি', একথা অনেক বাঙালীর জীবনে প্রত্যক্ষ হয় না। পঠদ্দশায় কেবল পল্লবগ্রাহিতাই জন্মে, কোন বিষয়ে পাকা জ্ঞান জন্মে না, মৌলিকতা বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মে না। একটী প্রিয় মনোমত বিষয় বাছিয়া লইয়া চিরজীবন তাহাতে অনুরক্ত থাকা বাঙালীর ভাগ্যে বড় ঘটে না, মনের বিচারশক্তি উন্মেষিত হইবার অবসর পায় না। আমরা ধনে জ্ঞানে সকল বিষয়েই স্বল্পে সন্তুষ্ট। স্বল্পে সন্তোষ উন্নতির অন্তরায়।

অশেষ বিদ্যালাভ করিয়াও যাহারা চরিত্রহীন, তাহারা বিদ্বান্‌মূর্খ। "শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ। যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।" শাস্ত্র পড়িয়াও লোক মূর্খ হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি শাস্ত্রের উপদেশানুসারে কার্য্য করেন, তিনিই প্রকৃত বিদ্বান্।

প্রাণপাত করিয়া পরোপকার করিবে, শাস্ত্রের এই উক্তি বার বার অধ্যয়ন করিয়াও যে কৃতবিদ্য ব্যক্তি পরের অপকারই করিয়া থাকে; সদা সত্য কথা কহিবে, এই উপদেশ বহুবার বহুগ্রন্থে পড়িয়াও যদি কেহ সত্যকথা না বলে, তবে তাহাকে মূর্খই বলিতে হইবে। সে ব্যক্তি বস্ত্রভারবাহী রজকগর্দ্দভ অপেক্ষাও অধম। পাশ্চাত্য পণ্ডিত লক্ (Locke),

সাহেবের মতে পুস্তকের বিদ্যা (Learning), শিক্ষার যাবতীয় ফলের মধ্যে অবম ও অকিঞ্চিৎকর। যাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পাশ্চাত্যদিগের ধারণা, আমরা কিন্তু তাহাকেই প্রথম, শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া বসিয়াছি। আমরা জ্ঞান-ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য-সুচরিত্র কিছুই চাই না, চাই শুধু মুখস্থবিদ্যা, চাই আধি-ব্যাধি লইয়া একটা উপাধি।

ভাষা।

বঙ্গভাষার আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের লেখনীধারণ-কাল হইতে এপর্য্যন্ত এত অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গভাষার যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া মন বিস্ময়-আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, বঙ্গভাষা মধু-বঙ্কিম প্রভৃতি সাহিত্যরথি-গণের নিকট যে ওজো-বল লাভ করিয়াছিল, তাহা এখন হারাইতে বসিয়াছে; কাব্যের বীররস মুমূর্ষু দশায় উপনীত হইয়াছে। বঙ্গভাষায়, কুঞ্জে কুঞ্জে, ফুলে ফুলে অলির গুঞ্জন, শুকসারীর প্রণয়সম্ভাষণ যথেষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মহারণ্যে সিংহনাদ, জলধির উদার উদাত্তরাগ কিম্বা বাত্যাবিতাড়িত জলদগর্জ্জন আর এখন বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। এ আক্ষেপের কোন কারণ আছে কিনা, তাহা বর্ত্তমান সাহিত্যরথী সুধী-সমাজই বিচার করিবেন। তবে একথা সত্য যে, ভাষার শক্তি বৃদ্ধিতে সমাজের বিশেষ লাভ আছে। ওজস্বিনী, শক্তিশালিনী ভাষা সমাজে শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকে। অবলা কোমলা ভাষা সমাজে বল দান করিতে পারে না। কেবল কুঞ্জবনের উপযোগী ভাষার সাহায্যে পৃথিবীর কোন জাতিই মহিমাশালী হইতে পারে নাই।

আমরা অনেকেই মুখে বলি, ভাষার উন্নতি চাই, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুব অল্প নহে, যাঁহারা আপনাদিগকে বঙ্গভাষায় অব্যুৎপন্ন বলিয়া প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না, যাঁহারা বঙ্গভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, যেহেতু ইহা মাতৃভাষা। কয়জন শিক্ষিত লোক বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থ কিনিয়া পড়েন? বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা ভিন্ন কয়জন বাঙালী গ্রন্থকার কেবল-গ্রন্থকার হইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? উপাদেয়, উৎকৃষ্ট গ্রন্থরচয়িতার ভাগ্যে প্রশংসা থাকিতে পারে, কিন্তু অর্থ নাই। বরং কুৎসিত, কুরুচিপূর্ণ উপন্যাসাদির বিলক্ষণ কাটতি আছে। যে শ্রেণীর গ্রন্থ সমাজের ও ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলজনক, সাধারণ্যে তাহার সমধিক প্রচলন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মিথ্যা গল্পের বই, উপন্যাস ও নানাবিধ চরিত্রস্খলনকারী পুস্তকের অত্যধিক আদর লোকের কুরুচিরই পরিচয় দিয়া থাকে। এ বিষয়ে বাঙালীর রুচি, গুণগ্রাহিতা, বিচার-ক্ষমতা ও অধ্যয়ন-স্পৃহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। যে সমাজে সদ্‌গ্রন্থের বস্তুতঃ সমাদর নাই, অথবা থাকিলেও অল্পমাত্র সে সমাজ অনুন্নত। মাতৃভাষার উপেক্ষা স্বদেশ-প্রীতির সম্পূর্ণ অভাবই প্রকটিত করে। প্রত্যেক কৃতবিদ্য বাঙালীর প্রতি মেঘের পানে তৃষিত চাতকিনীর ন্যায় দীনা বঙ্গভাষা সতৃষ্ণ-কাতর দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই শিক্ষিতগণ দীনা মাতৃভাষার সে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারেন।

বাঙলা ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার অনুশীলন একপ্রকার অপরিহার্য্য। পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রাচীন ভাষা (classical language) যত কম পড়া যায়, ততই ভাল। সুতরাং পর-প্রত্যয়-নেয়-বুদ্ধি আমরা অনেকেই তন্মতাবলম্বী।

সংস্কৃতভাষা বঙ্গভাষার জননী। বাঙলা ব্যাকরণ, সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুবাদ মাত্র। বাঙলার শব্দসম্পদ্ সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত। যদিও পাশ্চাত্য ভাবনিচয় বর্ত্তমান বাঙলাভাষাকে অলঙ্কৃত করিতেছে, তথাপি সংস্কৃতের নিকট এই ভাষা যে অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি জাতীয় সম্পত্তি সংস্কৃত-ভাষায় নিবদ্ধ। হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থসকল ঐ ভাষায় লিখিত। হিন্দুর স্তব-স্তুতি, পূজা,—সংস্কৃতে। চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, বিরাটপাঠ,—সংস্কৃতে। সন্ধ্যার মন্ত্র, শ্রাদ্ধের মন্ত্র, বিবাহের মন্ত্র,—সংস্কৃতে। স্নানের মন্ত্র, দানের মন্ত্র,—সংস্কৃতে। ব্রতকথা,—সংস্কৃতে, টোলের সংস্কৃত শিক্ষা,—সংস্কৃতে। যত দিন হিন্দুব নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে সংস্কৃতের ব্যবহার থাকিবে, তত দিন সংস্কৃত অধ্যয়ন প্রচলিত থাকা উচিত। কারণ, অর্থ বোধ কেবল পুরোহিতের নয়, যজমানেরও থাকা দরকার। যজমান সংস্কৃতজ্ঞ হইলে অজ্ঞ পুরোহিতের বিশেষ অসুবিধা হয় বলিয়া, অর্থ বুঝিয়া তদনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে বিরত থাকা যজমানের কর্ত্তব্য নহে। অর্থ বুঝা চাই, তা না হ'লে ভাব-ভক্তি আসিতে পারে না।

আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষার সহিত প্রাচীন গ্রীক্, লাটিন্ ভাষার যে সম্বন্ধ, বাঙলার সহিত সংস্কৃতের সেই সম্বন্ধ নহে। ইংরেজি প্রভৃতি উন্নত ভাষা, গ্রীক-লাটিনের সাহায্য গ্রহণ না করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, কিন্তু সংস্কৃতের সাহায্য না নিলে নবীনা বঙ্গভাষার সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করা যায়।

সংস্কৃত মৃতভাষা। মৃতকে স্পর্শ করিলেও অশৌচ হয়, সুতরাং মৃতের আদর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে, ইহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। এরূপ মত কেহ কেহ পোষণ করিতে পারেন, কিন্তু সংস্কৃতভাষা মৃত হইয়াও অমৃত-নিষ্যন্দিনী। ইহা সঞ্জীবনীসুধা। বাল্মীকি প্রভৃতি মহাকবিগণ

যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা হইতে হিন্দুগণ "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" সংস্কৃতভাষা মৃত হইলেও মৃতকে বাঁচাইতে, সুপ্তকে জাগাইতে, পাপীকে পুণ্যবান্ করিতে, চরিত্রহীনকে চারিত্র্যদান করিতে, অশান্তিতে সান্ত্বনা দিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মহারথিগণ—যাঁহারা বাঙলাগদ্যের জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, তাঁহারা সংস্কৃতের সাহায্য লইয়াই করিয়াছেন। ইত্যাদি নানা কারণে সংস্কৃত-অধ্যয়ন আমরা ছাড়িতে পারি না।

ইংরেজি বহুদেশপ্রচলিত উন্নত রাজভাষা। নূতনে পুরাতনে কোলাকুলি, মেশামেশি হওয়া আবশ্যক। ইংরেজি ও সংস্কৃত এই দুই ভাষার সাহায্যে বাঙলাভাষার পুষ্টিসাধন হইয়াছে, ও হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইংরেজিভাষা অর্থকরী বলিয়াই ইংরেজি বিদ্যায় জনসাধারণের মন আকৃষ্ট, কিন্তু ইহাতে বিদ্যাশিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। ভারত চিরকালই একাকী, বিচ্ছিন্ন, কিন্তু বর্ত্তমানে এরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকা আর শোভা পায় না। পৃথিবীর সভ্যজাতির সহিত যোগসাধনের দিন আসিয়াছে। এখন আর ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার দিন নাই। ইংরেজীভাষা পাশ্চাত্য সভ্যজাতির জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারস্বরূপ, এই দ্বার আমাদের জন্য বিধাতার কৃপায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চয় করিব; অর্থ সংগ্রহ অবান্তর ফলমাত্র। দেহের ন্যায় বাঙালীর মনটাও দুর্ব্বল। শক্তির সঞ্চয়, সঞ্চিত শক্তির পরিবর্দ্ধন যদি শিক্ষার প্রধানতম উদ্দেশ্য হয়, তবে আমাদের মন যাহাতে বলশালী হইতে পারে, সেইরূপ শিক্ষাই প্রশস্ত ও আদরণীয়।

বিদেশভ্রমণ।

পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে দেশ পর্য্যটন, শিক্ষার একটী অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। এই দেশেও বিদেশ ভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক। পুস্তকের বিদ্যা দেশপর্য্যটনে পরিপক্কতা লাভ করে। দূরদেশ-ভ্রমণে দূরদর্শিতা জন্মে, মনের সঙ্কীর্ণতা, একদেশদর্শিতা ও ক্ষুদ্রতা দূর হয়। যাতায়াতের পথে উন্মুক্ত প্রকৃতির নিকট যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে মন যেমন সরস সবল হয়, তেমনি আত্মনির্ভর ক্ষমতা, সংসাহস, দৃঢ়তা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণরাশি আসিয়া উপস্থিত হয়। ভারতবাসীর পক্ষে অন্ততঃ সমস্ত ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিলে অনেক জ্ঞান জন্মিতে পারে, কূপমণ্ডূকতা চলিয়া গিয়া হৃদয় প্রশস্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষের বাহিরে সমুদ্র পার হইয়া নানা সভ্যদেশ-পর্য্যটনে হিন্দুর একটা দুর্ব্বল সামাজিক বাধা আছে। কিন্তু সেই বাধা অতিক্রম করিয়া বিদ্যার্থী ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যাইয়া বিদ্যা-গৌরবে মণ্ডিত হইয়া যখন দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন তিনি যদি স্বীয় সমাজ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে থাকেন, সমাজের মঙ্গলসম্পাদনে যোগদান না করেন, সমাজের সুখ দুঃখে উদাসীন থাকেন, সমাজের দোষ দর্শন করিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তবে সমাজের ক্ষতি বই লাভ নাই। সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত, তিনিও সমাজকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ মনে করিলে, শুভ ফলেরই আশা করা যায়।

স্ত্রী-শিক্ষা।

পুরুষের পক্ষে জ্ঞানার্জ্জন যে সকল কারণে হিতকর ও অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, স্ত্রীজাতির পক্ষেও প্রায় সেই সকল হেতু বিদ্যমান। আলোক যদি উত্তম জিনিষই হয়, যদি সেবনীয় হয়; জ্ঞান যদি পশুত্ব দূর করিবার ক্ষমতা রাখে, তবে কেন স্ত্রী জাতিকে সেই উত্তম জিনিষের ভোগে বঞ্চিত রাখিব? প্রাচীন আর্য্য সমাজে রমণীদিগের উচ্চশিক্ষার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে স্ত্রী-শিক্ষার যে অবস্থা তাহাতে স্ত্রী-শিক্ষা নামে মাত্র আছে। বাল্যবিবাহ স্ত্রী-শিক্ষার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন। বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকদল, বোধোদয়ের বিদ্যায় বিদ্যাবতী, পত্র লিখনে কথঞ্চিৎ অভ্যস্তা যুবতীরমণীর সংসর্গে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন কি? চিরজীবন জ্ঞানের উপাসনা করিতে হইবে। কৃতদার হইয়াও করিতে হইবে। তখন জ্ঞানাবতার গণেশের অর্চ্চনা করিতে যাইয়া "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ," এই উপদেশটী কোন হিন্দুই ভুলিতে পারেন না। জ্ঞানার্জ্জন ধর্ম্ম, সুতরাং স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিবে, এই কথা ভুলিতে পারেন না, ভুলিলে অর্দ্ধাঙ্গে উন্নতি ও সুখ অসম্ভব হইবে।

সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেকই রমণী, ইহাদিগকে আঁধারে ফেলিয়া পুরুষগণের আলোক ভোগের আশা বিড়ম্বনামাত্র। বিদ্বান্ কি কখনও মূর্খের সঙ্গ কামনা করেন? অজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞতাকে আদর করিতে পারে বটে, কিন্তু বিজ্ঞের পক্ষে অজ্ঞতার প্রশংসা স্বাভাবিক নহে। মাতৃ-

কুল অজ্ঞ, অশিক্ষিত থাকিলে, শিশুশিক্ষার প্রচুর ব্যাঘাত হইয়া থাকে। নিজে অশিক্ষিতা থাকিয়া জননী, সন্তানকে কি শিক্ষা দিতে পারেন? শিশুসন্তান সৎশিক্ষা পাওয়া দূরে থাকুক, অনেক স্থলে বরং কুশিক্ষা, কুসংস্কার প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, শিক্ষিত হিন্দুপরিবারের কুললক্ষ্মীগণ প্রবাসে থাকিয়া, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় 'বার মাসে তের পার্ব্বণের' ধার ধারেন না। পুরাতন আকারের ধর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি যা ছিল, তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে, নূতন আকারের কিছু, সেই স্থান অধিকার করিবার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র হয় নাই, কাজেই দৃষ্টান্তদ্বারা শিশুগণের মনে ধর্ম্ম নামে কোন পদার্থের অস্তিত্ব-সংস্কার অঙ্কিত হইতে পারে না। মন্দ যাইয়া ভাল আসুক, ইহা উত্তম কথা, কিন্তু ধর্ম্মের ঘরে একেবারে শূন্য, ইহা কোন প্রকারেই শুভ লক্ষণ নহে। শিশুর পালন ও শিক্ষা অতি গুরুতর ও কঠিন কর্ম্ম। এ কার্য্যের ভার অশিক্ষিতা কোমলহৃদয়া অবলার হস্তে ন্যস্ত থাকিলে শুভ ফলের আশা করা বাতুলতামাত্র। ঈদৃশী জননী শিশু-হৃদয়ে মনুষ্যত্বের বীজ বপন না করিয়া বরং কাপুরুষত্বেরই বীজ বপন করিয়া থাকেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বিজ্ঞান।

প্রকৃতি-অধ্যয়ন (Nature-study) আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। ইদানীং বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে, ইহাতে আমাদের বড় আনন্দ। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কোন কৃতিত্ব আছে কি? গৌরব করিবার কিছু আছে কি? প্রকৃতির সহিত সুপরিচিত

হইতে না পারিলে, কেহই বৈজ্ঞানিক হইতে পারে না। পরের ভূয়োদর্শন, গবেষণা ও চিন্তাপ্রসূত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অপর সমাজের বাহ্যিক উন্নতি ও ক্ষণিক উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু নিজের অনুসন্ধিৎসা না থাকিলে, নিজে কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে না পারিলে, পরের আবিষ্কৃত তত্ত্ব আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে, সেই তত্ত্ব সম্যক্ রূপে স্থায়ীভাবে স্বেচ্ছামত উপভোগ হইতে পারে না। কেবল কর্জ্জ করা অর্থে কত দিন ভোগ চলে? কর্জ্জ করা বিদ্যায় আভ্যন্তরীণ বল বৃদ্ধি হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতের কতটুকু স্থান? সভ্যজাতিসকল হিন্দুকে চিনে না; যদি চিনে, তবে মানুষ বলিয়া চিনে না, কারণ, হিন্দুর কেবল আদান আছে, প্রদান নাই। আমরা তাঁহাদের নিকট বিজ্ঞানের জ্ঞান কেবল গ্রহণ করিতেছি, তাহাও নিতান্ত কার্পণ্য সহকারে, আংশিক ভাবে; কিন্তু সভ্যজাতি সকলকে কিছুই প্রতিদান করিতে পারি না। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে দাতাই বড়, দাতারই নাম-কাম। দেশমধ্যে প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানচর্চ্চার সবিশেষ প্রচলন না হইলে, বৈজ্ঞানিকের দল জন্মাইতে না পারিলে, সুখ-সভ্যতা-সুনাম, বর্ত্তমান যুগে অসম্ভব। প্রাচীন কালের হিন্দুরা অনেকেই দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়া সুখী হইতেন। তখনকার অন্যান্য জাতির তুলনায় তাঁহাদিগকে দার্শনিকের জাতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সেইরূপ বর্ত্তমান ও উত্তরকালের বাঙ্গালীদিগকে বৈজ্ঞানিকের জাতি করিতে হইলে, পাশ্চাত্য উপাদেয় বিজ্ঞানগ্রন্থসমূহ বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়া তাহা সাধারণ্যে প্রচার করা আবশ্যক। আবার শুধু পুস্তকের বিদ্যায় বিজ্ঞান শিক্ষা সম্যক্ ফলোপধায়িনী হইতে পারে না, যদি বস্তুর সহিত প্রকৃত পরিচয় না জন্মে।

কেবল বিজ্ঞানে নয়, প্রায় সকল বিষয়েই জনসাধারণের অজ্ঞতা বিস্ময়াবহ। এরূপ অজ্ঞতা কোন সভ্যদেশে আছে কিনা জানি না!

ঘরের বাহিরে কি হইতেছে, কেন হইতেছে, সে খবর পল্লীগ্রামবাসী ভদ্রাভদ্র নরনারী কেহই রাখেন না, রাখিতে ইচ্ছাও করেন না। কোথা হইতে কোন্ জিনিষ আসে, বা কোথায় কোন্ জিনিষ জন্মে, সে কথা তাহারা জানেন না। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ভূগোল পাঠ করে সত্য, কিন্তু শুধু পুস্তক অধ্যয়নে ও নকল মানচিত্র দর্শনে ভূগোল শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বিশেষ কোন ফল নাই, যদি আসল বস্তু দর্শনের আকাঙ্ক্ষা না জাগে, যদি স্বচক্ষে আসল বস্তু দর্শন না ঘটে।

পূর্ব্বপুরুষদিগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সুখ-দুঃখ কিরূপ ছিল, দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা-ই বা কিরূপ ছিল, এখনই বা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার একটা উজ্জ্বলচিত্র প্রত্যেকের হৃদয়ে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক; এবং ইহার জন্য প্রত্যেকেরই প্রাচীন ও বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসে প্রকৃত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অতীত ও বর্ত্তমানকে, দূর ও নিকটকে আমাদের আন্তর ও বাহ্য চক্ষুর নিকট ধরা চাই, হৃদয়ের ও দৃষ্টির শক্তিকে বাড়াইয়া তোলা চাই।

আমরা দেখিতে জানি না, দেখিতে শিখিব। বিশ্বজননী বিশ্ব গড়িয়াছেন, আর মানুষকে চক্ষু দিয়াছেন,—দেখিবার জন্য। আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি, প্রাণ ভরিয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লইব। এই দেখার উপরই সকল প্রকার জড়বিজ্ঞানের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।

আবার এই যে দেখা, ইহা কেবল জগতের বাহির লইয়া। জগতের অন্তরালে যে বিশ্ব-আত্মা মহাপ্রাণ আছেন, তাঁহাকে বহিরাবরণ ভেদ করিয়া—পর্দ্দাটাকে সরাইয়া, কবির হৃদয় লইয়া, জ্ঞাননেত্রে জ্ঞানী ভাবুক দেখিতে পান। এই দেখার উপর ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। আমরা বিশ্বের বাহির ও ভিতরের উভয় রূপই দেখিতে চেষ্টা করিব। জ্ঞান-দেবতা গণপতি আমাদের দর্শনকার্য্যে সহায় হউন।

দেবগণ ক্ষীরোদমথনে অমৃত লভিয়াছিলেন। আমরাও ভগবান্ গণেশের প্রসাদে জ্ঞানসমুদ্র মথিয়া অমৃত লভিব, জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমর হইব। "আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্।" (কেনোপনিষৎ)। আত্মবলে বীর্য্যলাভ, বিদ্যাবলে অমৃত লাভ হয়। আমরা জ্ঞানজননী ভগবতীর চরণে প্রণত হই। তাঁহার কৃপায় আমাদের চিত্ত শুদ্ধ-বিমল হউক, তাঁহার কৃপায় আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবুদ্ধ হউক।

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা ॥"

আমরা সেই দেবীকে বার বার নমস্কার করি, যিনি সকল জীবের অন্তরে জ্ঞানরূপে, বুদ্ধিরূপে বর্ত্তমান আছেন।

কার্ত্তিকদেবতা।

দেহ-বল।

"অন্নমূলং বলং পুংসাং বলমূলং হি জীবনম্।"

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি দুর্গাপূজা মহাশক্তির পূজা। কার্ত্তিকেয় সেই মহাশক্তির অংশভূত শক্তিবিশেষের মূর্ত্তি, বলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আমরা নিতান্ত দুর্ভাগ্য, আমাদের প্রতি এখন আর কোন দেবতাই প্রসন্ন নহেন। প্রকৃতপক্ষে দেবতাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমাদের আন্তরিক অনুরাগ নাই, কি প্রকারে পরিতুষ্ট করিতে হয় তাহা জানি না, জানিয়াও চেষ্টা করি না। দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে অতন্দ্রিতভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করিতে হয়। যে দেবতার যেরূপ গুণ বা শক্তি, আমরা জীবনে তাঁহার অনুসরণ করিয়া, সেই গুণ বা শক্তি আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইলে, দেবতা অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন।

কার্ত্তিকের প্রিয়বস্তু বল। যে দুর্ব্বল, যে বল চায় না, সে তাঁহার অপ্রিয়, সুতরাং এই দেবতাকে প্রসন্ন করিতে হইলে, বললাভ করিতে হইবে। বললাভই কার্ত্তিকপূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য। শক্তি অর্জ্জনই শক্তি-পূজার মুখ্যতম উদ্দেশ্য। দেবপূজায় কেবল পুরোহিত ঠাকুরের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। উপাসনা শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার বিশেষ; তাদাত্ম্য-লাভই উপাসনার উৎকৃষ্ট ফল, ইহাতে প্রতি-নিধি চলে না। বৎসরে এক দিন মাত্র কিছু টাকা ব্যয় করিয়া নৈবে-

ত্যাদি রচনা করিয়া ভোগ দিলেই দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন না। প্রতিনিয়ত নিয়মপূর্ব্বক দেবতার প্রিয়কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ উপাসনা করিলেই অভীষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা আছে।

দেহবল মনুষ্যত্ব লাভের প্রথম সোপান, সকল সুখের মূল। একথা সকলেই জানেন, জানিলে কি হইবে! আমরা জানি এক রকম, করি অন্যরকম। চাই আরাম, পাই ব্যারাম। বঙ্গ সমাজে যাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক, তাহারা ও তদীয় সন্তান সন্ততিগণ দিন দিন স্বাস্থ্যহীন হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; ইহা আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি, কিন্তু কোন প্রতীকারচেষ্টা হইতেছে না। আমরা ছোট বড় সকলেই গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় কেবল স্বাস্থ্যনাশের পথে ধাবিত হইতেছি। কোন চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই। বঙ্গসমাজ দুর্ব্বলতা বিষয়ে অদ্বিতীয়। পৃথিবীর কোন্ জাতি এত দুর্ব্বল, এত রুগ্ন? এ বিষয়ে পৃথিবীর কোন্ জাতি বাঙালীর সমকক্ষ?

যেমন প্রাচীন বৃক্ষের ফল-পত্র হ্রস্ব-খর্ব্ব হইতে থাকে, সেইরূপ এই প্রাচীন হিন্দুসমাজ সকল বিষয়েই জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এখন এই সমাজবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ না করিয়া, যাহাতে জীর্ণ শীর্ণতা দূর হইয়া সজীবতা জন্মে, সে বিষয়ে সার্ব্বজনীন উদ্যম আবশ্যক।

বঙ্গসন্তানের দুর্ব্বলতার যে সকল কারণ পরিদৃষ্ট হয়, এ স্থলে তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) মাতাপিতার দুর্ব্বলতা। (২) শারীরিক-শ্রমের অভাব। (৩) স্বাস্থ্যপালনে অজ্ঞতা বা উপেক্ষা। (৪) খাদ্যের দুর্লভতা। (৫) ইন্দ্রিয়ের অসংযম।

(১)

মাতাপিতা।

মাতাপিতা দুর্ব্বল হইলে সন্তান অবশ্যই দুর্ব্বল হইবে। হিন্দুবালিকা দ্বাদশ ত্রয়োদশ বর্ষে সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বঙ্গসমাজে বিরল নহে। বালিকা-জননীর অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়সকল সম্যক্ পরিপুষ্ট না হইতেই তিনি যে সন্তান প্রসব করেন, সেই সন্তান কখনও আশানুরূপ হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে না, এবং নিজেও অপুষ্ট সন্তান প্রসব করিয়া রুগ্ন হইয়া পড়েন। যদি বা সৌভাগ্যবশতঃ রুগ্ন না হন, তা হইলেই বা কি প্রকারে সেদিনকার অশিক্ষিতা তরলমতি বালিকা নবজাত শিশুর লালন পালনে সমর্থা হইবেন? বঙ্গের ভদ্ররমণীগণ ননীর পুতুল, কোমলাঙ্গী, ইহারা ননীর পুতুল ভিন্ন আর কি প্রসব করিতে পারেন? আমরাও শিশুর 'নবনী জিনিয়া তনু অতি সুকোমল' দেখিয়া সুখী হই। অনেক প্রসূতিই সূতিকারোগে আক্রান্ত; ভদ্রমহিলারা প্রায়ই দুই একবার প্রসবের পর চিররুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করেন। এই প্রকার রোগগ্রস্ত যুবতীর জীবন "ন যযৌ ন তস্থৌ"—না গেল না রৈল গোছ হইয়া কেবল ক্লেশের আধার হইয়া পড়ে। তখনকার সন্তান সুস্থ পুষ্ট হইবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত। বালিকা জননীর ন্যায় অনেক স্থলে অপরিপক্ক বালক, সন্তানের জনক। স্কুল কলেজে অধ্যয়ন কালেই কৃতদার ছাত্র দুই একটী সন্তানের পিতা হইয়াছেন। সন্তানের রুগ্নতা ও দুর্ব্বলতা এই প্রকার অপ্রাপ্তবয়স্ক মাতাপিতার দোষে জন্মিয়া থাকে। এ বিষয়ে মাতাপিতার কত দায়িত্ব তাহা অপ্রাপ্তবয়স্ক জনকজননী আদৌ বুঝিতে পারে না।

সন্তান উৎপাদন অতীব দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর কার্য্য। কামপরবশ,

স্বেচ্ছাচারী হইয়া সন্তান উৎপাদন করিলে, সেই সন্তান কালে অজিতেন্দ্রিয় হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সাধ্বী সাবিত্রীর পিতা সংযমী হইয়া অপত্য উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়াই সাবিত্রী, সাবিত্রী হইতে পারিয়াছিলেন। মহাভারতকার লিখিয়াছেন—

অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ
কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
হুত্বা শতসহস্রং স সাবিত্র্যা রাজসত্তমঃ
ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদাকালে বভূব মিতভোজনঃ॥

নৃপতি অশ্বপতি অপত্য উৎপাদনের নিমিত্ত তীব্র সংযম অবলম্বন করিলেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী হইলেন। নিয়মিতাহারী হইয়া সাবিত্রীদেবীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। হুতাশনে লক্ষ আহুতি প্রদান করিলেন। সন্তান উৎপাদন গৃহীর ধর্ম্ম। কামাতুর না হইয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক সন্তান উৎপাদন করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়। অশ্বপতি তাহা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অতি তেজস্বিনী পূতচরিত্রা সাবিত্রীর জন্ম হইল। যৌবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে পিতামাতা বিশুদ্ধ ও সংযতচিত্তে সন্তান উৎপাদন করিলে, সন্তান সুস্থ হইতে পারে, আশা করা যায়।

বাল্যবিবাহ অসংযমের জনক না হইলেও সহায়।

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।" মনু।

ত্রিশবৎসর বয়স্ক যুবক দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। ত্রিশ বৎসর বয়সে পুরুষের বিবাহ করিতে হইবে, আগে নয়, এ ব্যবস্থায় অনেকেই হয়ত রাজি হইবেন না। কুলীন পিতা পুত্রটীকে অল্প বয়সে বিবাহ করাইয়া কত পাইবেন, পুত্রের জন্মের পর হইতেই কত আশা করিয়া বসিয়াছেন। নগদ টাকা, দানসামগ্রী, তার উপর পড়ার সম্পূর্ণ

খরচ, এই লোভ সম্বরণ করা কি সহজ কথা? কৌলিন্যপ্রথা বাল্য-বিবাহের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছে।

(২)

শারীরিক শ্রমের অভাব।

শ্রমজীবী ছোটলোক অপেক্ষা মসীজীবী ভদ্রলোকেরা অধিকতর ক্ষীণ-জীবী ও দুর্ব্বল। কেন? কারণ, ইহারা শারীরিকশ্রমে একান্ত অন-ভ্যস্ত ও অপটু। এমন সংস্কারও সমাজে বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, শারীরিক শ্রমে ভদ্রলোকের ভদ্রতা থাকে না, মানসম্ভ্রম থাকে না। পরিশ্রম কেন ভদ্রলোকে করিবে? তাহ'লে ভদ্র ও ইতরে কি ইতরবিশেষ রহিল? ছোটলোকে আর ভদ্রলোকে কি প্রভেদ রহিল? এরূপ ধারণা যে সর্ব্বনাশের মূল! বড়লোকেরা এমন কি দরিদ্র ভদ্রলোকেরাও শ্রম-বিমুখ হইয়া রুগ্ন, দুর্ব্বল হইতেছেন এবং মানমর্য্যাদা, ভদ্রতা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য সন্তানগুলিকে শ্রমপরাঙ্মুখ করিয়া তুলিতেছেন। ইহাতে তাহাদের যে স্বাস্থ্যভঙ্গ, দুর্ব্বলতা জন্মিতেছে তাহা ভাবেন না। আবার স্বর্ণকার, দোকানদার প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ দোকানে প্রায় সারা দিন বসিয়া বসিয়া জড়প্রায় হইতেছে।

আমরা যদি বাহিরের দিকে একবার চক্ষু মেলিয়া দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাইব যে, পাশ্চাত্যজাতিসমূহের মধ্যে ভদ্র, অভদ্র, ধনী, নির্ধন, সকলেই শারীর শ্রমের একান্ত পক্ষপাতী ও তাহাতে অভ্যস্ত, ইহাতে তাহাদের বিশেষ আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি। ইহারা নিয়মিত শারীরশ্রম-জনক ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিয়া সুস্থদেহে সুখে দীর্ঘ জীবন যাপন করি-

তেছেন। ইহারা কেমন বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায়, যেন,—"ব্যঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শাল-প্রাংশু র্মহাভুজঃ।" ইহাদের বক্ষঃ বিশাল, স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায় মাংসল, আকৃতি শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, বাহু আজানুলম্বিত। আর ভদ্রসন্তান আমরা, আমাদের অপ্রশস্ত বুক, কফের আধার; শিথিল স্থূল খর্ব্বকায়, ক্ষুদ্র বাহু, লম্বোদর! স্বদেশবাসীদিগকে শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নতকায় দেখিতে ও বর্ণনা করিতে ভারতীর বরপুত্র ভারতের প্রেমিক কবির কত গর্ব্ব ও আনন্দ হইত। ইংলণ্ডের কোন প্রেমিক কবিও গাহিয়াছেন—"The hearts of oak are our ships. The hearts of oak are our men." ওক্ বৃক্ষের সারে আমাদের জাহাজ, ওক্‌বৃক্ষের সারতুল্য আমাদের দেশবাসী। বাস্তবিক স্বদেশবাসী ওক্‌বৃক্ষের ন্যায় দৃঢ়কায় ও দৃঢ়মনা হইলে কোন্ প্রেমিক কবির মনে গর্ব্বমিশ্র আনন্দ না জন্মে? আমরা "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং" বচনটী স্মরণ করিতে করিতে নিজকে ও অপরকে আশ্বস্ত করিতেছি। শরীর থাকিলেই রোগ হইবে, রোগ লইয়াই সংসারে বিচরণ করিতে হইবে! সহ্যগুণ বড়গুণ! ব্যাধিটাকে বাঙালী যেমন জীবনের সহচর করিয়া লইয়াছে, এমন আর কে পারিয়াছে? এ বিষয়ে বাঙালী সকলকে জিতিয়াছে। আমরা ক্রমেই খর্ব্ব হইতে খর্ব্বতর হইতেছি, শেষে বুঝি বেগুনতলা হাট বসিবার কথা ফলে। লিলিপুটিয়ান্‌দের (Liliputian) কথা শুনিয়াছি, আমাদেরও বুঝি বা সেই খর্ব্বতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জাতীয় দৈহিক খর্ব্বতা আমাদিগকে সকল বিষয়ে খর্ব্ব করিয়া তুলিবে। এই খর্ব্বতা লইয়া অন্যান্য সভ্যোন্নত জাতির সহিত পরীক্ষা ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার প্রতিযোগিতায় উপহাস বই আর কি লাভ আছে?

ভদ্রসন্তানের শারীরিক শ্রমের বিধান কোন কালেই নাই; না বাল্যে, না যৌবনে, না বার্দ্ধক্যে। স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে কি প্রকারে? বহু

রোগের নিদান অজীর্ণরোগ ও বহুমূত্ররোগ এই উভয়ের সহিত বহু ভদ্র-সন্তানের চিরদিনের জন্য প্রণয়-পরিচয় জন্মিয়া থাকে; কেন? শ্রমাভাবই ইহার প্রধান কারণ। চাকরি ব্যবসায়ী পুরুষ তবু চাকরির খাতিরে আফিসে ও আফিস হইতে বাড়ীতে যাওয়া আসা করেন, ইহাতে তাহার অঙ্গের একটু নাড়াচাড়া পড়ে, কিন্তু বঙ্গমহিলার কি দশা! বঙ্গীয় ভদ্রকুল-রমণী ত গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ বিহঙ্গিনী। গৃহ-পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়াও শরীর খাটাইয়া অনেক গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাদের স্বাস্থ্যোন্নতিবিধায়ক কোন কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা নাই! যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। প্রবাসীস্বামীর সহবাসে প্রবাসিনীরা শ্রমের কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক; ইচ্ছুক যাহারা, তাহারাও বড় সুযোগ পান না। যাহারা ধনী বা কিঞ্চিৎ উন্নত পদস্থ, তাহাদের কামিনীরা কোন কাজেই হাত দিতে চান না, দেন না। দাস-দাসী, পাচকের উপর গৃহকার্য্যের ভার। শ্রমাভাবে প্রকৃতির কঠোর নির্ম্মম শাসন পুরুষের ন্যায় রমণীর উপরও অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে, সুতরাং উভয়েরই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শারীরশ্রমের সুব্যবস্থা থাকা উচিত, একথা বলিলে কেহ কেহ হয়ত আমাদের উপর বিষবাণ বর্ষণ করিবেন, কিন্তু তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, পুরুষেরা নিজে শারীরশ্রমরূপ প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যেমন অধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, রমণীদিগকেও সেই শ্রমে বঞ্চিত রাখিয়া পাপের ভার দ্বিগুণ করিতেছেন। এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? অবশ্যই শিক্ষিতসমাজ। শিক্ষিতপুরুষমাত্রই ইহার জন্য দায়ী! কারণ, তাহারাই অধিকতর দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছেন। সমাজ বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝা যায়, তাহা বড় দুর্ব্বল, সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিকারের ইচ্ছা ও চেষ্টা আবশ্যক। স্ত্রী-পুরুষ বলিষ্ঠ, সুস্থ না হইলে কখনও সন্তান বলিষ্ঠ ও পুষ্টাঙ্গ হইতে পারে না।

(৩)

স্বাস্থ্যপালনে অজ্ঞতা বা উপেক্ষা।

যতই দিন যাইতেছে, যতই পৃথিবীর বয়স বাড়িতেছে, পৃথিবী ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এই কথা শুনিয়া আমরা মনে করি, আমরাও উন্নতির পথে চলিয়াছি। কিন্তু স্বাস্থ্যবিষয়ে আমরা উন্নতির পথে না অবনতির পথে? অবনতির পথে যে চলিয়াছি, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ আছে কি? অনেকেই বোধ হয় সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছেন যে, তাহাদের পিতা, পিতামহ যেরূপ সবল সুস্থ ছিলেন, তাহারা নিজে সেরূপ নহেন, অনেক দুর্ব্বল, সন্তান আরও দুর্ব্বল। পিতা পিতামহ হয়ত জীবনে কোন দিন ঔষধ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু আজকাল ঔষধ, নিজের ও সন্তানগণের একটী নিত্য আহার্য্য বস্তু মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। প্রায় প্রতি পরিবার এক একটী ক্ষুদ্র হাসপাতাল হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার কবিরাজ বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহ আসিতেছেন, কত ঔষধসেবন, কত অর্থব্যয়, কত অশান্তি! কেন এমন হইল? এ দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা অত্যধিক; তাহারা ত স্বাস্থ্যের মূল্য কত, স্বাস্থ্যরক্ষা কাহাকে বলে জানেই না, জানিবার ইচ্ছাও রাখে না, কিন্তু যাহারা শিক্ষিত, তাহারাও স্বাস্থ্যের নিয়ম পালনে উপেক্ষা করিয়া থাকেন; না নিজের, না সন্তানগণের স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য শারীর শ্রমাদির ব্যবস্থা করেন। বিদ্যার্থী বালকগণ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা পাইলেও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে গৃহে কোন রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ভদ্র পরিবারে ব্যারাম হইলে চিকিৎসা হয় বটে, কিন্তু রোগ জন্মাইয়া রোগ-প্রতীকারের চেষ্টা অপেক্ষা রোগ যাহাতে জন্মিতে না পারে, পূর্ব্বাহ্লে সে

বিষয়ে যত্নবান্ ও সাবধান হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। কোন কোন রোগ চোরের মতন লুকাইয়া দেহ-গৃহে প্রবেশ করে। কিন্তু গৃহস্থ সজাগ থাকিলে চোর আসিতে সাহস করে না।

বাঙালীর অনেক বিষয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, উপেক্ষার ভাব দেখা যায়। ইহা কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক, নিতান্ত অনিষ্টকর। স্বাস্থ্য রক্ষা করা, শরীরটাকে সবল করা যে কর্ত্তব্য, এ ধারণাই যেন আমাদের নাই। পিতা মাতা সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত, শিক্ষকগণও নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলির পত্র-ছত্র পড়াইয়া ছাত্রের প্রতি দৈনিক কর্ত্তব্যের সমাধা করেন। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে কে? স্কুল কলেজের বালকবৃন্দ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষ্যস্থল। যাহারা শৈশব পার হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, যাহাদের বসন্ত ঋতু সমাগত-প্রায়, তাহাদের বিবর্ণ মুখমণ্ডল, কোটরগত অক্ষি, ক্ষীণ দেহ-যষ্টি, ম্লানকান্তি দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির মনে নিদারুণ আঘাত না লাগে! সহৃদয় শিক্ষক মহাশয় হয়ত উপদেশ দিয়া থাকেন,—ছাত্রগণ! তোমরা কৃত্রিম-দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিও না, উহা তোমাদিগকে প্রতারিত করিবে, প্রকৃত প্রতিরূপ দেখাইতে সমর্থ হইবে না। অকৃত্রিম মুকুরে তোমাদের নিজ নিজ দেহের অবস্থাটী বুঝিতে চেষ্টা কর। যৌবনের কুহকে ভুলিয়া ভবিষ্যৎকে নিবিড় কালিমাময় করিও না, আত্মবঞ্চনা করিও না। স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী সাধারণভাবে জানিয়া পালন করিতে বদ্ধপরিকর হও। বিলাতের স্কুলে ক্লাসের মধ্যে যে বালক পড়াশুনায় উৎকৃষ্ট, তাহা অপেক্ষা কুস্তিগীর (athletic) বালকের মান অধিক।* কারণ, "শরীর-মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" শরীরই ধর্ম্মের প্রথম সাধন। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে, শরীর প্রচুর বলশালী হইলে, ধনবিদ্যা সকলই সুলভ হইতে

* ইংরেজচরিত ২য় ভাগ। গিরিশচন্দ্র বসু।

পারে। তৈলভাণ্ডে ছিদ্র থাকিলে তৈল পড়িয়া যায়, দেহ-ভাণ্ডটাও টুটিয়া ফাটিয়া গেলে, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের স্নেহ ঝরিয়া পড়িবে। কেবল বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তোমাদিগকে অনেক পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে। স্বাস্থ্যে জলাঞ্জলি দিয়া, শরীরটাকে মাটি করিয়া, কতকগুলি পাশ লইয়া, তোমরা জীবনে কি সুখ ভোগ করিবে? তোমরা শতবার শুনিয়াছ, সুখের মূল স্বাস্থ্য, উন্নতির মূল স্বাস্থ্য। তোমরা সুখ চাও, উন্নতি চাও সত্য, কিন্তু স্বাস্থ্যের অভাবে সুখ ও উন্নতি আকাশকুসুম। কিন্তু হায়! শিক্ষকমহাশয়ের এই কাতর-করুণ কথায় কে কর্ণপাত করে?

স্বাস্থ্যরক্ষার মূলসূত্র বিশুদ্ধতা। বিশুদ্ধ পানীয়, বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ আহার, এবং বিশুদ্ধ দেহ ও মনের উপরই স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

(৪)

খাদ্যপ্রভৃতির দুর্ল্লভতা।

পানীয়।

আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। ভাতে সার অতি অল্প। প্রথমতঃ ধান সিদ্ধ করিয়া চাউল তৈয়ার করিবার সময় কতকটা সার চলিয়া যায়, যে কিছু সার অবশিষ্ট থাকে, তাহাও রন্ধনকালে মাড়ের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। এক পোয়া চাউলে যদি আধ সের ভাত হয়, তবে চাউল এক পোয়া এবং জল এক পোয়া পাওয়া গেল। ইহাই ত আমাদের প্রধান আহার। দাল তরকারী প্রভৃতিতেও জলের ভাগ কম নহে।

জলের এক নাম জীবন। ফলতঃ জল আমাদের জীবনই বটে। জলে স্নান, জল পান, আহারীয় দ্রব্যে জল, জল ভিন্ন আমাদের এক দিনও চলে না। সুতরাং জলটা খুব বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। অনেক পল্লীগ্রামে জলের অবস্থা দেখিলে চোখে জল আসে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে পুকুরের জল প্রায় শুকিয়ে যায়, যা একটু কাদামাখা তপ্ত জল থাকে, তাহাতে একদিকে গরু বাছুর স্নান করিয়া জলের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে, অপর দিকে গ্রামের নরনারী দুপুরের রোদে স্নান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে, এবং সেই জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। নগরবাসীরা অনেক স্থলে, সুবিধা সত্ত্বেও সভ্যতার খাতিরে অবগাহন স্নান করেন না বটে, কিন্তু পল্লীবাসীরা হিতকর বিবেচনায় জলে নামিয়া স্নান করেন। আগে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য পুণ্যকর্ম্ম বিবেচনায় জলাশয় খনন করাইয়া উৎসর্গ করিতেন, কিন্তু এখন আর সে ধর্ম্মভাব নাই, এখন পুণ্যের স্রোত অন্য দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

সুতরাং এইরূপ নূতন জলাশয় এখন আর বড় হইতেছে না। পুরাতন যা আছে, তাহাও সংস্কারাভাবে অব্যবহার্য্য। গ্রাম্য ধুরন্ধরগণ কার নামে নালিশ করিবে, কার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে, কার ধোপা নাপিত বন্ধ করিবে, কারে একঘ'রে করিবে, এই সব মহাব্যাপার নিয়া দিনরাত মহা ব্যস্ত! জলাশয়সংস্কার তাহাদের কল্পনার ত্রিসীমায়ও আসে না। পাটোয়ারি বুদ্ধি ইহাদিগকে মাতব্বর করিয়াছে, তাই ইহারা নিজকে বড় মনে করে; কিন্তু বোঝে না যে, ইহাদের জীবন পল্বলের ন্যায় পঙ্কিল, ক্ষুদ্র ও তপ্ত। সুখের বিষয় এই যে, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বা স্থানীয় বোর্ড জলকষ্ট নিবারণের জন্য নানা স্থানে জলাশয় খনন করাইয়া দিতেছেন।

বায়ু।

জলের ন্যায় বায়ুও আমাদের প্রাণ। যোগিগণ প্রাণায়াম প্রভৃতি উপায়ে বাহিরের বিশুদ্ধবায়ু গ্রহণ করিয়া, ভিতরের অপবিত্র বায়ু বাহির করিয়া দিয়া, সুস্থ সবল ও দীর্ঘজীবী হইতেন। বিশুদ্ধবায়ু আয়ুবৃদ্ধি করে, ইহা যে মহা উপকারী, প্রাণদ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্ন-জলের ন্যায় বায়ুও জীবন ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। বিশুদ্ধবায়ুর একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা যতই অধিকপরিমাণে অন্তঃস্থ কর না কেন, অসুখ হইবে না, বরং উপকারই হইবে। কিন্তু অন্ন-জল অতিরিক্ত মাত্রায় উদরস্থ করিলে উদরাধ্মান প্রভৃতি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। ঈশ্বরপ্রদত্ত এই সুবিধা ভোগ করিতেও আমরা নারাজ! ধন্য আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি, ধন্য আমাদেব উন্নতির আকাঙ্ক্ষা! অমিত-ভোজী পেটুকের দলও যথেচ্ছ বিশুদ্ধবায়ু গ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছুক। গ্রাম অপেক্ষা সহরে বিশুদ্ধবায়ু দুষ্প্রাপ্য। দুষ্প্রাপ্য হইলেও অন্নজলাদির ন্যায় নহে। জলের জন্য নগরবাসীর ট্যাক্স দিতে হয়, অর্থ ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কাহারো বায়ু কিনিতে হয় না, ট্যাক্সও দিতে হয় না। বায়ু সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। জলসমুদ্রে জলচর জীবের ন্যায় আমরা বায়ু-সমুদ্রে বিচরণ করি। কিন্তু সহরে লোকাধিক্য ও অন্যান্য কারণে বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। বায়ুসেবনার্থ বিমলবায়ু-বহুল স্থানে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভ্রমণ করা যে আবশ্যক একথা আমরা জানিয়াও জানি না, বুঝিয়াও বুঝি না। অর্থাভাববশতঃ উত্তম, উপাদেয় অন্নজল সংস্থান না হইতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ত আমরা বিনামূল্যে প্রাপ্য বিমল বায়ু ভোগ করিতে পারি, তাহাও আমরা করি না, কেন? অলসস্বভাবই ইহার প্রকৃত কারণ নহে কি?

আমাদের বাড়ীর চারিদিকের বায়ুকে যথাসাধ্য বিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বাসগৃহে নির্ম্মলবায়ু প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিবার এবং গৃহাভ্যন্তরস্থ দূষিতবায়ু বহির্গত হইবার প্রশস্ত উপায় থাকা আবশ্যক। অধুনা টীনের ঘর আর্থিক উন্নতির প্রথম উল্লাস, এবং তাহাতে বাস করা বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ধনীর ইষ্টকালয় ত উত্তমই বটে, কিন্তু দীনের পর্ণকুটীরও টিনের ঘর অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালে দুপুরের রোদে ডজন খানেক টিনের ঘর লইয়া এক একখান বাড়ী যেন এক একটী অগ্নিকুণ্ড! তত্রত্য নিশ্চল স্তিমিত বায়ু যেন অগ্নিকণা বর্ষণ করিতে থাকে। তখন কি ঘরে, কি বাহিরে, কোথাও তিষ্ঠিতে পারা যায় না। প্রাণ আইঢাই করে। গৃহ-ছাদের তাপ, তালু ভেদ করিয়া সমগ্র মাথাটাকে সমস্ত দিনরাত গরম করিয়া রাখে। টিনের ঘরের অপকারিতার এই প্রকার জ্বলন্ত প্রমাণ পাইয়াও উহাতে বাস করিতে কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই কেমন একটা জীবন্ত উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা যায়। এই বৈজ্ঞানিকযুগে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অত্যধিক সমাদর, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও কেমন আগ্রহের সহিত উপেক্ষা করি! শরীর দগ্ধ হয়, মন তাহা বিশ্বাস করে না। খড়েব ঘর অপেক্ষা টিনের ঘরে বাস করা কোন কোন বিষয়ে সুবিধা আছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের কাছে অন্য কোন কারণই বলবৎ হইতে পারে না।

আহার।

খুব খাও আর হজম কর, শরীর ভাল থাকিবে। অবশ্য ভাল জিনিষই খাইতে হইবে, এবং ভাল করিয়া হজম করিতে হইবে। শারীরিক পরিশ্রম না করিলে ভুক্তদ্রব্য ভালরূপ হজম হয় না, ক্ষুধা জন্মে না।

অক্ষুধায় অমৃতও গরল, ক্ষুধায় গরলও অমৃত। আমাদের অস্থি-মাংস-শুক্র-শোণিত-সমন্বিত শরীরটা ভুক্তদ্রব্যের পরিণতি। সুতরাং ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রতি সর্ব্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কিন্তু ভাল খাঁটি জিনিষ ত আজকাল দুর্লভ হইয়াছে।

খাদ্যদ্রব্যের উপর যেরূপ অত্যাচার ও কৃত্রিমতা চলিয়াছে, এমন আর কিছুতেই দেখা যায় না। গব্য জিনিষ, যথা টাট্‌কা গাওয়া ঘি, বিশুদ্ধ গাওয়া দুধ, অতি উপাদেয় ও বলকারক। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" টাকা না থাকে, ঋণ করিয়া ঘি খাও। অবশ্য ঋণ করিবার উপদেশটা অনুমোদনীয় নহে, তবে একথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপেই হউক ঘি খাইতেই হইবে, ঘির মতন এমন উপকারী, ওজোবলবৃদ্ধিকারক এবং মস্তিষ্ক ও শরীরের পরিপোষক আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই বলিলেই হয়। বিশুদ্ধ গাওয়া ঘি খাওয়া চাই, কিন্তু কোথায় পাই? অনেক সহরেই ত খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায়—নালা ডোবার জল মিশান কিংবা বাসি দুধ। গাওয়া ঘি পাওয়া যায় না, পাওয়া যায়—চর্ব্বিমিশ্রিত ভেজাল ঘি। তারপর মাছ তরকারি, তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় সুলভ নহে, অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। দুর্ম্মূল্য হইলেই অর্থাভাববশতঃ বাধ্য হইয়া আহারের মাত্রা কমাইয়া দিতে হয়। বাঙালী কি খায়, কি খাইয়া বাঁচে? আমাদের সে দিকে বড় একটা দৃষ্টি নাই, খাওয়াটা যেরূপই হউক না কেন, তাহা কে দেখিতে আসে? দুধ ঘি যেমন তেমন হইলেই হইল, না হয় নাই বা হইল, কিন্তু পোষাকটা ভাল হওয়া চাই। দামী জুতা, রেশমীচাদর, চেইন ঘড়ি, ছড়ি, এ সব চাই, এ না হইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় কৈ? পরিধানে ফিন্‌ফিনে ধুতি ও নাকে চশমা লইয়া বাবু সাজিয়া, বায়ুর আগে হেলিয়া দুলিয়া দু'চারি গজ বেড়াইয়া বেড়াইলে প্রথম যৌবনের সার্থকতা হয় না কি?

পাঠ্যাবস্থায় বালককাল হইতে বাঙালীর অল্পাহারে অভ্যাস, অল্পাহার করিতে করিতে পেট যেন মরিয়া যায়, শেষে আর পুষ্টিকর জিনিষ উদরস্থ হইতে চায় না, ঘি সহ্য হয় না, খাইলেই অজীর্ণরোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। আক্‌বরের প্রিয় সচিব আবুলফজলের দৈনিক আহারের পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধ মণ ছিল। রামমোহন রায়ও কাবুলীদিগের ন্যায় একটা পাঁটা খাইয়া অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারিতেন। শরীরে বলও তেমনি ছিল। একদিকে প্রতিভা-বহ্নি, অপর দিকে জঠর-বহ্নি উভয়েরই বলে অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি সমাজ সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে,—যে বয়সে আজকাল আমাদের অনেককেই জরা আসিয়া আক্রমণ করে ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। ইঁহাদের খাদ্যের পরিমাণের সহিত আমাদের খাদ্যের পরিমাণ তুলনা করিলে, আমরা একপ্রকার অনাহারে আছি বলা যাইতে পারে। "প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসী গড়ে প্রতিবৎসর ৬০০৲ টাকার খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়া থাকে। ভারতবাসী ২০৲ টাকার দ্রব্যও আহার করে কি না সন্দেহ"।* আবার যাহা খাই, তাহাও জীর্ণ করিতে পারি না। অজীর্ণ অন্ন দেহের বিষম শত্রু, সুজীর্ণ অন্ন পরম বন্ধু। সুজীর্ণ অন্নই রক্তরসে পরিণত হইয়া দেহকে রক্ষা করে, দেহের বল বৃদ্ধি করে। অন্নের সুপরিপাক ও ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য শারীরিক শ্রম একান্ত আবশ্যক, কবিরাজের পরিপাকের বড়ি অপেক্ষাও অনেক উপকারী। আমাদের বুদ্ধিমান্ মন একথা বিশ্বাস করে, কিন্তু অচল দেহটা কিছুতেই একথায় সায় দেয় না।

মিষ্টান্ন—বালকেরা সাধারণতঃ মিষ্টান্ন-প্রিয়। মিঠাই খাইতে তাহারা বড় ভালবাসে। ময়রারাও করুণহৃদয় পতিতপাবন। মুদি দোকানে যে ময়দা ঘি বিকায় না, ময়রারা দয়াপরবশ হইয়া তাহা

* সঞ্জীবনী ১৫ ফাল্গুন, ১৩১৯ সাল।

স্বলভমূল্যে কিনিয়া উপাদেয় মিঠাই তৈয়ার করে। ফেরিওয়ালারাও লালমোহন, ক্ষীরমোহন সাজাইয়া সরলচিত্ত বালকদিগের মন ভুলাইয়া রসনার তৃপ্তি সাধনে একান্ত যত্নবান্। এই গুলির নাম মিষ্টান্ন না রাখিয়া বিষান্ন রাখাই সঙ্গত।

ইহাতে যেমন অর্থের তেমনি স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে। কেবল রসনার লাম্পট্য বৃদ্ধি পায় মাত্র। এরূপ মিষ্টান্ন না খাওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ, এ কথায় বালকদিগের ক্রোধ হইবে বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত, মিঠাই খাইলে বল বাড়ে কি না, উপকার আছে কি না। যাহাতে বলহানি হয়, তাহা লোভনীয় হইলেও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। আমাদের আদর্শস্থানীয় পাশ্চাত্য-সভ্য-দেশবাসীরা ত এইরূপ মিষ্টান্নপ্রিয় নহেন। পয়সা ব্যয় করিয়া ব্যারাম কিনিয়া লওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম নয় কি ?

পূর্ব্বে অনেক খাদ্যদ্রব্যই ঘরে তৈয়ার হইত। গো-পালন গৃহস্থের ধর্ম্ম ছিল। নানাবিধ উপাদেয় গব্য জিনিষ গৃহে তৈয়ার হইত। সেই সব সদ্যঃ-পবিত্র দ্রব্য আহার করিয়া মনের তৃপ্তি ও দেহের স্বাচ্ছন্দ্য জন্মিত। বাড়ীতে ধান ভানিয়া টাট্‌কা চাউল প্রস্তুত করা হইত, তাহাতে অম্লরোগের প্রাবল্য দেখা যাইত না, কিন্তু এখন আমরা বিলাসিতায় মজিয়াছি। পরের হাতে সব সঁপিয়া দিয়াছি। অন্যে আমাদের জন্য পরিশ্রম করিয়া অন্ন প্রস্তত করিয়া দিবে, আমরা সুখে অনায়াসে বসিয়া বসিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিব ও স্বাস্থ্য বজায় রাখিব !

বঙ্গদেশের হোটেলগুলি অপবিত্রতার আধার। কোন কোন হোটেল সর্ব্বজনবিদিত। এই সকল হোটেলের যথাযথ বর্ণনাদ্বারা বীভৎস রসের অবতারণা করা সুরুচি সঙ্গত নহে, তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এখানে মূর্ত্তিমতী অপবিত্রতা পিশাচী প্রতিদিন কত যাত্রী অতিথিদিগকে

সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া থাকে! এবং হোটেলের অর্থগৃধ্নু পাণ্ডারাও প্রতিদিন সেই পিশাচীর পূজা করিয়া কত ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

খাদ্যের মধ্যে কয়েকটী জিনিষের নূতন আমদানি হইয়াছে। কোন কোন জিনিষ সমাজে চলিয়াছে, খাইলে আর কাহারো জাতি যায় না। কিন্তু কোন কোন দ্রব্য প্রকাশ্যভাবে খাওয়া হয় না, যাহার ইচ্ছা হয়, সে লুকাইয়া গোপনে খায়। অন্ধ সমাজ তাহা দেখিয়াও দেখে না। এইপ্রকার ব্যবহারে সমাজের ও ব্যক্তির দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে নৈতিক সাহসের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবিক যদি এইগুলি অহিতকর হয়, তবে নিতান্তই পরিত্যাজ্য, আর যদি স্বাস্থ্যকর, উপকারী হয়, তবে প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করিতে বাধা কি?

অল্প ভোজন ও অতি ভোজন উভয়ই বলহানিকারক, সুতরাং অধর্ম্ম। ধর্ম্মের অনুরোধে কেহ কেহ, কখন কখন, অনশনে উপবাসে শরীরকে ক্লেশ দিয়া দুর্ব্বলতাকে ডাকিয়া আনেন, কিন্তু ইহা যে অধর্ম্ম, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

> কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
> মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

অর্থাৎ ধর্ম্মবোধে যে সকল বিবেকহীন লোক বৃথা উপবাসাদিদ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে কৃশ সুতরাং অন্তরস্থ আত্মাকে ক্লেশ দিয়া অশাস্ত্র-বিহিত তপশ্চরণাদি করে; তাহাদিগের সঙ্কল্প আসুরিক বলিয়া জানিবে। পর্ব্বে পর্ব্বে, সময়ে সময়ে, লঘুভোজন বা উপবাস স্বাস্থ্যের পক্ষে উপ-কারী, কিন্তু বৃথা উপবাসে শরীরের দুর্ব্বলতা ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে তাহা নিশ্চয়ই অধর্ম্ম।

আবার, আহারের নিমন্ত্রণ হইলেই লোকে অসময়ে গুরুভোজন করিয়া থাকে। অনিয়মই বাঙালীর নিয়ম। নিমন্ত্রণ ব্যাপারেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। অসময়ে ভোজন, অপরিমাণ ভোজন, নিমন্ত্রণ হইলেই একথা বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ এই সুযোগে উদরটাকে দ্বিগুণ ত্রিগুণ বোঝাই করিয়া লয়! কেহবা ভরা পেটে গণ্ডায় গণ্ডায় রসগোল্লা গলাধঃকরণ করিয়া কত বাহাবা পায়! ঐ যে কথায় বলে, "খাইলে দামোদর, না খাইলে শ্রীধর।" ইহাদেরও সেই দশা। ইহারা নিজ বাড়ীতে শ্রীধর, উদরের থ'লেটাকে খুব ক'সে বেঁধে রাখেন, আর নিমন্ত্রণের বাড়ীতে দামোদর, কোমরের বাঁধ ও উদরের থ'লের বাঁধ খুলে দিয়ে বসেন। বৃকোদর বৃকের উদর পাইয়াছিলেন বলিয়াই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন নাই, এই কথাটা ভোজনসর্ব্বস্ব পেটুকদলের মনে জাগে কিনা জানি না। ভোজন বলের জন্য, শরীর-রক্ষার জন্য। জীবনের জন্যই ভোজন, ভোজনের জন্য জীবন নহে, এই মোটা কথাটাতেই কেমন ভুল!

আজকাল প্রায় সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যই দুর্লভ, দুর্মূল্য ও কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতেও আমাদের মনে হাহুতাশের ভাব নাই, একেবারে নির্ব্বিকার। ইহা কি জড়ত্বের লক্ষণ নহে? খাঁটি জিনিষ আজকাল দুষ্প্রাপ্য, ইহার অর্থ এই যে, খাঁটি মানুষও দুষ্প্রাপ্য। বিক্রেতাগণ কৃত্রিম-জিনিষ বিক্রী করে, ক্রেতাগণ অম্লানবদনে তাহা গ্রহণ করিয়া মৌন অনুমোদন বা সম্মতি প্রদান করিয়া কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছেন, সত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাতে নৈতিক-বায়ু দূষিত, জাতীয়-চরিত্র সত্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। একত্র অবস্থানহেতু কৃত্রিম পোষ্য-পুত্রের প্রতি কৃত্রিম-পিতার একটা কৃত্রিম-স্নেহ জন্মে, এবং পুত্র জন্মিল না বলিয়া তাহার আর মনে দুঃখ থাকে না। সেইরূপ নিত্যব্যব-

হারে কৃত্রিম-জিনিষের উপর লোকের একটা কৃত্রিম-ভালবাসা আসে, এবং আসল জিনিষের অভাববোধ ক্রমে চলিয়া যায়। এই প্রকারে পণ্য-দ্রব্যে ও লোক-চিত্তে কৃত্রিমতা প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। কৃত্রিম-জিনিষের কাটতি বিলক্ষণ, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, এই প্রকার ক্রেতা কি বিক্রেতা কেহই খাঁটি মানুষ নহে। ক্রেতা যদি খাঁটি মানুষ হইবেন, তবে তিনি কেন কৃত্রিম-জিনিষ গ্রহণ করিবেন? সত্যের প্রতি যাঁহার অনুরাগ আছে, তিনি কি কখনও সত্যের অপলাপ সহ্য করিতে পারেন? বিক্রেতাও ছল ও মিথ্যা ব্যবহারদ্বারা দুপয়সা বেশ অর্জ্জন করিতেছে। এই প্রকারে কৃত্রিমতা সমাজে সজোরে চলিতেছে। খাঁটি জিনিষ তালাস করিতে গেলেই সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রতিদিন এইরূপ দৃষ্টান্ত বালক-দিগের নয়নগোচর হয়। সন্দেহ, অসত্য ও কৃত্রিমতাতে তাহারাও অভ্যস্ত হইতে থাকে। ইহাতে জাতীয় চরিত্র বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। খাদ্যাদি-দ্রব্যে কৃত্রিমতা ও কদর্য্যতার জন্য কেবল বিক্রেতা নহে, ক্রেতাও দায়ী। ক্রেতা যদি কৃত্রিম অনুপাদেয় দ্রব্য ক্রয় না করেন, তবে বিক্রেতার নিকট ঐ প্রকার জিনিষ পাওয়া যাইবে না।

জলমিশ্র দুগ্ধ যদি কেহই খরিদ না করে, তবে কোন্ দুগ্ধবিক্রয়ী দুধে জল দিতে সাহস করিবে? ব্যবসায়ীরা হিসাবী লোক, তাহারা কিছুতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে ইচ্ছুক নহে। চর্ব্বিমিশ্রিত কদর্য্য ঘি, সাত দিনের বাসি মিঠাই, পাঁচ দিনের পচা মাছের গ্রাহক যদি না জোটে, তবে কি বাজারে, দোকানে ঐরূপ জিনিষ বিক্রয়ার্থ উপনীত হইবে? আমরা যাহা চাই, যেরূপ দ্রব্যে আমাদের রুচি, দোকানদারেরা আমাদের জন্য তাহাই উপস্থিত করে। আমরা সকলেই যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কৃত্রিম কদর্য্য জিনিষ ব্যবহার না করি, কৃত্রিমতা কয়দিন থাকিতে পারে? কোন সভ্য-দেশে ভোজ্যদ্রব্যে এইরূপ কৃত্রিমতা ও কদর্য্যতা আছে কি না জানি না।

জাতির খাতিরেও শুদ্ধাচারী হিন্দুদের জলমিশ্র দুগ্ধাদি পান অবৈধ। নীচ অস্পৃশ্য জাতির স্পৃষ্ট জল পান করিলে উচ্চবর্ণ হিন্দুর জাতি যায়। নীচজাতি দুধে জল মিশাইয়া বিক্রী করে, ব্রাহ্মণাদি জাতি অবলীলাক্রমে তাহা পানকরিয়া জাতি বজায় রাখে, অর্থাৎ কেবল-জল জাতি নাশের হেতু, মিশ্রিত জল জাতি রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। খাদ্যদ্রব্যে এই কৃত্রিমতা কদর্য্যতার প্রতিবিধান করে কে? ধর্ম্মের শাসন শিথিল। সমাজের শাসন নাই। শাস্ত্রের শাসন আছে, মানিয়া চলি না। মেধ্য, মিত, নিয়মিত পান-ভোজন স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে বঙ্গবাসী আর কতকাল উদাসীন থাকিবে?

দেহ ও মনশুদ্ধি।

বাসভবন, আসন-বসন, এই সব যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক, সেইরূপ দেহকেও পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিলাসিতার সংশ্রব রাখা চাই না। দন্ত, কেশ, নখ, চর্ম্ম প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিতে হইবে, কিন্তু অনাবশ্যকরূপে নানা প্রকারের সৌখিন দ্রব্যে আসক্তি, যুবকদিগের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর। ইহাতে যে কেবল অর্থের অপব্যবহার হয় এমন নহে, মনটাও তরল, চঞ্চল ও লঘু হইতে থাকে। বিদ্যার্থীর পক্ষে বিলাসিতা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, নচেৎ জ্ঞানার্জ্জনে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

দেহের ন্যায় মনটাকেও নির্ম্মল, পবিত্র রাখিতে হইবে। মনকে বিশুদ্ধ রাখার অর্থ এই যে, ইহাকে কামক্রোধাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। কামক্রোধ অন্তরে মল জন্মায়। কাম, মনের চাঞ্চল্য ও কুৎসিত ভাব আনয়ন করে। কোপনস্বভাব ব্যক্তির মনে, সুতরাং

দেহে, স্বাচ্ছন্দ্য থাকিতে পারে না। ক্রোধের উষ্মা, দেহ, মন ও মস্তিষ্ককে উষ্ণ করিয়া রাখে। সুনিদ্রার ন্যায় চিত্তের প্রফুল্লতা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু কাম-ক্রোধ এই দুইটীকেই হরণ করে।

(৫)

ইন্দ্রিয়ের অসংযম।

ইন্দ্রিয় সংযত না হইলে কেবলই বিপদ্। যথেচ্ছ ব্যবহারে ইন্দ্রিয় ক্রমশঃ নিস্তেজ, শক্তিহীন, সঙ্গে সঙ্গে দেহও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলতা রোগের সহায়, রোগ দুর্ব্বলতার সহায়। দুর্ব্বলহৃদয় কামক্রোধাদির প্রিয়নিকেতন, বীরহৃদয়ে উহারা বড় একটা স্থান পায় না। কাম নিজে দুর্ব্বল হইলেও দুর্ব্বলচিত্তে অত্যন্ত বল প্রকাশ করে। অতএব কামরিপুকে বশীভূত করা সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। এই জন্যই পুরাকালে আর্য্যসমাজে ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য-পালন একান্ত আবশ্যকীয়। এই হিতকর প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলে ছাত্রদের সুতরাং দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। ব্রহ্মচর্য্য শব্দের সঙ্কীর্ণ অর্থ "অবিবাহিতাবস্থা" (celibacy) পরিত্যাগ করিয়া সাধারণতঃ "ইন্দ্রিয়-সংযম"ই প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। অসংযত বল-বান্ অশ্ব যেমন আরোহীকে বিপথে লইয়া যায়, যৌবনকালে প্রবল ইন্দ্রিয়সকল সেইরূপ তরলমতি যুবকদিগকে কুপথে চালাইতে প্রয়াস পায়। সুতরাং সংযম শিক্ষা আবশ্যক। কিন্তু ইহা ত সহজ কথা নয়। চক্ষু, কর্ণ, রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনিতে হইবে, কাম-ক্রোধাদি রিপুগুলিকে দমন করিতে হইবে, এইরূপ মৌখিক উপদেশ দিলেই কোন কাজ হইবে না, *ইন্দ্রিয়সংযম হইবে না। বাল্যকাল

হইতে সংযমী চরিত্রবান্ শিক্ষকের দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমাগত শিক্ষা ও শাসনের অধীন থাকিয়া সংযম অভ্যাস করা আবশ্যক। নিয়মিতরূপে অন্তর্দেহের ড্রিল হওয়া দরকার।

স্বভাবতঃ কুদৃশ্য দেখিতে অবশীয়ুবগণের নয়ন ধাবিত, কুসঙ্গীত শ্রবণে কর্ণ আকুলিত, কুকথা বলিতে রসনা লালায়িত। আদিরসাশ্রিত কুৎসিত সঙ্গীত ও কুৎসিত নাট্যাভিনয়ের পরিবর্ত্তে, প্রায়শঃ মধুর ধর্ম্মসঙ্গীত শ্রবণ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, সে সকলের মনোহর চিত্র ও মহাত্মাদিগের মধুর-পুণ্য আলেখ্য, দর্শন করিলে, তাহাদের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত এবং চিত্ত প্রফুল্ল-পবিত্র হইতে পারে।

ছাত্রদিগের মধ্যে বহ্বালাপপ্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী। ইহাতে চিত্তকে লঘু করে। আর, বহুভাষী জনে প্রায় সত্যকথা কয় না। সত্যে অনুরাগ থাকিলেও বহুভাষী ব্যক্তি সত্যকথা প্রায়ই বলিতে পারে না; কারণ, সত্যকথা যে অল্পেই ফুরাইয়া যায়। বাক্‌সংযম চরিত্রগঠনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী; ইহাতে মনের বল বৃদ্ধি হয়। আমরা বাক্‌সিদ্ধ পুরুষের কথা শুনিয়াছি। বাস্তবিক বাক্‌সিদ্ধি ও সত্যভাষণ বাক্‌সংযমেরই পরিণতি। অসৎপ্রবৃত্তির দমন ও সৎপ্রবৃত্তির স্ফুরণ সংযমের ফল। ইহাতে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি সঞ্চিত হয়। বলসঞ্চয় অর্থাৎ দেহ, মন ও চরিত্রের বল বৃদ্ধি করাই সংযমের উদ্দেশ্য। বলের জন্যই বাক্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড এই ত্রিদণ্ডের ব্যবস্থা প্রাচীন যুগে ছাত্রসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সকল ছাত্রেরই এ কথা জানিয়া রাখা উচিত যে, "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ"। বীর্য্যপাতনে মরণ, বীর্য্যধারণে জীবন। অবৈধ কুৎসিত উপায়ে, তরুণবয়সে যদি বীর্য্যপাত করা হয়, তবে তাহাতে বিনিপাত অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির হাতে পাপীর অব্যাহতি নাই। পাপীকে সারাজীবন শোচনীয় পরিণামফল ভুগিতে হইবে।

আর্য্য ঋষিগণ অব্যর্থবীর্য্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বংশধর আমরা এখন নিতান্ত লঘুবীর্য্য হইয়া পশ্বাদিরও অধম হইয়াছি। সংযমের অভাব, দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার বিশিষ্টকারণ।

দৈহিক দুর্ব্বলতার যে সকল মূল কারণ সমাজে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাহা উন্মূলিত করিয়া, বলশালী হইবার জন্য সার্ব্বজনীন চেষ্টায়, ভগবান্ কার্ত্তিকের সুতরাং নারায়ণের প্রসাদ লাভ হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"সেনানীনামহং স্কন্দঃ"। সেনাপতিদিগের মধ্যে আমি স্কন্দ অর্থাৎ কার্ত্তিক। দৈহিকবলের অভাবে কোন প্রকার উন্নতিই সুলভ নহে। যদি আমরা কোন প্রকারের উন্নতি কামনা করি, যদি সমাজের মঙ্গল ইচ্ছা করি, তবে আপামর সর্ব্বসাধারণের শারীরিক উন্নতিবিধান সর্ব্বাগ্রে একান্ত আবশ্যক। শারীরিক দুর্ব্বলতা সকল প্রকার দুর্ব্বলতার মূল কারণ। শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ থাকিলে মনটাও সুস্থ-সবল, প্রফুল্ল-সবল হইতে পারে। দুর্ব্বলদেহে মনটাও প্রায়শঃ দুর্ব্বল। জলের ন্যায় দুর্ব্বল মনের গতি নিম্ন দিকে। এই গতিটাকে ফিরাইতে হইলে দেহের বল বৃদ্ধি আবশ্যক। হে মন! তুমি কুমার কার্ত্তিকেয়ের চরণে শরণ লও। প্রার্থনা কর, দেব! আমি অতি ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, চপল। আমায় স্থৈর্য্য ও ঔদার্য্য প্রদান কর, দেহ-বলে পুষ্ট তুষ্ট কর।

বল,—

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা॥"

সেই দেবীকে বার বার সহস্রবার নমস্কার করি, যে দেবী সকল জীবে শক্তিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

লক্ষ্মীদেবী।

ধন-বল।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি।
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ॥"

লক্ষ্মী ধনের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা কর, ধনাগম হইবে, এরূপ উপদেশের পাত্র কোথায়? সকলেই ত অর্থ-চিন্তায় ব্যাকুল, সকলেই ত টাকা টাকা করিয়া সারাদিন ছুটাছুটী করিতেছে। যে জ্ঞান চায় না, ধর্ম্ম চায় না, সেও ধন চায়; যে মান-সম্ভ্রম চায় না, সেও ধন চায়। ছোট বড়, যুবা বৃদ্ধ, জ্ঞানী মূর্খ সকলেই ধন চায়। সকল দেশে সকল লোকই ধনার্থী।

ধনের আদর পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, সভ্যতার উন্নতিতে, ধনের অভাববোধ ও প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বাপেক্ষা শত-গুণে বাড়িয়াছে। "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।" অর্থকে সর্ব্বদা অনর্থ বলিয়া ভাবিবে, অর্থেঃ সত্যসত্যই সুখের লেশমাত্র নাই। জ্ঞানবাদী সন্ন্যাসীর এই উপদেশ এখন কোন্

সংসারী মানিতে পারে? মানিলে সংসার চলে কৈ? অর্থ চাই, বিত্ত-বিভব চাই। পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সমাজের শ্রীবৃদ্ধি, এমন কি, অস্তিত্বও বহুল পরিমাণে অর্থের উপর নির্ভর করে। ধনে ব্যক্তির ততোধিক সমাজের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞানের ন্যায় ধন একটী শক্তি। দরিদ্র ব্যক্তি ও দরিদ্রসমাজ জীবন্মৃত। দরিদ্রতা বল ও গুণ হরণ করে। "দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।" একমাত্র দারিদ্র্যদোষই সমস্ত গুণরাশিকে বিনষ্ট করে। এ কথা সত্য। দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর নিকট হেয়, দরিদ্র সমাজ ধনগর্ব্বিত সমাজের নিকট উপহাসাস্পদ।

গৃহী মাত্রেরই ধনের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু ধনাগমের পথ অনেকে পায় না। বাণিজ্য ও কৃষি ধনাগমের প্রকৃষ্ট ও প্রশস্ত পথ, একথা প্রাচীনকালের লোকেরাও বিলক্ষণ জানিতেন। কেবল যে জানিতেন তা নয়, তাঁহারা বাণিজ্যকার্য্যে বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন। এক সময়ে তাম্রলিপ্ত (তম্‌লুক) বাণিজ্যের প্রধান বন্দর ছিল। বাঙালী-হিন্দুনাবিক-পরিচালিত বাঙালীর তাৎকালিক অর্ণবযানসমূহ বাণিজ্যার্থে সগর্ব্বে সমুদ্রবক্ষে বিচরণকরতঃ, দূরবিদেশ হইতে ধনরত্ন আহরণ করিয়া স্বদেশকে ধনশালী করিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ইয়োরোপীয় সভ্যজাতিসমূহ আমাদের প্রায় সকল বিষয়েই পথপ্রদর্শক। ইহারা বাণিজ্যের প্রভাবে নিজ নিজ দেশে জগৎ শেঠের ন্যায় ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, ইহা জানিয়াও, এবং অবাধ-বাণিজ্যপ্রথা বর্ত্তমান থাকাতেও, বাণিজ্যবিষয়ে পাশ্চাত্য সভ্যজাতির অনুসরণ করিতে আমাদের সাহস হয় না। আমরা অর্থাগমের সর্ব্ব নিকৃষ্ট দুইটী উপায়—চাকরি ও ভিক্ষা—বাছিয়া লইয়াছি। অলস শান্তিপ্রিয়তাই ইহার অন্যতম কারণ। মাসান্তে বিনা ঝঞ্ঝাটে বেতনের নির্দ্দিষ্ট টাকা কয়টী পাওয়া যায়, কেমন সহজ পন্থা!

বাঙালী চাকরি করে, কিন্তু অভাব ঘোচে না। বৎসর বৎসর কত যুবক চাকরির জন্য প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু সকলকে চাকরি দিবে কে? কাজেই অর্থার্জ্জনের উপায়ান্তর খুঁজিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহার চেষ্টা কয় জনে করে? কাজেই দুঃখ দারিদ্র্যও দূর হয় না! আবার "ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ", ইহা জানিয়াও ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষাবৃত্তিকে একেবারে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। পুরোহিতবর্গ, তান্ত্রিক মন্ত্রদাতা গুরুকুল, এবং কুলীন ব্রাহ্মণদলের মধ্যে কেহ কেহ প্রধানতঃ ভিক্ষা ও পরপিণ্ডোপজীবী। অপর সাধারণ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও যাহারা অন্য উপায়ে অর্থার্জ্জনে অসমর্থ, তাহারাও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। পরের দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষা করিতে ইহারা লজ্জা বা অপমান বোধ করে না, বরং ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া সমাজের নিকট অর্থ দাবী করিতে ইহাদের ধর্ম্মসঙ্গত ন্যায্য অধিকার আছে বলিয়া মনে করে। মনে করে না যে, ইহাদিগকে লোকে তৃণ হইতেও হেয়, তূলা হইতেও লঘু মনে করে। নমস্য বিদ্বান্ গুরু পুরোহিতদিগকে বাদ দিলেও প্রায়-নিরক্ষর পুরোহিতঠাকুর ও গুরুঠাকুরের সংখ্যা বড় কম হইবে না।

পূর্ব্বে একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, "না লেখে না পড়ে দারগ্-গিরি ক'রে খাবে।" এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন নিরেট মূর্খও অনায়াসে পুলিসের দারোগা হইতে পারিত, জীবিকা অর্জ্জনের একটা প্রশস্ত পথ পাইত। সেইরূপ নিরক্ষর হইয়াও ব্রাহ্মণ, পুরোহিতগিরি করিয়া জীবনরক্ষার একটা উপায় করিয়া লয়। সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষার ঝুলি ত আছেই। গুরুকুলেরও প্রায় সেই দশা। লেখা পড়া না শিখি লেও কানে ফুঁ দেওয়ার গুপ্তমন্ত্রটী মুখস্থ করিয়া রাখিলেই সকল বিপদ কাটিয়া গেল! তখন শিষ্যের বাড়ী যাইয়া বার্ষিকের টাকা আদায়

করিতে আর কোন অসুবিধা হয় না। পুরোহিত, যজমানবাড়ী যাইয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা দিয়া থাকেন; গুরু, লক্ষ্মী সরস্বতীর পূজা করিতে শিষ্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন; নিজেরা কিন্তু কোন দেবীরই উপাসনা করেন না, না লক্ষ্মীর না সরস্বতীর।

কৌলিন্য প্রথার তীক্ষ্ণ বিষদন্ত ভাঙিয়া গিয়াছে। এখন পূর্ব্বের ন্যায় কেহ আর একশত বিবাহ করিয়া, অতিথির বেশে সাড়ে তিন দিন প্রতি শ্বশুর বাড়ী থাকিয়া, সংবৎসরটা কাটাইয়া দেন না, তা হ'লেও কৌলিন্যের জের আছে, কতকাল যে থাকিবে, কে বলিতে পারে? ঈদৃশ অলস ভিক্ষাজীবীগণ নিজ পরিবারে দৈন্য-দুর্গতির একশেষ জন্মাইয়া দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। ভিক্ষায় যে কেবল "নৈব চ নৈব চ", তাহা নহে, চাকরির ন্যায় ইহাও মনস্বীর মনস্বিতা হরণ করে, মানীর মান লাঘব করে, পুরুষের পুরুষত্ব বিনষ্ট করে। যে দুইটী বৃত্তি এতাদৃশ দোষসম্পন্ন, তাহাই আমাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। যে সমাজ ভিক্ষুকের দল সৃষ্টি ও পোষণ করে, সেই সমাজের সকল শ্রেণীর লোকই প্রয়োজনবোধে ভিক্ষাপাত্র হাতে লইতে লজ্জা বোধ করে না। ভিক্ষাবৃত্তি যে নিতান্ত ঘৃণ্য, জঘন্য, সে জ্ঞানটা পর্য্যন্ত সে সমাজের থাকে না।

কোন একটী উৎকৃষ্ট প্রথা মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিলে, এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, কালক্রমে মানুষের দোষে তাহাতে কালিমা স্পর্শ করিয়া থাকে; এমন কি, কোন কোন স্থলে তাহা বিপরীত ফল প্রসব করে। একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা বহুকাল হইতে ভারতে প্রবর্ত্তিত। যুক্ত পরিবারে সুখ শান্তি ও উন্নতি লাভের এবং প্রেমবিকাশের বিশেষ সুবিধা আছে। বহুগুণযুক্ত হইলেও এই প্রথা বর্ত্তমানে অনেকস্থলে পারিবারিক দারিদ্র্য ও অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এক ভাই প্রবাসে থাকিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অতি কষ্টে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, অপর চারি ভাই বাড়ী বসিয়া স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া ভ্রাতার উপার্জ্জিত অর্থে উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকেন; আর ঘুমাইয়া, তাস পাশা খেলিয়া, ও অবসরকালে ঝগড়া কলহ করিয়া, কত অশান্তির সৃষ্টি করেন। উপার্জ্জনকারী প্রীতিপরায়ণ ভ্রাতাকে ও তৎপুত্রদিগকে দারিদ্র্যের মধ্যেই থাকিতে হয়। কিন্তু পরিবারের সকল পুরুষই যদি নিজ নিজ শক্তি অনুসারে অর্থ উপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন, তবে এরূপ দুর্দ্দশা হয় না। বঙ্গের একান্নভুক্ত পরিবারে ভ্রাতৃভাগ্যো-পজীবী ভ্রাতার অভাব নাই। ইহাতে যে দুঃখ-দারিদ্র্য ও অনৈক্য বৃদ্ধি পায়, ভুক্তভোগী হইয়াও অলস স্বার্থপর ভ্রাতা তাহা বোঝে না। কেহ কেহ হয়ত, "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী" এই মতের পোষকতা করিয়া নিরীহ অবলা জাতি, গৃহবিচ্ছেদের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু স্ত্রীবুদ্ধি এরূপ হইল কেন? পুরুষেরাই বা স্ত্রীবুদ্ধি লয় কেন? ইহার জন্য দায়ী কে? যেখানে অজ্ঞান অন্ধকার, সেখানেই স্বার্থান্ধতা। স্ত্রীজাতিকে অন্ধকারে রাখিলে এরূপ অবস্থা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আয়ের দ্বার যদি এক, ব্যয়ের দ্বার একশত। অর্থ একদিক দিয়া আসে, কিন্তু শতভাবে শতদিক দিয়া বাহির হইয়া যায়। আয়ের অনু-পাত অতিক্রম করিয়া ব্যয়বৃদ্ধি হইলেই দারিদ্র্য আসিবে। চাকরিগত-প্রাণ বাঙালী-ভদ্রসন্তানের মধ্যে কেহ কেহ ঋণজালে জড়িত, কাহারো বা আয়-ব্যয় সমান। সঞ্চয় করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে। খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সামান্য চাকরীর আয়ে আর আবশ্যকীয় ব্যয় সংকুলন হইতে পারে না। তাহাতে আবার অনেক কৃত্রিম কল্পিত অভাব আসিয়া ব্যয়ের মাত্রা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ করিয়া তুলিয়াছে। অভাবে কত লোকের স্বভাব নষ্ট

৮

হইয়া যাইতেছে। আমাদের অভাব দিন দিন বাড়িতেছে, অভাবের অভাব নাই, কিন্তু অভাবমোচনের সমবেত সবল চেষ্টার একান্ত অভাব। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনন্দিন অভাবের তাড়নায় ব্যথিত-অন্ধ আমরা, বড় বড় অভাবগুলি একেবারেই দেখিতে পাই না।

বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। নদীমেখলা বঙ্গভূমি, স্বভাবতঃই উর্ব্বরা, শস্যশ্যামলা। ইহা প্রকৃতি দেবীর স্নিগ্ধ-কোমল-হস্ত-নির্ম্মিত, ফলশস্য-শোভিত ভারত-উদ্যান। এখানে স্বল্পায়াসে যেরূপ প্রচুর শস্য জন্মে, অন্যত্র বহু পরিশ্রমেও তাহা দুর্লভ। তথাপি কত কৃষক অন্নাভাবে কত কষ্ট পাইতেছে। বঙ্গের ক্ষেত্র সকল, বঙ্গের অধিবাসীদিগকে জীবনধারণার্থ পর্য্যাপ্ত শস্য প্রদান করিতে পারে; তথাপি অন্নকষ্ট কেন? কৃষকের দোষে এ অবস্থা না হইলেও, কৃষির অনুন্নতি ইহার কারণ না হইলেও, কৃষির উন্নতিবিধানে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক, একথা কে অস্বীকার করিবে? কৃষিজাত শস্যই মানবের জীবন; সেই শস্যের উৎপাদনে নিরক্ষর কৃষক নিযুক্ত। ভদ্র শিক্ষিতগণ কৃষককুলের শ্রমজাত ফলভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত। ফলতঃ কৃষিকার্য্যে শিক্ষিতদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে প্রচুর সুফল ফলিতে পারে।

বাণিজ্যের মূলে কৃষি ও শিল্প। পূর্ব্বে ঢাকাই মস্‌লীন প্রভৃতি শিল্প-জাত দ্রব্য সুদূরদেশে প্রেরিত হইত, দেশে ধনাগম হইত। এখন সেই সব শিল্প লুপ্তপ্রায়। এখন বঙ্গদেশে এমন শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হয় না, যাহা বিদেশে বিক্রীত হইবার উপযুক্ত। কৃষিদ্রব্যই এখন বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। মাড়ওয়ারী ও পারসীজাতি বাণিজ্যপ্রিয়, তাহারা বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে কারবার খুলিয়া বহু অর্থ অর্জ্জন করিতেছে। বাঙালীও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বাণিজ্যে লিপ্ত শিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা অতি

অল্প। নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই সামান্য দোকান খুলিয়া সামান্য ভাবে কারবার চালাইয়া থাকে। ইহারা ক্ষুদ্র দোকানদার মধ্যে গণ্য। বাঙালী লেখাপড়া শিখিয়া অনিশ্চিত অর্থের আশায় বসিয়া থাকিতে পারে না। চাকরির সুনিশ্চিত অল্পায়াস-লব্ধ, অল্প অর্থই তাহার নিকট শ্রেয়ঃ। কারবারের ফল অধ্রুব, লাভক্ষতি উভয়ই হইতে পারে; লোক-সান হইলে ত একেবারে সর্ব্বনাশ! লাভ হইলেও কতকাল পরে হইবে, বর্ত্তমানে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় কি? বাঙালী, ভাবী উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া বর্ত্তমানের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। গোষ্পদ-তুল্য বর্ত্তমান সুবিধা-টুকুই ভালবাসে।

প্রাচীনকালে সংসার-বিরাগী নিঃস্বার্থ লোকহিতাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ ভারতসমাজের কর্ণধার ছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় প্রাচীন হিন্দুজাতি বর্ত্তমান অপরাপর জাতির ন্যায় ইহকালসর্ব্বস্ব ছিলেন না। সুতরাং অর্থের প্রতি আর্য্যগণের একান্ত অনুরাগ ছিল না। বর্ত্তমান বাঙালী হিন্দুও উত্তরাধিকারীসূত্রে ইহার অধিকারী নয়, একথা বলা যায় না। হিন্দুর এই জাতীয় স্বভাব এখনও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। অর্থবৃদ্ধি বিষয়ে নিশ্চেষ্টতার ইহাও একটী কারণ। সংসাহস ও অধ্যবসায়ের কার্য্যে বাঙালী স্বভাবতঃ পরাঙ্মুখ। এই জন্যই নানা দেশে যাইয়া বাণিজ্যবিস্তারের ইচ্ছা ও চেষ্টা তাহার পক্ষে বলবতী হয় না।

বাণিজ্য ব্যবসাতে শিক্ষার যথেষ্ট অভাব ও অনভিজ্ঞতা আছে বলিয়া এই বিষয়ে অনেকেই নিরুদ্যম। হাতে কলমে উপযুক্ত শিক্ষা না পাইয়া কারবার আরম্ভ করিলে অকৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। অতএব এ বিষয়ে যাহাতে লোকে সহজে শিক্ষা পাইতে পারে, দেশমধ্যে তাহার সুবন্দোবস্ত থাকা অত্যাবশ্যক। মূলধনের অভাব বা অল্পতাবশতঃ অনেক

উৎসাহী যুবক কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ হইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া থাকেন। "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ।" দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়েই লয় পায়। এই জন্যই যৌথ কারবার প্রশস্ত। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ, তজ্জন্য অনৈক্য এবং অসততা যৌথ কারবারের মূলে কুঠারাঘাত করে। আবার জনসাধারণ ইহার প্রতি আস্থাবান্ না হইলে এ বিষয়ে উন্নতি অসম্ভব।

লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া আমরা অপবাদ দিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক লক্ষ্মী যে আমাদের দোষেই চঞ্চলা। ধন ও ঐশ্বর্য্যলাভ হইলেই চিত্ত চঞ্চল হইয়া ওঠে। চিত্তে বিকার জন্মে। ধনের অসদ্ব্যবহার হইতেই পাপ প্রবেশ করে, কাজেই লক্ষ্মীর আসন সেখানে অচল থাকিতে পারে না। লক্ষ্মী পাপীর নহে, পুণ্যাত্মার। তাই অতি সাবধানে লক্ষ্মীর সেবা করিতে হয়, নচেৎ দেবী কুপিতা হইয়া অচিরে তিরোধান করেন।

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।"

অর্থ অনর্থ এই কথা নিরর্থক নহে। অর্থে বাস্তবিকই অনর্থ ঘটায়, যদি অর্থবানের আত্মসংযম না থাকে। কত ধনী যুবক বিলাসিতা ও পাপে ডুবিয়া আত্মনাশ ও সর্ব্বনাশ করিয়াছে, করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। উর্দ্দূতে একটী কথা আছে, "বহুৎ সি চিজে জাহির মে খুব্ মালুম হোতা হ্যায়, লেকেন হাসিল উনকা থোড়া হ্যায়"। এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা বাহিরে দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু কাজে কিছুই নয়। যথা মাকালফল। বিলাসিতা অনেক যুবাকে মাকালফল করিয়া তোলে। অর্থ চরিত্রস্খলন করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট রাখে। অর্থের সদ্ভাব ও অভাব উভয়েই লোককে পাপের পথে লইয়া যাইতে পারে। অতএব এই উভয় অবস্থাতেই বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক।

লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। পেঁচার উপর ভর করিয়া লক্ষ্মী চলিতে থাকেন। যাহাদের স্কন্ধে লক্ষ্মীপেঁচা ভর করে, তাহারা পেচক-স্বভাব। পেচক দিবাভীত, নিরানন্দ, কাকাদির ভয়ে দিনে দেয়ালের ফাটালে, আঁধারে লুকাইয়া থাকে। কৃপণ ধনী দীন দুঃখীর ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া স্বীয় জীর্ণভবনে এক কোণে অবস্থান করে। পেচক নিশাচর, রাত্রিতে আহার-অন্বেষণ করে। কৃপণ চোরের ভয়ে রাত্রি জাগিয়া থাকে, এবং মনে মনে সিন্ধুকস্থ অর্থের চিন্তা ও ভোগ করে। পেঁচা একক, অন্য পক্ষীর সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই। কৃপণ সমাজের কোন শুভকার্য্যে যোগদান করে না; সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন, একাকী। কৃপণ বাস্তবিকই সর্ব্বতোভাবে পেচকের প্রকৃতি পাইয়া থাকে, সুতরাং কৃপাপাত্র। সে বোঝে না যে, ধনের অধিকার তাহার নাই। সে কেবল অবৈতনিক প্রহরী। বাস্তবিক কৃপণের ধন নিজের ভোগেও আসে না, দেবভোগেও লাগে না।

কৃপণ কৃপার পাত্র হইলেও তাহার নিকট আমরা সুন্দর একটী উপদেশ পাই। অর্থই কৃপণের পরমার্থ, উপাস্য দেবতা। পৃথিবীর সকল বস্তু অপেক্ষা অর্থ তাহার প্রিয়; যশঃ মান, এমন কি, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। অর্থের জন্য সে সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। কৃপণ আমাদিগকে একনিষ্ঠা শিক্ষা দিয়া থাকে।

ধনী হইলেও ধনবৃদ্ধির চেষ্টা কর্ত্তব্য। যাহারা পৈতৃক ধনে ধনবান্, প্রভুত পৈতৃক ধনের অধিকারী, তাহাদেরও নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অর্থার্জ্জনে অভিনিবিষ্ট হওয়া উচিত। বঙ্গের বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের ভূসম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ বিপরীত পথে চলিয়া নির্ধনতার পথে অগ্রসর হইতেছেন। তাহাদের আয় বাড়ে না, কিন্তু ব্যয় কেবলই বাড়িতে থাকে। সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া উত্তরোত্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে।

পূর্ব্ববঙ্গের জমিদারবর্গের প্রায়ই এই অবস্থা। মনে করা যাউক, জমিদারের পাঁচ পুত্র। কালে সম্পত্তি পাঁচ ভাগ হইল। সেই পাঁচ পুত্রের প্রত্যেকেরই যেন পাঁচ পুত্র জন্মিল। সুতরাং মূল সম্পত্তি পঁচিশ ভাগে বিভক্ত হইল, কিন্তু ব্যয় পূর্ব্ববৎ রহিল। আয়ের কোন নূতন পথ করা হয় নাই, একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকারে অনেক ধনী পরিবার নিঃস্ব হইয়া যায়। "ঝিনুক মেপে খেলেও রাজার গোলা ফুরায়।" আয় না হইয়া কেবল ব্যয় হইতে থাকিলে বিপুল অর্থরাশিও কালে নিঃশেষিত হয়।

ন্যায় পূর্ব্বক স্বোপার্জ্জিত অর্থের প্রতি একটা মমতা জন্মে, সাধারণতঃ পরার্জ্জিত অর্থের প্রতি সেরূপ হয় না। এই মমতাই অনেক সময় অসৎ অনাবশ্যক ব্যয়ে বাধা দেয়, এবং অর্থের সদ্ব্যয়ে বিমল আনন্দ জন্মে। অনায়াস-লব্ধ বস্তু মূল্যবান্ হইলেও সম্যক্ আদর পায় না। আয়াসলব্ধ বস্তু স্বল্পমূল্য হইলেও সমধিক আদৃত হইয়া থাকে। পিতা, পিতামহ আপনার হইলেও আত্ম-তুলনায় পর। নিজের প্রতি, নিজস্বের প্রতি যেরূপ আকর্ষণ, পরস্বের প্রতি সেরূপ হয় না।

ধনের অর্জ্জনে কর্ম্মতৎপরতা, সততা ও অধ্যবসায়, সঞ্চয়ে মিতাচার, ব্যয়ে সদ্বিবেচনার প্রয়োজন। অর্জ্জন অপেক্ষা ব্যয় ও সঞ্চয় করা কঠিন কর্ম্ম। বহুআয়বান্ ব্যক্তিও যদি সঞ্চয় করিতে না পারেন, তবে তিনি দরিদ্র। নানা দিকে নানা অভাব। প্রকৃত অভাব মোচন করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে ধৈর্য্য ও হিসাবের দরকার। আবার কোন্ ব্যয় সঙ্গত, কোন্টা অসঙ্গত, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সুবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

"আয়ে দুঃখং"। বিনা দুঃখে, বিনা শ্রমে অর্থ-উপার্জ্জন হয় না। আবার, সঞ্চয় করাও অনেকের পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু একবার কিছু

টাকা হাতে করিতে পারিলেই সঞ্চয় করা শেষে আর তত কঠিন হয় না। এক টাকাও যদি সঞ্চয় করা যায়, সেই একটাকাই কালে একশত টাকা হইবে, সেই একটাকাই এক মোহর হইবে। বস্তুতঃ প্রথম সঞ্চিত মুদ্রা পরশমণিতুল্য। ভক্তিশাস্ত্রে ভবিষ্যতের ভাবনা ও সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ হইলেও বিষয়ীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। দুঃখের দিনে টাকার মতন বন্ধু আর কে হইবে? দুঃখের দিনে হাসিমুখে কে আর অত কাজ করিবে?

সঞ্চয়শীল হইতে হইবে, কিন্তু অতি সঞ্চয় কর্ত্তব্য নহে। ধনের প্রতি অতিমাত্র প্রীতি থাকা সঙ্গত নহে। ইহাতে লোক ব্যয়কুণ্ঠ হয়। কৃপণের "ব্যয়ে দুঃখম্"। ব্যয় করিতে হইলেই প্রাণে বড় লাগে। কিন্তু সৎ ও উচিত ব্যয়ে মুক্তহস্ত হইতে না পারিলে অর্জ্জনের কোন সার্থকতা থাকে না। অব্যয় অপেক্ষা সব্যয় হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অমিত ব্যয় আদরণীয় নহে। অনেক সময় মিতব্যয়ীকে কৃপণ আখ্যা দেওয়া হয়। এই দুর্ণাম পরিহার করিবার জন্য কেহ কেহ অমিতব্যয়ী হইয়া থাকেন এবং পরিণামে দুঃখ ভোগ করেন। ব্যয়ের মাত্রা অতিক্রম করিয়া "যত্র আয় তত্র ব্যয়" করিলে, অথবা আয়ের অধিক ব্যয়শীল হইলে, পরিণামে দুঃখভাগী হইতে হয়।

ধনের প্রথম প্রয়োজন,—আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি। দ্বিতীয় প্রয়োজন,—পররক্ষা ও পরোন্নতি। আমরা অর্থ উপার্জ্জন করিব নিজের অভাব দূর করিতে, অভাবের মধ্যে পড়িয়া থাকিবার জন্য নয়। অর্থ উপার্জ্জন করিব নিজের বলবৃদ্ধি করিতে, বলক্ষয় করিবার জন্য নয়। উপার্জ্জন করিব পরের দুঃখ দূর করিতে, পরকে দুঃখ দিবার জন্য নয়।

ভোগার্থীরা মনে করেন, ধনের প্রয়োজন ভোগ। কিন্তু লোকে একাকী অদ্বিতীয় থাকিয়া ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। ভোগের জন্য জন চাই। ধন থাকিলে কি হইবে? জন না থাকিলে কারে লইয়া

ভোগ? স্ত্রী পুত্রাদি কেহই নাই, এমন ধনীর কি সুখ? সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, এমন একজনও যার নাই, ধনরাশি তাহাকে কি সুখ দিতে পারে? কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহস্থ স্বোপার্জ্জিত অর্থে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার বর্গের অভাবমোচন ও ভরণপোষণ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। প্রত্যেক পরিজনের কল্যাণ বিধান, উন্নতি ও সুখ সাধন প্রভৃতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া উদারবুদ্ধি গৃহী কত সুখী হইয়া থাকেন। পরিজন লইয়াই ভোগ, পরিজনশূন্য হইয়া ভোগ হয় না।

যিনি যে সমাজের লোক, সেই সমাজ তাহার এক সুবৃহৎ পরিবার। সেই সমাজরূপ বিপুলপরিবারস্থ দুর্গত পরিজনবর্গের অভাব মোচন ও অর্থকষ্ট দূর করিবার প্রশংসনীয় চেষ্টায় ধনবানের ধনের সার্থকতা। এই বৃহৎপরিবারভুক্ত, ক্ষুধিত, নিরন্ন ব্যক্তির আশু ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে ও স্থায়ী মঙ্গল সাধনে ধনের সার্থকতা। অর্থের অভাবে কত লোক স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশ করিতে না পারিয়া সাগরগর্ভস্থ রত্নের ন্যায় আঁধারে ডুবিয়া যায়! দারিদ্র্যের প্রবলপীড়নে কত কর্ম্মঠ লোক উচ্চতর কর্ত্তব্যসাধন করিতে না পারিয়া কত মনঃকষ্টে জীবন কাটায়। কত মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়! এ অবস্থায় সমাজের বিশেষ ক্ষতি। সমাজের ক্ষতিতে ধনীরা সকলেই নিজের ক্ষতি বলিয়া মনে করিলে সমাজের দুঃখভার অনেক কমিতে পারে। একজন ধনী অপর দশজনকে ধনী হইবার সহায়তা করিলে নিশ্চয়ই তিনি সমাজের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন। বিদ্যার অপপ্রয়োগে যেমন নিজের ও পরের অকল্যাণ, সেইরূপ ধনের অপব্যবহারে উভয়েরই অমঙ্গল। অলস দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি যেমন সময়ের মূল্য বোঝে না, সেইরূপ অবিবেচক অপরিণামদর্শী-ব্যক্তিও অর্থের মূল্য না বুঝিয়া অপব্যয় করিয়া আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে আত্মহত্যা, আত্মোন্নতির পরিবর্ত্তে আত্মাবনতি করিয়া থাকে।

"ধনাৎ ধর্ম্মস্ততঃ সুখম্"। ধনে ধর্ম্ম, ধর্ম্মে সুখ। ধনী ইচ্ছা করিলে ধনপ্রভাবে বহু পুণ্যার্জ্জন করিয়া নিজে সুখী হইতে পারেন, পরকে সুখী করিতে পারেন। অপরাপর সভ্য জাতির তুলনায় বাঙালী অত্যন্ত জ্ঞান-দরিদ্র ও ধন-দরিদ্র। এ অবস্থায় জ্ঞানীর জ্ঞান বিতরণ, ও ধনীর ধন বিতরণ, অতীব প্রশংসনীয় পুণ্যকর্ম্ম। সম্প্রদায়-বিশেষের হিতকল্পে বা সমগ্র সমাজের উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থভাবে এককালীন অর্থদান সামাজিক হিসাবে স্থায়ী ফলপ্রসূ। সর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত হইয়া স্বাবলম্বন বলে অর্থের অর্জ্জন, সঞ্চয়ন, ও বর্দ্ধন করা প্রত্যেক সুস্থ যুবকের কর্ত্তব্য। এবং সমাজের কল্যাণে অর্জ্জিত অর্থের একাংশ ব্যয় করিতে প্রত্যেক অর্জ্জন-কারী ব্যক্তিই ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষ মাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥"

অলস বাঙালী দৈবের দোহাই দিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘরে বসিয়া থাকে। যাহারা কাপুরুষ, তাহারা যথার্থই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ অযোগ্যতা প্রদর্শন করে। কিন্তু এই প্রবল প্রতি-যোগিতার যুগে অযোগ্যের স্থান কোথায়? না মর্ত্ত্যে, না স্বর্গে। ঘরে বসিয়া শুইয়া 'লক্ষ্মী', 'লক্ষ্মী' উচ্চারণ করিলেই অলস কাপুরুষের কাছে লক্ষ্মী আসিবেন না। লক্ষ্মী তাঁহাদের নিকট স্বয়ং আগমন করিয়া থাকেন, যাঁহারা উদ্যমশীল পুরুষসিংহ। লক্ষ্মীর বরপুত্র তাঁহারা, যাঁহারা পরিশ্রমী পুরুষসিংহ। লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিতে হইলে পুরুষ হইতে হইবে। কাপুরুষ কখনও লক্ষ্মীর প্রিয়পুত্র হইতে পারে না। "বাণিজ্যে বসতে

লক্ষ্মীঃ"। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস। বাণিজ্য দ্বারাই লক্ষ্মীর পূজা করিতে হইবে। সাগর পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া বাণিজ্যার্থ দূরবিদেশে যাতায়াত করিতে হইবে। দৈবহত্যা করিয়া আত্মশক্তিবলে পুরুষত্ব দেখাইতে হইবে, তবে লক্ষ্মী প্রসন্ন হইবেন।

ধন বাহিরের আগন্তুকশক্তি। আভ্যন্তরীণ আত্মশক্তির সাহায্যে এই আগন্তুকশক্তিকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে। "ধনবান্ বলবান্ সর্ব্বঃ।" ধন আছে যার, বল আছে তার। ধন হইলেই বলবৃদ্ধি হয়। বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও বিদ্যার্থীমাত্রই বিদ্বান্ হইতে পারে না, সেইরূপ সকল লোকেই ধনী হইবে, এরূপ আশা করা যায় না; কিন্তু যত্ন করিলে সকল সমাজই ধনাঢ্য হইতে পারে। সমাজের ধনবল একান্ত আবশ্যক। ধনবল বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত। আশুপ্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ অর্থলাভে সন্তুষ্ট থাকিলে লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হইবেন না।

পুরাকালে দেবতারা অসুরের সাহায্য লইয়া, মন্দার পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া সমুদ্রমন্থনপূর্ব্বক লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছিলেন। সমুদ্র রত্নের আকর, লক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন। দেহটাকে অসুরের বলে বলীয়ান্ করিয়া, পর্ব্বত-বাধা উন্মূলিত করিয়া, সকলে মিলিয়া-মিশিয়া বাণিজ্যার্থ সমুদ্র মন্থন করিতে পারিলে বহু ধন রত্ন মিলিবে, লক্ষ্মীলাভ হইবে। নিতান্ত লক্ষ্মী-ছাড়া ভিন্ন লক্ষ্মীকে কে না চায়? লক্ষ্মীকে লাভ করাই লক্ষ্মীপূজার চরম ফল। মা লক্ষ্মি! তোমাকে নমস্কার। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা॥"

সেই দেবীকে বার বার নমস্কার করি, যিনি সকল জীবে লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন।

ভারতীদেবী।

কলাবিদ্যা।

"সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা-বিহীনঃ
সাক্ষাৎপশুঃ পুচ্ছ-বিষাণ-হীনঃ।" নীতিশতক।

কেবলই কি টাকা টাকা করিয়া বাকের ভায় কাঠের বস্তু কা-কা করিতে হইবে? অর্থের জন্য উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কেবলই কি গলদঘর্ম্ম শ্রম করিতে হইবে? ঘর্ম্ম অপনয়ন করিবার জন্য কি দু'দণ্ড বিশ্রাম করিতে হইবে না? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃতি দেবী বলিবেন—বিশ্রাম অবশ্যই চাই।

প্রখর নৈদাঘ রবিতাপের পর, সান্ধ্য শীতলবায়ু ও নৈশ স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক। বর্ষার মেঘ-মলিন বজ্র-করাল আকাশ হইতে বিগলিত অবিরল জলধারার পর, শরতের শুভ্র হাসিরাশি। তীব্রশীতের তুহিনসম্পাতের পর, ফুল্ল-কুসুম সৌরভ-বাহী মলয়ানিল। প্রকৃতির এইরূপ পরিবর্ত্তন জীবের অশেষ কল্যাণপ্রদ, স্বাস্থ্যকর ও আনন্দবর্দ্ধক। কায়িক শ্রমের পর মানসিক শ্রম, মানসিক শ্রমের পর কায়িকশ্রম, স্বেদাপ্লুত কর্ম্ম-কোলাহলময় শ্রান্ত দিবাজাগরণের পর শান্তিময় সুষুপ্তি, এবং সুষুপ্তির পর কর্ম্মময় জাগরণ, দেহ ও মনের রসায়ন-বিশেষ।

মন যখন শ্রম করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন শরীরকে একটা কাজ দিলে মনের বিশ্রাম হয়। আবার শরীরটা যখন খাটিয়া খাটিয়া অবসন্ন হয়, তখন সে বসিয়া থাকিতে চায়, কিন্তু মন নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে না। মন বড় চঞ্চল। তুমি কোন কার্য্যে লিপ্ত থাক আর নাই থাক, মন কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। মনের কার্য্য চিন্তা প্রায় সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। কায়িকশ্রমকালে উহা বড় একটা বুঝা না গেলেও, বিশ্রামার্থ একাকী, শ্রমশূন্য, অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে, বেশ বুঝা যায়। সুতরাং বিশ্রামকালে মনকে একটা বিষয় দেওয়া চাই। এমন একটা বিষয় দেওয়া দরকার, যাহাতে তার বিমল আনন্দ জন্মে, যাহাতে সে অজ্ঞাতসারে সানন্দে উন্নতি ও মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

নিদ্রাকাল ব্যতীত কখনও বিশ্রাম কর্ম্মহীন বিশ্রাম হওয়া উচিত নয়। কর্ম্মহীনতা বা আলস্যের নাম বিশ্রাম নহে। বৃথা কালহরণকে বিশ্রাম বলা যায় না। একপ্রকার কঠিন পরিশ্রম হইতে অন্য প্রকার আমোদজনক লঘুশ্রমের নাম বিশ্রাম। সংসার-চিন্তা-ভারাক্রান্ত, দিবসের অসার বা অযথা শ্রম-ক্লান্ত, বিভ্রান্ত বাঙালীর বিশ্রাম কোথায়? বাঙালী এক দিকে অলস-প্রকৃতি, অন্য দিকে স্বল্প লাভের তরে গুরু-বিরস, বুদ্ধির প্রখরতানাশক, অগ্নিমান্দ্যকারক, জাড্যজনক, একরূপ শ্রমে অভ্যস্ত; সুতরাং বিশ্রামসুখে বঞ্চিত। বাস্তবিক অবসরকাল কাটাইবার কৌশল আমাদের একপ্রকার অবিদিত। বৃথা গল্পে, পরনিন্দায়, তাসপাশাখেলায়, আমাদের অনেকের অবসরকাল কাটিয়া যায়। ইহাতে যে সুখ তাহা দুঃখের নামান্তর; অপর উন্নত সমাজের বিশ্রাম সুখের তুলনায় অতি নিকৃষ্ট। সঙ্গীতাদি কোন একটী বিশুদ্ধ আমোদজনক সরস বিষয় লইয়া, ধীমান্ সুরসিক ব্যক্তি বিশ্রামকাল কর্ত্তন করেন।

সঙ্গীত।

"গানাং পরতরং নহি।" সঙ্গীত অপেক্ষা চিত্তদ্রবকারী উৎকৃষ্টতর বিষয় আর কিছুই নাই। বিশ্রাম ভোগের পক্ষে সঙ্গীত অত্যন্ত উপযোগী। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি অনির্ব্বচনীয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "বেদানাং সামবেদোঽস্মি"। আমি বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ। একথার বোধ হয় ইহাই তাৎপর্য্য যে, সাম গীত হইয়া থাকে, ইহাতে লোকের মন ভগবানেব প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হয়, অন্য আর কোন মন্ত্রাদিতে সেরূপ হয় না। কৃষ্ণের মুরলীরবে গোকুল পুলকিত হইত, ওরফিয়স (Orpheus)এর গানে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত মোহিত হইত। তানসেনের সঙ্গীত মোগলকুলতিলক সম্রাট্ আকবরের সভাকে উৎসবময় করিত। ভক্তকবি রামপ্রসাদের গানে পাষাণহৃদয় গলিয়া যাইত। মধুর সঙ্গীত-রব, শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিয়া তাড়িতবেগে হৃদয়-যন্ত্র আলোড়িত করিয়া, দেহ-প্রাণ-মন অপূর্ব্ব পুলকে পূর্ণ করিয়া তোলে, দুঃসহ শোকসন্তাপ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদূরিত করে। ধর্ম্মোপদেষ্টা শত সহস্র উপদেশে যে ধর্ম্মভাব মানবহৃদয়ে জাগাইতে সমর্থ নহেন, সঙ্গীত ক্ষণকাল মধ্যে তাহা পারে। দার্শনিক শত ধর্ম্মব্যাখ্যায় যাহা পারেন নাই, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের হরিসংকীর্ত্তন তাহা পারিয়াছে। সঙ্গীত মরুময় দেশের ওয়েসিস্ (মরুদ্যান)। ইন্দ্রজালের ন্যায় ইহার ক্রিয়া। ইহাতে কে না মুগ্ধ হয়? মহাদেবের 'নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপ'বৎ চিত্তও নারদের বীণাগানে টলিত। শিশু-যুবা, প্রৌঢ়-স্থবির, স্ত্রী-পুরুষ, এমন কি, তির্য্যক্‌জাতিও সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ক্রূর সর্পও বংশীরবে আত্মহারা হয়। রণ-সজ্জায় সজ্জিত সৈনিকদিগের হৃদয় রণবাদ্যনিনাদে কি এক মত্ততায় নাচিয়া উঠে। তখন তাহারা প্রাণের মমতা ভুলিয়া যায়।

আবার "যদিও না থাকে সুর তাল জ্ঞান, যদিও না থাকে রাগরাগিণী বোধ," তথাপি প্রায় সকল মনুষ্যই আপনার ভাবে আপনি মজিয়া সময়ে সময়ে গান ধরে।

সমাজের সৃষ্টি হইতে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই ইহার আদর দেখা যায়। মহাকবি সেক্ষপীর (Shakespeare) বলিয়াছেন, "হৃদয়ে যার সঙ্গীতের ঢেউ খেলে না, সঙ্গীতে যার মন টলে না, গলে না, এমন লোককে বিশ্বাস করা যায় না।"

"The man that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems and spoils.
* * * * *
Let no such man be trusted."

Merchant of Venice.

কোকিলের কলকাকলী সকল পক্ষীর নাই। সকল মানুষই সুগায়ক হইতে পারে না। কিন্তু যত্ন ও শিক্ষার গুণে অনেকেই সঙ্গীত-বিদ্যায় অন্ততঃ কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারে। একঘেয়ে, শুষ্ক, গদ্যময় জীবনকে সরস-প্রফুল্ল, পদ্যময় করিতে হইলে সঙ্গীতের আশ্রয় লইতে হয়; সযত্নে বীণাপাণির চরণসেবা করিতে হয়।

বঙ্গদেশের অনেক অঞ্চলে সঙ্গীতের চর্চ্চা উপযুক্তরূপে হয় না। এই শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্তি অনেকেরই দেখা যায় না। কারণ, সঙ্গীতে জ্ঞান না থাকিলেও অর্থার্জ্জনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। ইহা সত্য বটে, কিন্তু জীবনের ভার লাঘব করিতে হইলে, বিশ্রামসুখ উপভোগ

করিতে হইলে, সঙ্গীতের প্রয়োজন। সঙ্গীত যে একটা শিক্ষার বিষয় হইতে পারে, ইহা অনেকেরই ধারণা নাই। পিতা-পুত্রে, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠে, গুরু-শিষ্যে একত্র হইয়া গান করা অনেকের মতে অসঙ্গত, এরূপ করাটা যেন একটা পাপ কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত। অভিভাবকের নিকট সঙ্গীত বিষয়ে বালকগণ কোন রূপ উৎসাহ বা সাহায্য পায় না। কাজেই তাহাদের এই বৃত্তিটী অননুশীলিত থাকে। রুচি থাকিলেও শিক্ষার অভাবে অনেকেরই এই বৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। অনেক স্থলে বলপূর্ব্বক ইহাকে নিরোধ করা হয়। তৌর্য্যত্রিক (নৃত্য, গীত, বাদ্য) ছাত্রদিগের পক্ষে কাহারও কাহারও মতে নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত। ইহার স্বপক্ষে যুক্তি এই, সঙ্গীতে মনকে লঘু করে, বিলাসিতার দিকে টানিয়া লয়, দুর্নীতির আশ্রয় লইতে আহ্বান করে। যাত্রাদলের বালকবৃন্দ, থিয়েটারের যুবকদল, প্রায়ই তরলচিত্ত ও বিলাসপ্রিয়, এবং কেহ কেহ ভ্রষ্টচরিত্র হয়। একথা যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে কুশিক্ষা ও কুসঙ্গের বিষময় ফল। ভাল জিনিষও ব্যবহারদোষে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়।

জ্ঞান উত্তম জিনিষ, কিন্তু অপপ্রয়োগে অমঙ্গল। ধন জীবনধারণের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু অপব্যবহারে অকল্যাণ। নিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি আবশ্যকীয়; কিন্তু অতিনিদ্রা অস্বাস্থ্য আনয়ন করে। তা বলিয়া জ্ঞানলাভ রহিত হইতে পারে না, ধনার্জ্জন অবৈধ হইতে পারে না, নিদ্রা পরিত্যাগও কর্ত্তব্য হইতে পারে না। প্রেম স্বর্গীয় পবিত্র জিনিষ, কিন্তু কামপর নীচাশয় ব্যক্তির কাছে পড়িয়া তাহাই পঙ্কিল পূতিগন্ধময় কামে পরিণত হয়। তা বলিয়া প্রেম ভাল নয়, প্রেমিক হওয়া অনুচিত, এ কথা কে বলিবে? সুশিক্ষায়, সৎসঙ্গে, সঙ্গীত সুধাময়। কাম-কলুষিত কুৎসিত সঙ্গীত, সঙ্গীত নামের উপযুক্তই নয়। যে আমোদ

পিতা-পুত্রে, গুরু-শিষ্যে মিলিয়া উপভোগের অযোগ্য, তাহাতে আবিলতা আছেই বুঝিতে হইবে। যেমন আকাশ হইতে পতিত মেঘ-বারিধারা অতি বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, সুপেয়; কিন্তু নালা ডোবায় পড়িয়া অশুদ্ধ, সমল ও অপেয় হয়। সেইরূপ সঙ্গীত স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ, পাত্রভেদে অশুদ্ধ। উন্নত সঙ্গীতে মন উন্নত, কুসঙ্গীতে কলুষিত হয়। অথবা কুৎসিত মনে কুসঙ্গীতের জন্ম; এবং কুরুচিপূর্ণ সমাজে কুসঙ্গীতই প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। উন্নত সঙ্গীত উন্নত সমাজেরই পরিচায়ক।

সঙ্গীত জিনিষটা প্রকৃতপক্ষে যদি মন্দই হয়, তবে ইহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া সমাজ হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই উচিত। যদি ভাল হয়, তবে প্রত্যেকেরই আলিঙ্গন করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে যে, সঙ্গীত মন্দই বটে, যাহারা মন্দ মানুষ, তাহারা মন্দ লইয়াই থাকুক; আর আমরা ভাল মানুষ, পিতা পুত্রে একত্র হইয়া যাত্রা গান শুনিব, নাচ দেখিব, অভিনয় দেখিব, আর বাহাবা দিব!

ভাই ভগ্নী পরস্পর প্রীতির বন্ধনে সম্বদ্ধ থাকিয়া প্রতিদিন কর্ত্তার সঙ্গে অন্ততঃ একবার প্রাতে কি সন্ধ্যায় মিলিত কণ্ঠে বিভুগুণগান করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করা কি অন্যায়, অধর্ম্ম? যে সমাজে প্রায় প্রত্যেক পরিবার এই প্রকার বিশুদ্ধ সঙ্গীতানন্দ আস্বাদ করিয়া থাকে, সেই সমাজে দেবগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া থাকেন।

বৈদেশিক বাদ্যে ও নকল গানে আমরা আমোদ পাইতেছি বটে, কিন্তু সমাজ হইতে দিন দিন আমোদ-আহ্লাদ চলিয়া যাইতেছে। আনন্দ-উৎসব কমিতেছে। শিক্ষিতগণ কোন কোন উৎসবকে বর্ব্বরোচিত মনে করিয়া বিদায় দিতেছেন।

প্রফুল্লতা চিত্তের নীরব সঙ্গীত, মনের স্বতঃ আনন্দপ্রবাহ নির্ঝরের ঝর্‌ঝর্ কল্‌কল্ শব্দের ন্যায়, গীতে বাদ্যে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

সঙ্গীতের অভাব, অনাদর, আনন্দের অভাব সূচনা করে। আনন্দের অভাবে সঙ্গীতের অনাদর, অবশেষে মৃত্যু। হরকোপানলে ভস্মীভূত কন্দর্পের জন্য রতি বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"পরলোক-নব-প্রবাসিনঃ
প্রতিপৎস্যে পদবীমহং তব।
বিধিনা জন এষ বঞ্চিত
স্ত্বদধীনং খলু দেহিনাং সুখম্॥"

অর্থাৎ তুমি ত আজ পরলোকে চলিয়া গেলে, আমিও তোমারই অনুসরণ করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীর লোক এতদিনে সুখে বঞ্চিত হইল; কেন না, জীবের সুখভোগ তোমারই অধীন। সঙ্গীতের বিলোপসাধন হইলে, নীরব সঙ্গীত লোকচিত্ত হইতে নীরবে বিদায় গ্রহণ করিলে, বঙ্গকবিতাও বোধ হয় সেইরূপ বিলাপ করিবে!

কাব্য।

"কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।
ব্যসনেন চ মূর্খানাং নিদ্রয়া কলহেন চ॥"

বিদ্বান্, ধীমান্ ব্যক্তিগণ কাব্যপাঠজনিত সুখে কালকর্ত্তন করিয়া থাকেন; আর মূর্খেরা তাস পাশা খেলিয়া, ঘুমাইয়া ও কলহ করিয়া কাল কাটায়।

কাব্য কি? 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। রসই কাব্যের প্রাণ। রস কি? রস অনির্ব্বচনীয় আনন্দবিশেষ। ইহা আস্বাদনের বস্তু, বুঝাই-

বার বস্তু নহে। ব্যাখ্যা করিয়া মধুর মিষ্টত্ব বুঝান যায় না, আস্বাদনেই বুঝিতে হয়। কাব্যরসও সেইরূপ উপভোগক্ষম, ব্যাখ্যার্হ নহে। ইহা 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ'। ব্রহ্মাস্বাদতুল্য। ব্রহ্মানন্দ কেমন, কে বলিবে? কে বুঝাইবে? ব্রহ্মানন্দের ন্যায় কাব্যরসও নিরুপম, অনির্ব্বচনীয়। কাব্যপাঠে মন কি এক অপূর্ব্ব, অপার্থিবভাবে পরিপূর্ণ হইতে থাকে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। 'কাব্যং জগন্মঙ্গলম্', কাব্য জগতের মঙ্গল। কাব্যে যেরূপ জগতের মঙ্গল হইয়া থাকে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। রামায়ণ, মহাভারত যেমন ভারতসমাজের উপকার করিয়াছে, কপিল-কণাদের দর্শন-বিজ্ঞান কি তেমন পারিয়াছে? এই দুই মহাকাব্য সমগ্র সমাজকে সঞ্জীবিত ও উন্নমিত করিয়াছিল। উহারা জ্ঞান ও সুখের অনন্ত উৎস, অক্ষয় অমৃতভাণ্ডার। কত কবি কাব্যদ্বয় হইতে জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমর হইয়াছেন, কত ধর্ম্মপিপাসু ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত কবিদের ত কথাই নাই, বর্ত্তমান-কালে পাশ্চাত্যবিদ্যায় কৃতবিদ্য গ্রন্থকারগণও এই কাব্য দুইখানির নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। ফলতঃ কাব্যই সমাজের জীবনকে সরস, কাব্যময় করিয়া রাখে, জাতীয় জীবনকে সজীবতা প্রদান করিয়া থাকে। কাব্যশূন্য সমাজ ও ব্যক্তি শীতকালের ফল-পুষ্প-পল্লব-রহিত, জীর্ণতরুর ন্যায় শোভাসৌন্দর্য্যহীন, মৃতকল্প।

Dead is the life without poetry,
Deedless, and with no heart to feel,
Like to a tree shorn of beauty—
Flower, fruit and leaf,—in winter chill.

সভ্যতার উন্নতিতে কাব্যের অবনতি, একথা প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন। সরস বাল্যে ও উদ্দাম যৌবনে যখন সংসারটা

রসে ভরপূর বলিয়া বোধ থাকে, তখন হৃদয়কাননে কবিতাকুসুম ফুটিয়া উঠে। আর বিরস বার্দ্ধক্যে যখন নিরাশার উষ্ণতাপে হৃদয়-মন দগ্ধ হইতে থাকে, তখন কবিতাকুসুমও ম্লান হইয়া যায়। সেইরূপ সমাজের বাল্যে ও প্রথম যৌবনাবস্থায় কবিতার সৃষ্টি ও বিকাশ, প্রৌঢ়াবস্থায় সভ্যতার বৃদ্ধিতে কবিত্ব ম্লান হইতে দেখা যায়। সভ্যতার তীব্রপ্রখরতাপে কবিতার কোমল প্রাণ আইঢাই করে।

একথা সত্য যে, আদিম ঋজু সমাজে আদৌ জীবনসংগ্রাম ছিল না, তখন লোকে কাব্যামোদ উপভোগ করিবার যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর পাইত। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ, জটিলতা-বহুল সভ্যসমাজে লোক জীবনযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া আর সেরূপ কাব্যের অনুশীলন ও রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হয় না। আবার, ইউরোপীয় সভ্যতার উন্নতির যুগেই সেক্ষপির, মিল্টন্, ওয়ার্ডওয়ার্থ্স্, টেনিসন্, কাব্যরাজ্যের রাজা। ভারতবর্ষেও সভ্যতার উৎকর্ষকালেই বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস, কাব্যজগতের রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী। ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ছায়ায় মধু, হেম, নবীন, রবীন্দ্র উজ্জল কবিবত্ন। তবেই সভ্যতায় কবিতার উন্নতি কি অবনতি, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ারই সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ক্রমশঃই কাব্যপিপাসুর সংখ্যা-হ্রাস হইতেছে।

কাব্যে যদি কেবল রসই পাওয়া যায়, তবে কাব্যরসিকের সংখ্যা-হ্রাস কেন? সকলেই ত রস চায়। এক কারণ, অবকাশের অভাব, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর একটী কারণ, কাব্য ছাড়িয়াও অন্যান্য বহুতর বিষয়ে লোকে আজকাল রস পাইতে চেষ্টা করে। "রসো বৈ সঃ"। ব্রহ্ম রসস্বরূপ, তথাপি ব্রহ্মরস ছাড়িয়া লোকে বিষয়রসে ডুবিয়া থাকিতে লালায়িত কেন? আবার, কাব্যরস পান করিতে ইচ্ছা করিলেই

পান করা যায় না; হৃদয় চাই, হৃদয়ের শিক্ষা চাই। ইচ্ছা করিলেই ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ হয় না; সাধনা চাই, তপস্যা চাই।

কবির হৃদয় চিরকালই প্রশস্ত, শুষ্কতার বিরোধী, চাতকপক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধগগনবিহারী। বিষয়াসক্ত সাধারণ লোকের সঙ্কীর্ণহৃদয় কবি-হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না, এই উভয় হৃদয়ের মিল-মিশ হয় না। কবির কল্পনা কর্ম্মব্যস্ত বিষয়ীর ভাল লাগে না। আবার, বর্ত্তমান বঙ্গকবিদিগের অনেকেই পূর্ব্বকালীন বহুমূল্য ঢাকাই জামদানী সূক্ষ্মবস্ত্রের ন্যায়, ভাবসূক্ষ্ম কবিতা লিখিয়া থাকেন। তাহা "মূর্খে বুঝিবে কি, পণ্ডিতের লাগে ধাঁধা"। ঢাকাই সূক্ষ্ম কাপড় সর্ব্বসাধারণের ভোগে না আসিয়া, ধনী-বিলাসীদিগেরই ভোগে আসিত। বর্ত্তমান অধিকাংশ কবিতাও জন-সাধারণের অযোগ্য, অভোগ্য।

এই জড়-প্রিয়তার যুগে, কঠোর বাস্তবতার দিনে, লোকের কেবল করস্পর্শক্ষম স্থূলবস্তু লইয়াই ব্যস্ততা, ভাবরাজ্যে বিচরণ করিবার প্রবৃত্তি নাই, রুচি নাই। আবশ্যকতা-বোধও নাই। কিন্তু আবশ্যকতা যথেষ্ট আছে। উপর্য্যুপরি অনেক দিন মুসূরী বা কলাই দাল খাইতে খাইতে মুখে অবশ্যই অরুচি জন্মে, স্বাস্থ্যেরও বিঘ্ন জন্মায়। তাই অন্যবিধ দাল, তরকারীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সেইরূপ প্রতিদিন না পারিলেও মধ্যে মধ্যে যথাকালে কাব্যসাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া মনের রুচিটাকে একটু একটু বদলাইয়া লইতে হয়। ইহাতে মনের রুক্ষতা দূর হইয়া স্নিগ্ধতা জন্মে। প্রতিনিয়ত বস্তুজগতের বস্তুরস পান করিয়া করিয়া সংসারটা রসহীন বলিয়া বোধ হইলে, মাঝে মাঝে উচ্চ গ্রামের ভাবরাজ্যে মনকে লইয়া গেলে, মনে একটা নূতন বল, নূতন তেজ ও স্ফূর্ত্তি আসে। বস্তুরস নবীভূত হইয়া মধুরতর হয়। যেমন কঠোর শারীরিক শ্রমে শরীর অবসন্ন হইলে, আহার ও নিদ্রার পর শরীরে একটা নূতন বল আসে,

এবং পুনরায় শ্রমসামর্থ্য জন্মে, সেইরূপ কাব্যসাহিত্যের অনুশীলনে মনে সজীবতা ও সরসতা আসে। কাব্যসাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সমধিক প্রচলনে সমাজের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া, উদারতার উদয় ও ব্যক্তিগত নির্ম্মল সুখের মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সৌন্দর্য্যবোধ।

কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি ও উপাদেয়তা সৌন্দর্য্যবোধের উৎকর্ষের উপর অনেকটা নির্ভর করে। একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যজ্ঞান সকল মানুষের চিত্তেই আছে। কোথাও অল্প, কোথাও বা অধিক, কোথাও প্রবুদ্ধ, কোথাও বা প্রসুপ্ত। নির্ম্মলচিত্ত, সরল অবোধ মানবশিশু প্রায় যাবতীয় পদার্থেই সৌন্দর্য্য দেখে, অতি সামান্য তুচ্ছ বস্তুও তাহার নিকট কেমন সুন্দর! উহা দেখিয়া-ধরিয়া তাহার কতই আনন্দ! সংসারের কোনো বস্তুই বুঝি তাহার নিকট কুৎসিত বলিয়া বোধ হয় না। সে বিষধর সর্পকেও সুন্দরবোধে আলিঙ্গন করিতে চায়। জগতের প্রতিপদার্থ, যাহাই তাহার নেত্রগোচর হয়, তাহাই সুন্দর। কিন্তু জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধিসহকারে এই বিচাররহিত সৌন্দর্য্যবোধ ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকে। অবশেষে অনেক স্থলেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কৃত্রিমতায় পরিণত হয়। স্বার্থের সংঘর্ষে, শিক্ষার অভাবে বা কুশিক্ষার প্রভাবে সুন্দর কুৎসিত হয়, কুৎসিত সুন্দর হয়।

সুন্দর কি? শক্তিই সুন্দর। শক্তির বিকাশই সৌন্দর্য্য। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যখন পত্র-পুষ্প-ফলে শোভমান বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন উহা সুন্দর। যৌবনে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির বল বৃদ্ধি হইতে থাকে, যৌবন সুন্দর। যখন রোগ বা জরা আসিয়া মানুষের বলহরণ করে, তখন সে

কুরূপ। মনুষ্যত্বের বিকাশই মানুষকে সুন্দর করে। লোকের শক্তিপ্রয়োগ কুৎসিত হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া শক্তি কুৎসিত নহে। কারণ, বীজ শক্তিতে সৌন্দর্য্যের বীজ নিহিত থাকে।

গ্রীক্ দার্শনিক পণ্ডিত মহাত্মা সক্রেটিস্ বলিয়াছেন,—যাহা কার্য্যকর, কাজে আসে (useful), তাহাই সুন্দর। কিন্তু একথায় বোধ হয় সকলের মন উঠিবে না। লৌহ খুব কাজের জিনিষ, ধাতুজ পদার্থের মধ্যে ইহার মতন নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থ দ্বিতীয় নাই। কিন্তু ইহাকে সুন্দর বলিবে কে? জীর্ণ তৃণঘাসে ঘরের ছাউনি হয়, কয়জন ইহাকে সুন্দর বলে? জ্বালানি কাষ্ঠ অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু কে ইহা সুন্দর দেখে? তবে সুন্দরের এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে;—যাহা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আহ্লাদ জন্মাইয়া, চিত্তের অপূর্ব্ব বিকাশ ও আনন্দ উৎপাদন করে, যাহা উপকারক, তাহা সুন্দর। বালসূর্য্য, পূর্ণচন্দ্র, সুন্দর। ইহারা চক্ষুর প্রীতি সাধন করিয়া চিত্তকে প্রফুল্ল করে। ইহারা জগতের উপকারক। গ্রীষ্মাবসানে মেঘগর্জ্জন কর্ণের প্রীতি জন্মাইয়া মনের আনন্দ বিধান করে, উপকারার্থ উদিত মেঘের বারিবর্ষণ সূচনা করে। ইহা সুন্দর।

বাহিরের রূপ, যাহা চোখে দেখিতে ভাল, তাহাই সুন্দর, অজ্ঞ লোকের এইরূপ ধারণা। কিন্তু জ্ঞানের ন্যায় সৌন্দর্য্যও পাঁচ ইন্দ্রিয় ভেদে পাঁচ প্রকার। যথা, চাক্ষুষ, শ্রাবণ, রাসন, ঘ্রাণ ও ত্বাচ্। তবে চক্ষু পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই অজ্ঞ লোকের এইরূপ বোধ। আন্তর সৌন্দর্য্যের প্রতি অল্প লোকেরই দৃষ্টি আছে। ভগবান্ পূর্ণ-অনন্ত-সুন্দর। তাঁহার বিরচিত বিশ্বের কোন পদার্থই অসুন্দর হইতে পারে না। তবে যে আমরা সকল পদার্থই সুন্দর দেখি না, আমাদের অপূর্ণতাই ইহার কারণ। অনুবীক্ষণ সাহায্যে ক্ষুদ্র মক্ষিকা যে কত সুন্দর, তাহা বুঝা যায়। অন্তর্দৃষ্টিশক্তি সম্যক্ বর্দ্ধিত, ও সৌন্দর্য্য জ্ঞানের স্বাস্থ্য-

কর, সমুচিত বিকাশ হইলে, বিশ্ব সৌন্দর্য্যময় বলিয়া প্রতীতি হওয়া সম্ভবপর।

প্রাকৃতিক নিয়মের বৈষম্যে, শিক্ষা ও জ্ঞানের তারতম্যে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে, কাল, পাত্র ও অবস্থা ভেদে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ, সেখানে উষ্ণতা, তাপ বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর। কাব্যসাহিত্যেও এই দুই শব্দের (warmth, heat) মধ্যে একটা মাধুর্য্য ও আকর্ষণ আছে। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে শৈত্যের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক। কাব্যেও শীতল শব্দের একটা প্রাণ-মন-শীতলকারী সরসতা আছে, রসভাব আছে। ভারতে শৈত্য প্রীতি-প্রদ, সুন্দর। পাশ্চাত্যদেশে নবদম্পতির নিঃসঙ্কোচ বিহার, বঙ্গদেশে বর-বধূর সঙ্কুচিতভাব সুন্দর। মাতালের নিকট বোতলের লালজল কেমন সুন্দর, সুপেয়! সংযমীর নিকট ইহা কুৎসিত, অপেয়। উচ্ছৃঙ্খল, কলুষিতচিত্ত যুবকের নিকট থিয়েটারের আদিরসাশ্রিত সঙ্গীত কেমন সুশ্রাব্য, সুন্দর! চরিত্রবান্ জিতেন্দ্রিয় যুবার কাছে উহা অশ্রাব্য, কদর্য্য।

সুন্দরের উপাসনা অল্লাধিক পরিমাণে অনেকেই করে ও করিতে চায়। কিন্তু শিশুর সুন্দর মাটির পুতুল যুবার চিত্তাকর্ষক নহে। অসভ্য নাগা-কুকির পক্ষিপালকাদিতে রুচি সভ্যতার বাতাসে উড়িয়া যায়। আবার, সভ্যসমাজেও শিক্ষার দোষে কুৎসিত সুন্দর হয়, সুন্দর কুৎসিত হয়। পবিত্রতা জিনিষটা সুন্দর। একথায় কেহই দ্বিরুক্তি করিবেন না। কিন্তু একের চক্ষে যাহা পবিত্র, অন্যের চক্ষে তাহাই অপবিত্র হইতে পারে। এই প্রকারে সুন্দর-কুৎসিত লইয়া লোকসমাজে মতভেদ ঘটে। কোন কোন লোক বা সমাজ এই অবস্থায় সুন্দরের উপাসনা করিতে যাইয়া কুৎসিতেরই ভজনা করিয়া থাকে। ইহা অনিষ্টজনক। সুতরাং

এই বিষয়ের শিক্ষা চাই, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যরুচিকে যথার্থ পথে পরিচালিত করা, মার্জ্জিত করা ও তাহার উৎকর্ষ বিধান করা চাই।

চিরসুন্দর ভগবানের সৃষ্টিতে কিছুই কুৎসিত নহে, তবে মানুষের গড়া জিনিষের মধ্যে সুন্দর, কুৎসিত দুই-ই আছে। মানুষ নিজের সৃষ্ট, গঠিত চরিত্রদোষে বা গুণে নিজেই কুৎসিত বা সুন্দর হইয়া পড়ে। প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত হইলে, নিজকে কুৎসিত দেখিতে ও দেখাইতে আর ইচ্ছা জন্মে না। তখন নিজের ও সমাজের দোষ সংস্কার-পূর্ব্বক নিজেকে ও সমাজকে সুন্দর করিতে বলবতী ইচ্ছা জন্মে।

কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের সহায়। কাব্যের অনুশীলনে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিশুদ্ধতা জন্মে। এবং সৌন্দর্য্য জ্ঞানের উদয় ও উৎকর্ষে কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদ পাওয়া যায়। এই বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন না হইলে মনুষ্যোচিত বিশ্রামসুখের অত্যল্পতা ও অগৌরব হইয়া থাকে।

সুন্দরকে বাছিয়া লওয়া চাই। নতুবা সুন্দরের পূজা করিতে যাইয়া, অজ্ঞতা বা অন্ধতাদোষে যে সমাজ বা ব্যক্তি কুৎসিতের পূজা করিতে থাকে, সেই সমাজ বা ব্যক্তির আত্মা কলুষিত হয়।

কাব্য দুই প্রকার,—ঈশ্বর-কবির কাব্য, আর মানুষ-কবির কাব্য। উভয়বিধ কাব্যই মানুষের ভোগ্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth) বলিয়াছেন,

"My heart leaps up when I behold,
A rainbow in the sky :
So was it when my life began,
So is it now I am a man ;
So be it when I shall grow old,
Or let me die."

অর্থাৎ

হিয়া মোর নেচে ওঠে, আকাশের গায়
ইন্দ্রধনু নেহারি যখন :
নাচিত এম্নি যখন আছিনু বালক,
নাচে এম্নি এখন যে হইনু যুবক ;
নাচে যেন এম্নিভাবে বার্দ্ধক্য-দশায়,
হোক মোর নতুবা মরণ।

কবি, প্রকৃতির ভিতরে যে সৌন্দর্য্যরস পাইতেন, তাহাতে ডুবিয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। এই প্রকার বিমল আনন্দে বঞ্চিত হইয়া জীবনধারণ করা কবির অসহনীয়। যে আনন্দে কবির হৃদয় নাচিত, যে নীরবসঙ্গীত কবির হৃদয়কে নাচাইত, তাহা কার না স্পৃহনীয়? বস্তুতঃ আনন্দবিচ্যুত হইয়া বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনামাত্র। আদিকবি নারায়ণ যে বিশ্বকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রতিপত্রছত্র কবিত্বপূর্ণ। এই কবিত্ব যিনি আস্বাদন করিতে পারেন, যিনি বিশ্বময় সৌন্দর্য্য দেখেন, তিনি কবি। তিনি সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপাসক। বিশ্বকাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব-কবিকে বুঝিতে পারিলে, সুন্দরের পূজা সম্পূর্ণ হয়।

যাঁহা হইতে প্রেম-গঙ্গার ত্রিধারা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে প্রবাহিত, সেই অনন্তসুন্দর, ভুবনমোহন ভগবানের নিত্য-নব, নিত্য-বিকসিত, চির-সৌরভময়, স্নিগ্ধ-শীতল চরণপদ্মে মন আকৃষ্ট হইলেই সৌন্দর্য্যজ্ঞানের সুন্দর সার্থকতা। নিজে সুন্দর হইয়া, সমাজস্থ পরিজনকে সুন্দর করিয়া, খণ্ড ও ক্ষণিক সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ সেই চিরসুন্দরের চরণে মনকে চিরমগ্ন রাখা সৌন্দর্য্যজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ।

গণেশদেবতা সকল দেবপূজাতেই প্রথম স্থান পাইয়াছেন। এই জন্যই

বোধ হয় তাঁহার স্বতন্ত্র পূজার প্রচলন নাই। কিন্তু কার্ত্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পৃথক্ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পূজা প্রচলিত আছে। কোন কোন অঞ্চলে তখন এই তিন দেবতার মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই তিন দেবতা চিরকাল উপাস্য। ইঁহাদের মূর্ত্তি কখনো মনোমন্দির হইতে দূর করিতে নাই। দেহবলে বলীয়ান্, লক্ষ্মীযুক্ত ও শিল্পী কলাবিৎ হইয়া চিরকাল এই সকল দেবতার পূজা করিতে হইবে।

কাব্য-সঙ্গীত-সৌন্দর্য্য একটা শক্তি, প্রাণতোষিণী শক্তি। সরস্বতী, ললিত কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সৌন্দর্য্যশালিনী নারায়ণীশক্তি। সঙ্গীত ও কাব্যসাহিত্যে এবং অন্যান্য কলাবিদ্যার যথাযথ অনুশীলন, উৎকর্ষসাধনই সরস্বতীর প্রকৃত উপাসনা। ইহাতেই দেবীর প্রসাদে আনন্দলাভ সম্ভাবিত। দেবি সরস্বতি! আমাদের হৃদয়ে বল দাও, প্রেমভক্তি দাও।

"মেধে সরস্বতী বরে......... .
নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

তুমি মেধা, তুমি শ্রেষ্ঠা, তুমি সরস্বতী, তুমি নারায়ণী; তোমাকে নমস্কার।

শক্তি
ও
কর্ম্ম।

সূর্য্যতাপে বাষ্পাকারে পরিণত সাগর-জলে মেঘের জন্ম, মেঘ-বারি হইতে নদীর উৎপত্তি, সেই নদী নানা ঋজু কুটিল পথ অতিক্রম করিয়া একটা আবেগময় একটানা স্রোতে সমুদ্রসঙ্গম লাভ করিয়া চরিতার্থ হয়। যাহা হইতে উৎপত্তি, তাহাতে প্রবেশ-চেষ্টা নদীর স্বভাব বা ধর্ম্ম। সেইরূপ মানুষের জীবন-নদী ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্র হইতে আত্মলাভ করিয়া পুনরায় তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করা মানবজন্মের সার্থকতা। ব্রহ্মকে বা মাতৃরূপিণী মহাশক্তিকে লাভ করা ধর্ম্মের উচ্চতম উদ্দেশ্য।

পশু, পক্ষী ও মানব প্রভৃতির শিশুসন্তান নিতান্ত শক্তিহীন, অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া দিন দিন শশিকলার ন্যায় পুষ্ট হইতে পুষ্টতর হইতে থাকে, দিন দিন দেহের ও ইন্দ্রিয়ের বল বাড়িতে থাকে। মানব-শিশুর জন্মের প্রথম দিনের শক্তি ও বিংশতি বয়ঃক্রমকালের শক্তি তুলিত হইলে কেমন বিস্ময় জন্মে!

বলবৃদ্ধিই ভগবতীর অভিপ্রায়। তাঁহারই সুকৌশলে ও সুব্যবস্থায়

প্রকৃতিদেবী যেন সর্ব্বসাধারণের মাতৃরূপে স্নেহময় হস্তে সকলকে বাড়াইয়া তুলিতেছেন। শক্তিলাভ করা প্রাণিমাত্রেরই ধর্ম্ম, মানুষেরও ধর্ম্ম। তবে মানুষের বিশেষত্ব কোন্ খানে? প্রকৃতির শাসন মানিয়া ও প্রকৃতিকে শাসনে রাখিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার বলবৃদ্ধির চেষ্টা মানুষের বিশেষত্ব, মানুষের ধর্ম্ম। ভগবতী মানুষকে যে বুদ্ধিবৃত্তি, যে ইচ্ছাশক্তি, যে একটু স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন, তাহারই বলে মানুষ ভাল মন্দ বিচার করিতে ও স্বাধীন ভাবে কর্ম্ম করিতে সমর্থ। পশ্বাদির তাহা নাই, সুতরাং তাহাদের পাপপুণ্য নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই। বাহির ও ভিতর লইয়া সমগ্র মানুষের সর্ব্বপ্রকার শক্তির অর্জ্জন, সংযমন, ও সংরক্ষণ এবং সেই শক্তির যথোপযুক্ত প্রয়োগ মানুষের ধর্ম্ম। ধর্ম্মেই মানুষের উন্নতি ও সুখ। ধর্ম্মেই সমাজের প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেই সমাজের উন্নতি।

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, মনের প্রধানতঃ তিনটী বৃত্তি। যথা— জ্ঞান (knowing), ভক্তি, প্রেম, দয়া প্রভৃতি (feeling) এবং ইচ্ছা (willing)। এই বৃত্তিগুলির নির্ব্বিরোধে যুগপৎ সম্যক্ অনুশীলনই মানবসাধারণের ধর্ম্ম।

জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি সত্ত্বগুণের কার্য্য, উত্তম। ইচ্ছা রজোগুণসম্ভূত, তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। তবে কি ইচ্ছাকে বলি দিতে হইবে? না, তা নয়। ইচ্ছা ভগবতীর দান। তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহা মন্দ হইতে পারে না। বরং ইচ্ছাবৃত্তির উন্নতিবিধানই ভগবতীর অভিপ্রায়। ইচ্ছা কর্ম্মের প্রসূতি। ইচ্ছা ব্যতীত কর্ম্মে প্রবৃত্তি অসম্ভব, কর্ম্ম ব্যতীত সংসার টিকে না, সৃষ্টি থাকে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কামকর্ম্ম তবে দাঁড়ায় কোথায়?

নিষ্কাম কর্ম্ম কি? রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া মানুষ যে একেবারেই কামনা বিসর্জ্জন দিতে পারিবে, কৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য্য বোধ হয়

তাহা নয়। কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ত্তব্যের সম্পাদন করিতে হইবে। ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখিবে না। কাম শব্দে স্বার্থ, নীচ ক্ষুদ্র স্বার্থ, যাহা অমঙ্গল-জনক। এই নীচস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। উচ্ছৃঙ্খল দুষ্ট বাসনাকে দমন করিয়া শুভইচ্ছাকে জাগাইয়া কর্ম্মী হইতে হইবে। ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষামাত্র লইয়া যে প্রেমিক, ভক্ত বা জ্ঞানী তাঁহার উপাসনা কার্য্যে নিরত, তাহার কর্ম্ম সকাম কি নিষ্কাম? সকাম বলিলে, নিষ্কামকর্ম্ম সংসারে নাই, থাকিতে পারে না। নিষ্কাম বলিলে, একেবারে যে কাম বা কামনা নাই, তাহা নয়। পরের দুঃখ দূর করিবার কামনা লইয়া যিনি পরোপকার করিতেছেন, তিনি নিষ্কাম কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেছেন। আমি জ্ঞানলাভ করিব, নিজের ও সমাজের উন্নতিসাধন করিব, পরের দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে চেষ্টা করিব, এইরূপ কোন একটা বলবতী বাসনা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া কোন ক্রমেই দূষণীয় হইতে পারে না। ভগবান্ কৃষ্ণের উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে,—স্বার্থপরতা নিঃশেষে পরিত্যাগ কর, ক্ষুদ্র স্বার্থে বলি দাও, উদার স্বার্থ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর, মঙ্গল হইবে। কর্ম্ম করিতে গেলেই ইচ্ছার প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট উপদেশ এই যে, কর্ম্ম কর, আমার প্রিয়কর্ম্ম কর। কর্ম্ম সম্পাদনে ধর্ম্ম, কর্ম্ম ত্যাগ ধর্ম্ম নহে।

কর্ম্ম কি? "ক্রিয়তে যৎ তৎ কর্ম্ম।" যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্মের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কর্ম্মকে মোটামোটী তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা (১) উত্তম কর্ম্ম, যেমন পরোপকার, (২) অধম কর্ম্ম, যেমন পরদ্রব্য হরণ; (৩) না-উত্তম না-অধম, যেমন স্নানভোজন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধম কর্ম্মকে কর্ম্ম বলা যায় না। যাহা করা একান্ত দরকার, যাহা না করিলে লোক তিষ্ঠিতে পারে না, যাহা না করিলে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় না, যাহার পরিণাম ফল শুভ, তাহা কর্ম্ম।

তবেই প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের কর্ম্মই কর্ম্ম, দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম্ম বিকর্ম্ম—বিরুদ্ধকর্ম্ম—ইহার ফল অমঙ্গল। প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলা যায়, সুতরাং অনুষ্ঠেয়। দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম্ম, অধর্ম্ম সুতরাং ত্যাজ্য। কর্ম্মের গুরুত্ব লঘুত্ব অনুসারে ধর্ম্ম উচ্চ ও অনুচ্চ। উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মানুষ্ঠানেই মানুষের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব।

শক্তি থাকিলেই ক্রিয়া বা কর্ম্ম থাকিবে। কর্ম্মই শক্তির পরিচায়ক, কর্ম্মই শক্তির পরিমাপক। কার কি রকম, কতটুকু শক্তি আছে, তাহা তার কর্ম্ম দ্বারাই আমরা বুঝিয়া লই। যতক্ষণ জীবদেহে জীবনীশক্তি থাকে, ততক্ষণ তাহার ক্রিয়া আছে। নির্জ্জীবদেহের ক্রিয়া নাই, যেহেতু শক্তি নাই। শক্তিহীনের কর্ম্মে অধিকার নাই, অথবা কর্ম্মে যার অধিকার নাই, সে শক্তিহীন, শ্রীহীন। নির্গুণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, কিন্তু তিনি শক্তিশূন্য নহেন। সেইরূপ, যে কোন জীব নিষ্কর্ম্মা, নিষ্ক্রিয় হইয়াও শক্তিশালী হইতে পারে না কি? একথার উত্তর এই যে, নির্গুণ ব্রহ্ম আমাদের বোধের অগম্য, কর্ম্মহীন জীবও আমাদের বোধাতীত। কর্ম্মানুষ্ঠানে শক্তির বৃদ্ধি, বর্দ্ধিত শক্তিতে কর্ম্মের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি। শক্তি-পূজার এই সারতত্ত্ব আর কৃষ্ণোক্ত কর্ম্মযোগের একই তাৎপর্য্য।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত বিশ্বমানবমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমরা কর্ম্মযোগ বুঝি না, বুঝিয়া পালন করিতে ইচ্ছা করি না। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি, কর্ম্মযোগ এ যুগের ধর্ম্ম নহে, কারণ ইহা বড় কঠিন, ইহার অনুষ্ঠানে পুরুষত্বের আবশ্যক, এইরূপ উপদেশ দিয়া কর্ম্মবিমুখ বাঙালীকে কর্ম্মবিরত রাখিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। পুরুষত্বের প্রয়োজন, অতএব কর্ম্মমার্গ শ্রেয়ঃ নহে; মনুষত্বের স্বাস্থ্যকর বিকাশ হয়, অতএব

কর্ম্মপথে বিচরণ সমীচীন নহে। ইহা কেমন বিসদৃশ, অযৌক্তিক কথা! একেই ত আমরা কর্ত্তব্যের পথে কত কণ্টক, কত সিংহ-ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠি, তার মধ্যে আবার ধর্ম্মগুরুর এই প্রকার ভীতি-প্রদর্শন!

কর্ম্ম বুঝিতে জ্ঞানের প্রয়োজন! অনুষ্ঠাতার বুদ্ধির উপর কর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে। আবার, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভ্রান্ত জ্ঞান ধরা পড়ে। জ্ঞানে কর্ম্মের, কর্ম্মে জ্ঞানের সৌষ্ঠব সম্পাদন হয়। জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সাহায্যে কর্ম্মযোগকে প্রধানরূপে অবলম্বন কর অর্থাৎ সত্যজ্ঞান লাভ কর, প্রেমভক্তির দ্বারা হৃদয়কে অলঙ্কৃত কর, কর্ম্মানুষ্ঠানে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা লাভ করিয়া আমরণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে থাক, ভগবানের এই গভীর উপদেশ পালনে বঙ্গবাসী উদাসীন কেন? ইহার প্রধান কারণ, বাঙালীর চিরপ্রসিদ্ধ অলসতা ও দুর্ব্বলতা। আর একটী কারণ, হিন্দুশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যায় হিন্দু মোহপ্রাপ্ত। পারত্রিকতার দোহাই দিয়া ঐহিক কর্ম্মে উপেক্ষা করা আমাদের স্বভাব। এই উপেক্ষার ভাব আমাদের মজ্জাগত। আবার, বর্ত্তমানে ইহকাল-সর্ব্বস্বতার একটা প্রবল বাতাস হিন্দু সমাজকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ভাবটা উড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু অকর্ম্মণ্য জড়তা অচল ভাবেই আছে। ঐহিকতা বেশ জাগিয়াছে, কিন্তু অচল জড়তার প্রভাবে উহা নীচ স্বার্থপরতায় পরিণত হইয়া নিম্নতার নিম্নস্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! সুতরাং উহা পঙ্কিল, নিষ্ফল। বঙ্গসমাজ "ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ", একূল ওকূল দুই কূলই হারাইতে বসিয়াছে। কর্ম্মোদ্যমের অভাবে পার্থিব ভোগ-সুখে, আধ্যাত্মিকতার অভাবে স্বর্গীয় সুখে বঞ্চিত।

কর্ম্মের অননুষ্ঠানে কর্ম্মোদ্যম ও কর্ম্মশক্তি, ক্রমে ক্রমে লোপ পায়,

অবশেষে সমাজের জীবনীশক্তিও লোপ পাইতে থাকে। তাই বুঝি শক্তি-ভক্ত পিতৃগণ স্বর্গে থাকিয়া বঙ্গবাসীদিগকে উপদেশ দিতেছেন:—বিশ্ব জননী চিন্ময়ী ঐশী শক্তি বিশ্বের আরাধ্যা। এই পার্থিব জীবনের কর্ম্ম সমুদয় সুচারু রূপে সম্পাদন করিয়া তাঁহার শান্তি-সুধা-মাখা কোলে বসিতে পারিলেই তোমরা ধন্য হইতে পারিবে। বিশ্বমাতার প্রধানতম সৃষ্টি মানব জাতি। ইহার উন্নতির জন্য, সুখের জন্য, সমগ্র মানব সমাজে ধর্ম্ম, জ্ঞান, কলাবিদ্যা, দৈহিক বল ও ধনের একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বমাতাকে বুঝিবার জন্য, তাঁহার সৃষ্ট বস্তু সকলকে বুঝিবার জন্য, নিজকে বুঝিবার জন্য, মানুষের মধ্যে তিনি জ্ঞানবৃত্তি দিয়াছেন। তাহারই জ্ঞানশক্তি মনুষ্যসমাজকে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিতেছে। বঙ্গবাসিগণ! তোমরা মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানশক্তি গণেশের এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্ত দৈহিক শক্তি কার্ত্তিকের আরাধনা কর। গণেশের উপাসনা করিতে যাইয়া কার্ত্তিককে ভুলিবে না, কার্ত্তিককে পূজা করিতে যাইয়া গণপতিকে ভুলিবে না। লক্ষ্মীর পূজা করিতে যাইয়া বাগ্দেবীর চরণসেবা করিতে উপেক্ষা করিবে না। প্রকৃত জ্ঞান, প্রভূত ধন, কবিত্ব, সঙ্গীত-সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য ও চারিত্র্য লাভ করিয়া, যাহাতে অপর সভ্য জাতির সমকক্ষ হইতে পার, তাহার জন্য প্রাণান্ত শ্রম ও কর্ম্ম কর। ব্যক্তিবিশেষ সমভাবে সকল দেবতার প্রিয় কার্য্য সাধনে অক্ষম হইতে পারে, কিন্তু সমাজের পক্ষে এইরূপ অক্ষমতা সমাজের অকল্যাণ।

সকল উন্নত সমাজেই শক্তিপূজার সম্যক্ সমাদর দেখা যায়। বর্ত্তমান সভ্যতার আকর ইয়োরোপ ও আমেরিকা শক্তিপূজা করিয়া শক্তিশালী হইয়াছে। ইয়োরোপীয় বা মার্কিন সমাজ মূর্ত্তি গড়িয়া গণেশাদি দেবতার পূজা করে না সত্য; কিন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধন প্রভৃতির উপাসনা করে। উপাসনা করে,—জীবনব্যাপী পুরুষোচিত কর্ম্মের

দ্বারা। শক্তি দ্বারা কর্ম্ম সাধন করে, কর্ম্মের দ্বারা শক্তি লাভ করে। শক্তি লাভ করা ধর্ম্ম, শক্তি লোপ করা অধর্ম্ম। শক্তির উপাসনা ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা সমাজ প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেনা। যে দেবতার আরাধনা করা হয়, সেই দেবতার গুণাবলী নিজের মধ্যে আনিবার জন্য যে একটা প্রশংসনীয় মহতী চেষ্টা, তাহাতে দেবতা প্রসন্ন হন, কিন্তু কর্ম্মহীন অভক্তের ফুল-চন্দনে পূজা দেবতার অগ্রাহ্য।

বঙ্গবাসিগণ! তোমরা ত্রিকালদর্শিনী, ত্রিনয়না অম্বিকার চরণে শরণ লও, তোমাদের জ্ঞান-নেত্র খুলিবে। দশদিক্‌পালিনী দশভুজার চরণে প্রণত হও, তিনি তোমাদের দশ দশায়, দশ হাত দিয়া, দশ দিক্ হইতে রক্ষা করিবেন। ষড়ানন-জননী মহিষমর্দ্দিনীর সেবা কর, তোমাদের ষড়্‌রিপু মর্দ্দিত হইবে, ষড়াননের ন্যায় তোমরা জননীর প্রিয় হইবে। দুর্গা সিংহবাহিনী, তিনি পশুরাজকে অর্থাৎ পূর্ণ পশু-শক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে বশীভূত করিয়া, পদতলে রাখিয়া, তাহার দ্বারা দেবতার কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। তোমরাও তোমাদের পাশব শক্তিকে বশে রাখিতে চেষ্টা কর এবং সংযমিত পাশবশক্তির সাহায্যে সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সাধন কর। তবেই দেবী প্রসন্না হইবেন। মানুষ কেবল মানুষ নহে, পশুও বটে, তাই বলিতেছি, তোমাদের ভিতর যে পশুটা, যে পশুভাবটা আছে, তাহা মায়ের নিকট বলি দাও। মা, এই প্রকার বলিদানে প্রসন্না হইবেন। জ্ঞানবলে বিশ্বমাতাকে চিনিয়া লও; চিনিয়া তাঁহার রাতুল চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দাও। যুগপৎ জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি এই ত্রিনীতির অনুসরণ পূর্ব্বক জগদম্বাকে তুষ্ট কর। বালকের ন্যায় অনন্যমনে, সরল প্রাণে মা মা বলিয়া ডাক। বিপদে পড়িলে মাকে স্মরণ করিও, মা নামে দুঃখ থাকিবে না। সম্পৎকালে মাকে স্মরণ করিও, মা তোমাদের শুভ বুদ্ধি দিবেন।

দুর্গা দেবী মহিষাসুরকে সমরে নিহত করিলে, দেবগণ স্তব করিয়াছিলেন,—

"দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতি মশেষ জন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতি মতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্য দুঃখ-ভয়-হারিণী কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥" চণ্ডী

সঙ্কটে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি স্মরণকারী জীবের ভয় বারণ কর। অনুদ্বিগ্ন জনগণ তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি তাহাদের শুভ বুদ্ধি দাও। তুমি দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-হারিণী। সকল প্রাণীর সকল প্রকার উপকার করিতে তোমা ভিন্ন আর কার চিত্ত সর্ব্বদা দয়ার্দ্র?

দয়াময়ী দুর্গাদেবী সকাম ও নিষ্কাম ভক্তকে সিদ্ধি প্রদান করেন। দেবীর বরে সুরথরাজার রাজ্যভোগবাসনা পূর্ণ এবং সমাধি নামক বৈশ্যের তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইয়াছিল।

যদি কাহারো ধর্ম্মমত মূর্ত্তি পূজার বিরোধী হয়, তবে সমগ্রভাবে মূল শক্তির এবং পৃথক্‌ভাবে জ্ঞানাদি শক্তির মানসপূজা করিতে তার দোষ কি?

বৎসরে তিন দিন মাত্র স্থূলমূর্ত্তি গড়িয়া মহাসমারোহে যে পূজার বিধান আছে, তাহা নিত্য নীরব পূজার স্মরণার্থ ও সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত। বঙ্গবাসিগণ! তোমরা সকলে একপ্রাণ, একচিত্ত, সর্ব্বতোভাবে এক হইয়া, জ্ঞানাদি শক্তি চতুষ্টয়ের আরাধনায় নিযুক্ত থাক। শক্তিজননী জগজ্জননীর উপাসনা কর। বিশ্বমাতা শক্তিরূপিণী ও শক্তিদায়িনী। শক্তি লাভের জন্য তাঁহার চরণে প্রণত হও। তাঁহার প্রসাদে শক্তি লাভ করিয়া কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার উপাসন কর। দেবী আনন্দময়ী। তাঁহার নিকট আনন্দ প্রার্থনা কর। আনন্দময়ীর সন্তান তোমরা আনন্দের অধিকারী।

ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকার খাদ্যের উপরই দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি নির্ভর করে। যতকাল দেহে প্রাণ থাকে, ততকাল বিশুদ্ধ, বলকর অন্নগ্রহণ যেমন দেহরক্ষার পক্ষে আবশ্যক, সেইরূপ আজীবন মনের ও আত্মার সুখাদ্য আত্মসাৎ করিলে উভয়েরই পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে। বঙ্গবাসিগণ! তোমরা এই ত্রিবিধ অন্ন সুজীর্ণ করিয়া শক্তি লাভ কর। বিশ্বজননীর চরণে তোমাদের আত্মা গতিলাভ করুক। ইহাই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

সংসার-চিত্র।

আদ্যাশক্তি পার্ব্বতী এবং গণেশাদি দেবতাদিগকে একপরিবারভুক্ত করিয়া যদি মানবসমাজে আমাদের মধ্যে আনিয়া লই, তবে আমাদের মনে লয়, এরূপ পরিবার বুঝি বড় সুখী।

প্রথিতযশা কবি হর-চরিত্রের উদার গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার যে অতি সুন্দর অনুপম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই সৌন্দর্য্যরস-আস্বাদনে অসমর্থ, কুরুচি সম্পন্ন কোন কোন কবি তাঁহার পুণ্য দেব-চরিত্রে মানবীয় ধর্ম্ম আরোপ করিতে যাইয়া, নিজে কত নীচে নামিয়া-ছিলেন ও তদানীন্তন সমাজের কি যে রুচিবিকার হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে দুঃখ বোধ হয়। হরকোপানলে কাম ভস্মীভূত। যাহার কোমল ফুলবাণে সুরাসুর, নর-কিন্নর, পশু-পক্ষী সকলেই বিদ্ধ হইয়া হিতাহিত জ্ঞান হারায়, সেই কামকে কটাক্ষপাতেই মহাদেব ভস্ম করিলেন। কামকে জয় করিয়া তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করিলেন, সংসারী সাজিলেন। তাঁহার অগণিত ধনরাশি, কুবের কোষাধ্যক্ষ, কিছুরই অভাব নাই, অভাববোধও নাই! ধন আছে, আসক্তি নাই। যক্ষেশ্বরের অনুচরগণ তাঁহারই ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া কত সুখ ভোগ করিতেছে। ইহাতেই তিনি সুখী। তাঁহার ঐশ্বর্য্য পরার্থ। তিনি গৃহী হইয়াও সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহী। কামনা-বিহীন, তথাপি তপস্বী। স্বাস্থ্যকর, তুঙ্গ শৈলনিবাসে সংসারের হট্টকোলাহল হইতে অতি ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করেন। তাঁহার যে কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান, সকলই

লোক শিক্ষার্থে! তাঁহার প্রেম বিশ্ব-জনীন, কামগন্ধবিহীন। তাঁহার নিকট বিষয়রস অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দই অতি আদরের বস্তু। তাহাতেই তিনি বিভোর—উন্মত্ত। শিশুর ন্যায় তাঁহার সরল প্রাণ, চিত্ত প্রশান্ত, ধীর, স্থির। তিনি যোগী হইলেও আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তিনি শক্তিশালী মহাপুরুষ, প্রয়োজন হইলে পুরুষকার প্রদর্শন করিতে কখনও পরাঙ্মুখ নহেন। অন্যায়রূপে পরকৃত ধর্ষণ তাঁহার অসহনীয়। তিনি উপযুক্ত গৃহিণীর হাতে সাংসারিক কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত।

শৈলরাজ-দুহিতা মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিনী। তিনি অটল অচল প্রতিজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য কত কঠোর তপস্যা করিলেন। অবলার এই "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" প্রতিজ্ঞা, ও সেই প্রতিজ্ঞার বলে সিদ্ধি লাভ কেবল বঙ্গনারী কেন, পুরুষেরও অতি বিস্ময়কর। কোন সুমহৎ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তপস্যার প্রয়োজন। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি লাভ হয় না। বিনা তপস্যায়, বিনা সাধনায়, যে লাভ তাহা অকিঞ্চিৎকর, তাহার মূল্য অতি অল্প। পর্ব্বত-রাজ-দুহিতা ইহা মনে করিয়াই বুঝি মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

পার্ব্বতী শৌর্য্যবীর্য্যশালিনী তেজস্বিনী রমণী। ভয় কাহাকে বলে কোনকালেই জানিতেন না। শুম্ভাসুরের দূতকে কুমারী পার্ব্বতী যে প্রতিজ্ঞা জানাইয়াছিলেন, তাহা কেমন তেজস্বিতাপূর্ণ ও আত্মশক্তিতে সম্পূর্ণ নির্ভরাত্মক! তিনি বলিয়াছিলেন—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥" চণ্ডী

অর্থাৎ যিনি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবেন, যিনি আমার বীরদর্প

খর্ব্ব করিতে পারিবেন, যিনি এই পৃথিবীতে আমার সমকক্ষ বীর, তিনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন।

পার্ব্বতী স্বয়ম্বরা। পিতা, অভিমত বরে কন্যার বিবাহ-উৎসব যথারীতি সম্পাদন করিয়া সুখী হইলেন। কেহ কেহ হয়তঃ বলিবেন, শৈলরাজ বড় মূর্খ, গৌরীকে দান করিয়াও গৌরীদানের ফল পাইলেন না। "অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী" শাস্ত্রের এই বচনটা পর্য্যন্ত তাহার জানা নাই।

শুভ পরিণয়ের পর পার্ব্বতী পতিগৃহে যাইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজকন্যা হইয়াও স্বহস্তে স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিতেন, নিজে সুখী হইতেন। হর-পার্ব্বতীর দাম্পত্য প্রেম সুগভীর, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক। পার্ব্বতীর পাতিব্রত্য আদর্শস্থানীয়। পবিত্র দিব্য প্রেম আছে, কামের পূতিগন্ধ নাই। নীরব, অযাচিত আত্মদান আছে, "দেহি-দেহি" রব নাই। হরপার্ব্বতী সম্পূর্ণরূপে একাত্মা, একপ্রাণ! ইঁহারা দুই হইয়াও সর্ব্বতোভাবে এক। এই একত্বের মধ্যেও পার্ব্বতীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সজাগ রহিয়াছে। স্ত্রীস্বত্বের মর্য্যাদা জ্ঞান তাঁহার বিলক্ষণ এবং উহা দলিত, উপেক্ষিত হইতে তিনি কিছুতেই ইচ্ছুক নহেন। বঙ্গনারী যেমন নিজ ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত, এমন কি অধিকারজ্ঞানবর্জ্জিত, পার্ব্বতী সেরূপ নহেন।

পার্ব্বতী বুদ্ধিমতী সহধর্ম্মিণী। কত সময় গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া মহাদেব, ধর্ম্মপত্নীর চিত্ত বিনোদন করিতেন। জ্ঞানগর্ভ মধুর ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে পার্ব্বতীর জ্ঞান ও ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ হইত। এমন জ্ঞানোন্নত ধর্ম্মানুরক্ত সহধর্ম্মিণীর সহবাসে কোন্ ধর্ম্মপ্রাণ পতি [illegible] হন? ইঁহাদের গার্হস্থ্য জীবন নির্ম্মল, সুখময়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু বিবাহের পক্ষপাতী অরসিকগণ শিবের আর একটী বিবাহ করাইয়া কত রসিকতা করিয়াছেন! গঙ্গা পার্ব্বতীর সপত্নী। পার্ব্বতী সপত্নীর

জ্বালায় অস্থির। সপত্নী-কলহে মহাদেবের সোনার সংসারে অশান্তির আগুণ জ্বালাইয়া দিয়া কত রসের সৃষ্টি করিয়াছেন! লোকের কি রুচি! যা' হোক্, গিরিজা সুনিপুণা গৃহিণী, তাঁহার গুণে সংসারে কোনও অভাব নাই। কার্ত্তিক-গণেশ এই গুণবান্ পুত্র দুইটী লইয়া মনের আনন্দে সংসারের অনেক কার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

কার্ত্তিক শক্তিশালা বীর্য্যবান্ পুরুষ। দৈহিক ও মানসিক বলে বলীয়ান্, সুন্দর পুরুষ। এতই সুন্দর যে, বোধ হয় যেন বীর্য্যকান্তি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কার্ত্তিক সাজিয়াছে। কার্ত্তিকের সকলই সুন্দর। কলেবর তেজঃপূর্ণ সুন্দর; চরিত্র সুপবিত্র, সুন্দর। জীবন পরহিতার্থে উৎসর্গীকৃত, কর্ম্মঠ, অথচ সঙ্গীতময়। তিনি কর্ম্মবীর। তাঁহার পরার্থ শক্তি, পরার্থ কর্ম্ম, পরার্থ দেহ, পরার্থ জীবন, প্রতিপরমাণু পরার্থ। তিনি প্রকৃত কামজয়ী বীর। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। এ হেন পুত্ররত্নের জন্মে শিবের বংশ সমুজ্জ্বল। এ হেন পুত্রলাভ করিয়া পার্ব্বতীর মনে কত আনন্দ, কত সুখ। বিলাসী বাঙালী কিন্তু কার্ত্তিককে নিজ রুচি অনুসারে বিলাসী ফুলবাবু বলিয়া বোঝেন এবং সেইরূপ সাজাইতে চাহেন!

গণেশ বেদবেদান্তাদি অশেষ-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, জ্ঞান-গরিমায় অদ্বিতীয়। জ্ঞানের মহিমা প্রচার তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। প্রকৃতি উদার-গম্ভীর। তিনি আত্মতৃপ্ত জ্ঞানবীর, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। পিতার অনুকরণে মহাজ্ঞানী হইয়াও গার্হস্থ্যজীবন যাপন করেন। কার্ত্তিক-গণেশ উভয়েই পিতামাতার পরম ভক্ত, অনুগত। এই পরিবারে—

বিত্ত আছে, বিলাসিতা নাই।
জ্ঞান আছে, গর্ব্ব নাই।

শক্তি আছে, পীড়ন নাই।
কর্ম্ম আছে, স্বার্থ নাই।
ব্যক্তিত্ব আছে, অনৈক্য নাই।
আনন্দ আছে, আবিলতা নাই।

এ হেন পরিবার সুখী পরিবার।

পূজা ও সমাজ।

তৃতীয় খণ্ড।

কি শিখিব ?

আমরা এখানে কি শিখিতে আসিয়াছি ? কি শিখিব ? বিশ্বমানবের এই প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃতিদেবী নীরব ভাষায় বলিবেন—এই বিশ্ব একটি প্রকাণ্ড জীবন্ত বিদ্যালয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমরা মনুষ্যত্ব শিক্ষা করিবে। তোমরা মনুষ্যদেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, মানুষ হইতে শিখিবে। যাও ঐ অভ্রংলিহ, তু[illegible]বেল শৈলরাজের নিকট, কত অমূল্য রত্ন লাভ করিতে পারিবে। ঐ যে কল্লোলিনী কলকলনাদে শ্যামলতটপ্রান্ত চুমিয়া কার্ প্রেমে কোথায় ছুটিয়া যাইতেছে, উহার নিকট কত প্রেমের কথা শিখিতে পারিবে। ঐ যে ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানী, ঐ যে ঊর্দ্ধে মহাব্যোম, ঐ যে নীল ফেনিল মহাসিন্ধু, ঐ রবি-শশী, ঐ তারা, তারা তোমাদি[illegible]দিনরাত কত কি মধুর-গভীর উপদেশ দিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। পর্ব্বত-প্রান্তর, সরিৎ-সমুদ্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর। পর্ব্বতের সহিত প্রেমালিঙ্গন কর, নদীকে ভাল করিয়া চিনিয়া লও, সরোবরের কমলিনী, কুমুদিনী লইয়া খেলা কর, গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ কর। ইহাতে তোমাদের মানসিক বৃত্তির সুন্দর বিকাশ হইবে, দেহ-মন সুস্থ ও প্রফুল্ল থাকিবে। আবার, বহুবিচিত্র মানব সমাজে বৈচিত্রপূর্ণ মানবচরিত্র অধ্যয়ন করিতে থাক, অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। শিশুর অকারণ হাসি-কান্না, খলের খলতা, সাধুর পবিত্রতা, কামিনীহৃদয়ের কমনীয়তা দেখিয়া-শুনিয়া হরষে বিহ্বল ও বিস্ময়ে অভিভূত হইবে। পিপীলিকা হইতে মদমত্তমাতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রাণীর নিকট জ্ঞান অর্জ্জন কর, ধন্য হইতে পারিবে।

মনুষ্যত্ব জিনিষটা কি? আমি ধনী জমিদার, তা হইলেই আমি মানুষ হইলাম না। সুরম্য-সপ্ততল-হর্ম্ম্য-নিবাসী আমি বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিয়া পশুর ন্যায় কেবল ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিতেছি, তোমরা আমাকে মানুষ বলিবে কি? তবেই, মনুষ্যত্ব ধনসম্পদে প্রতিষ্ঠিত নহে। আমি অতি উচ্চবংশে জন্মিয়াছি, আমি কুলীন, তা বলিয়াই কি আমি মানুষ হইলাম? এদিকে কিন্তু, কুলীন হইয়া কুকার্য্যে রত, গঞ্জিকাসেবনে ব্যস্ত! তবেই বলিতে হয়, মনুষ্যত্ব কুলমর্য্যাদামূলক নহে। আমি বিদ্বান্, অনেক বিদ্যা ও উপাধি লাভ করিয়াছি, কিন্তু চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য হারাইয়াছি, চিররুগ্ন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। এ অবস্থায় কে আমাকে মানুষ বলিবে? বস্তুতঃ বিদ্যা ও উপাধির উপর মনুষ্যত্ব নির্ভর করে না। মনুষ্যত্ব জাতিবর্ণগত নহে, দেশকালে সীমাবদ্ধ নহে। তুমি আমি সকলেই মনুষ্যত্বের অধিকারী, ইহা কাহারো একচেটিয়া নহে।

মধুতে মধুরতা না থাকিলে মধুই নয়, অগ্নিতে উত্তাপ না থাকিলে অগ্নির অস্তিত্বই থাকে না। সেইরূপ, মনুষ্য-আকৃতিতে মনুষ্যত্ব না থাকিলে মনুষ্যই নয়। একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডকে অগ্নি বলি, কারণ তাহাতে দগ্ধ করিবার শক্তি আছে। আগুণ নিভিয়া গেলে, ছাই-ভস্ম, অঙ্গার বলি। সেইরূপ, মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা না থাকিলে, সে, ছাই ভস্ম অঙ্গারের মতন একটা হেয়, তুচ্ছ অপদার্থ। সেই কিছুই মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব বলিতে মানুষের শক্তি বা গুণের সমষ্টি বুঝায়। মানুষের দুইভাগ—বাহির ও ভিতর, শরীর ও অন্তর। এই দুই লইয়াই মানুষ, এ দুয়েরই সম্যক্ উন্নতিতে মনুষ্যত্ব। শারীর ও আন্তর শক্তির স্বাস্থ্যকর বিকাশে মনুষ্যত্ব। জ্ঞান, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহের দিব্য স্ফুরণে ও ক্রোধ-লোভাদি অসদ্বৃত্তির দমনে মনুষ্যত্ব।

চরিত্র মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। সত্যানুরাগ, সৎসাহস, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা

ও সততা প্রভৃতি গুণাবলী মানুষের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। চরিত্র মানবের অমূল্য সম্পত্তি। চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণ নির্ধন হইলেও ধনী, ধনী অপেক্ষাও ধনবান্; নিরক্ষর হইলেও জ্ঞানী, জ্ঞানী অপেক্ষাও জ্ঞানবান্। ইঁহারা সমাজের শক্তি, জাতির গৌরব। শক্তিশালী পুরুষেরা নিজের পথ নিজে করিয়া লন এবং অপর সকলকেও সেই পথে টানিয়া আনেন। ইঁহাদের প্রতিকার্য্যেই একটা ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি, প্রখর কর্ত্তব্যজ্ঞান, অদম্য কর্ম্মশক্তি ইঁহাদিগকে মহিমান্বিত করিয়া তোলে। সকল সমাজেই মহতের সংখ্যা অল্প। সুতরাং কেবল মহৎলোক লইয়াই জাতির বলাবল, গুণাগুণ বিচার করা চলে না। সমাজস্থ অধিকাংশ লোকের মধ্যে যে চরিত্র বিদ্যমান, তাহাতেই জাতির উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হইয়া থাকে। বিদ্যা, বুদ্ধি প্রতিভা সকলের সমান থাকে না, কিন্তু সকলেই চরিত্রগঠন করিবার জন্য,—সত্যবান্, ন্যায়নিষ্ঠ, সাধু, সাহসী, ধার্ম্মিক হইবার জন্য চেষ্টা করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। চরিত্রহীনতায় বিদ্যাবুদ্ধি-প্রতিভা সব হীনপ্রভ। চরিত্ররত্ন লাভ করা শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। সকল শিক্ষার সার মনুষ্যত্ব শিক্ষা। শারীরিক, মানসিক বা চরিত্রগত দুর্ব্বলতা মনুষ্যত্বের অন্তরায়। এই সকল দুর্ব্বলতা যার যত কমিতে থাকিবে, তিনি মনুষ্যত্বের দিকে ততই অগ্রসর হইতে পারিবেন।

কি শিখিব ?

শিখিব আমরা দুর্ব্বলতা দূর করিতে। শিখিব আমরা মানুষ হইতে।

গুণের পূজা।

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।"
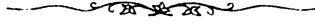
বাগানে যখন গোলাপ, বেল, যুঁই প্রভৃতি নানা রকমের ফুল ফুটিয়া, সৌরভ-সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়া, সহৃদয় দর্শকের ঘ্রাণ তর্পণ ও নয়ন মন বিমোহন করে, সুরসিক সমীরণ আসিয়া চারিদিকে সুখের বার্ত্তা বহন করে, পতঙ্গকুল সংবাদ পাইয়া দূর হইতে উড়িয়া আসে, অলি গুন্ গুন্ রবে মধু আহরণে বসিয়া যায়, তখন কেমন একটা আনন্দের বাজার বসে! কিন্তু গো-গর্দ্দভ, মেষ-মহিষ প্রভৃতি পশু, বাগানে প্রবেশ করিতে পারিলেই ফুল পল্লব সব খাইয়া ফেলে, সৌন্দর্য্য নষ্ট করে। মধুকরের পুষ্পরস পানের ন্যায় সুমানুষের পক্ষেও গুণগ্রহণ স্বাভাবিক। "গুণী গুণং বেত্তি, ন বেত্তি নির্গুণঃ।" গুণীই গুণীর গুণ বোঝে ও আদর করে। গবাদি পশুর ন্যায় নির্গুণ অরসিক ব্যক্তির কাছে গুণের কোন মূল্য নাই, আদর নাই। "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার"।

কবি কবিকে, বীর বীরকে যেমন বোঝে ও আদর করে এমন আর কে পারে? মিথিলার পণ্ডিত-কবি বিদ্যাপতি ও বঙ্গের স্বভাব-কবি চণ্ডিদাস এই দুইজনের মধ্যে মিলনের কেমন একটা প্রাণের

আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল! চুম্বকাকর্ষণের ন্যায় গুণের আকর্ষণে দুজনেই কেমন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণতনয় বীর চন্দ্রকেতু, মহর্ষি বাল্মীকীর আশ্রমে আগত, অজ্ঞাত লবের বীরত্বে কেমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, বীরত্বের মর্য্যাদা কেমন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। ইহা কাব্যের কথা হইলেও গুণীসমাজে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়েই উভয়ের গুণে মুগ্ধ। ইঁহাদের সখ্যভাব কি অকৃত্রিম, কি পবিত্র-মধুর!

আবহমানকাল হইতে সকল স্বস্থ-সভ্য সমাজেই গুণের আদর হইয়া আসিতেছে। গুণের পূজা না থাকিলে মনুষ্যসমাজ পশুর সমাজে পরিণত হইত। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য কেহই অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন না, কেহই লোকপূজা পাইতেন না। মানবসমাজেরও পশুত্ব ঘুচিত না। যাহারা গুণের পক্ষপাতী, তাহারাই ঈদৃশ মহাপুরুষদিগের ভক্ত এবং তাহারাই ইঁহাদের চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকেন।

মানবসমাজ যেমন গুণের নিকট তেমন গুণগ্রাহীর নিকটও অশেষ ঋণে ঋণী।

উদ্যানপ্রিয়, রসজ্ঞ ব্যক্তি যেমন নানা স্থান হইতে নানা সুগন্ধিফুলের গাছ আনাইয়া সযত্নে নিজের বাগানে রোপণ করে, সেইরূপ গুণজ্ঞ মহারাজ বিক্রমাদিত্য, নানা জনপদ, নগর হইতে আহরণ করিয়া নবরত্ন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া, লোক চক্ষুর অন্তরালে কোথায় লুকাইয়া থাকিয়া, এখনও কোন কোন রত্ন আমাদিগকে আলোক বিতরণ করিতেছে। মহামনা আকবর গুণীলোকদিগকে স্বীয় রাজধানীতে সমাদরে আশ্রয় প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। তদীয় সমাজ উপকৃত হইয়াছে। ঈদৃশ গুণগ্রাহী মহানুভব ব্যক্তিগণের নিকট মানবসমাজ বিশেষ উপকৃত।

লোকে গুণেরই পূজা করিয়া থাকে, আধারের পূজা করে না। পুরুষ হউক, স্ত্রী হউক, বালক হউক আর বৃদ্ধই হউক, গুণ থাকিলেই লোকে তাহার সমাদর করে। স্ত্রী বা বালক বলিয়া কেহ অনাদর করে না। "নৈসর্গিকী সুরভিনঃ কুসুমস্য সিদ্ধা, মূর্দ্ধ্নি স্থিতি র্ন চরণৈ রবতাড়নানি"। সুরভিকুসুমকে লোকে স্বভাবতঃই আদর করিয়া মস্তকে ধারণ করে, পদে দলন করে না। রমণী বলিয়া সীতা, গার্গী, ধাত্রী পান্না কি অনাদরণীয়? অভিমন্যু, পুত্ত, ক্যাসাবিয়াঙ্কা (casabianca) বালক বলিয়া কি পূজার অযোগ্য? "তেজসাং হি বয়ঃ সমীক্ষ্যতে"। তেজস্বীর বয়স-বিচার কেহ করে না। যদি কোন ব্যক্তি বা কোন সমাজ ঈদৃশ-গুণী পুরুষ, রমণী বা বালককে অনাদর করে, তবে সেই ব্যক্তি বা সমাজ নিশ্চয়ই মূঢ়, বিকারপ্রাপ্ত। মিত্র-অমিত্র, মানুষ-অমানুষ, চেতন-অচেতন, যার মধ্যে গুণ আছে, বুদ্ধিমান্ সমাজ তারই গুণ বুঝিয়া আদর করে। আদর করিয়া লাভবান্ হয়।

গুণের পূজা করিলে লাভবান্ কে? গুণ বা গুণের স্তাবক? বনে ফুল ফুটিয়া সৌরভ ঢালিয়া দিতেছে, তুমি আদর কর, আর নাই কর, তাতে তার লাভালাভ কি? মাথায় তুলিয়া নিলেও তার লাভ নাই, না নিলেও ক্ষতি নাই! সমুদ্রগর্ভে কত উজ্জ্বল রত্ন আছে, তুমি তাহা আহরণ করিয়া আনিয়া আদর কর, আর নাই কর, তাতে তার লাভ লোকসান কি? লাভ তোমার। ফুলের সুঘ্রাণে তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আহ্লাদ জন্মিবে। রত্ন তোমার আঁধার গৃহকে আলোকিত করিবে। লাভ তোমার। নিষ্কাম, সাধু মহাত্মার মহিমা বুঝিতে পার, মহচ্চরিত্রের পূজা করিতে পার, তোমার চরিত্র উন্নত হইবে, তুমি সুখী হইবে। পূজা না কর, তুমি ঠকিবে। মহাত্মার লাভালাভ নাই। যে সমাজ মহতের পূজা বা গুণীর আদর করে না, সেই সমাজেরই ক্ষতি।

পুণ্যশ্লোক জ্ঞানী, কবি ও কর্ম্মবীরগণ যে জ্ঞান, কাব্য ও চরিত্ররূপ অমূল্য সম্পত্তি ধরাধামে রাখিয়া অমরধামে চলিয়া যান, তাহা দ্বারা লোক-সমাজ চিরকাল উপকৃত হইতে থাকে ও থাকিবে। সমাজ যদি সেই সম্পত্তি ভোগ না করে, তবে সমাজের ক্ষতি।

গুণ বুঝিতে জ্ঞানের, মাথায় তুলিয়া লইতে হৃদয়ের প্রয়োজন। সুগন্ধি ফুল হাতে পাইয়া যদি তার গন্ধ কেহ না পায়, তবে তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দোষ জন্মিয়াছে, বুঝিতে হইবে। গন্ধ পাইয়াও যদি কাহারো হৃদয় প্রফুল্ল না হয়, তবে সে হৃদয়হীন। যে সমাজ গুণীর গুণ বোঝে না, বুঝিয়া আদর করে না, সেই সমাজের নিশ্চয়ই বিকার উপস্থিত হইয়াছে অথবা কিছুর অভাব হইয়াছে। অভাব—জ্ঞানের, অভাব—হৃদয়ের।

পাশ্চাত্যসমাজে গুণের পূজার একটা বিপুল ঘটা হইয়া থাকে। এই বাহ্য আড়ম্বরের বিলক্ষণ উপকারিতা আছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা জর্ম্মনি, যে দেশেই কোন মহাত্মা কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তখনই সমগ্র ইয়োরোপ প্রাণ খুলিয়া তাঁহার সম্মান-সম্বর্দ্ধনা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেয়। সমগ্র মহাদেশ যেন একটা-হৃদয় লইয়া আনন্দে নাচিতে থাকে। ইহাতে সমাজের সজীবতা, বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তা প্রকাশ পায়। আর প্রকাশ পায়—পুরুষত্ব। কারণ, গুণে অনুরাগ পুরুষের একটী লক্ষণ। ব্যক্তি-সকলও গুণী হইবার জন্য উৎসাহান্বিত হয়। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে কোন মহাত্মার আবির্ভাব হইলে, দেশে আদর না পাইয়া তাঁহাকে বিদেশের শরণ লইতে হয়, বিদেশীর মুখপানে তাকাইতে হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যদি তাঁহার প্রশংসা বাহির হইল, তখন আমরাও বলি, হাঁ, ইহার গুণ আছে বটে, নহিলে ঐ সকল দেশ প্রশংসা করিবে কেন? তখন বঙ্গদেশও দুর্ব্বল ক্ষীণকণ্ঠে তাঁহার

একটু স্তবস্তুতি গাহিতে লাগিল, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। সে স্তব-স্তুতিতে প্রাণের আবেগ নাই। হৃদয়হীন বক্তার বক্তৃতার ন্যায় শ্রোতার শ্রুতিমাত্র স্পর্শ করিয়া সেই প্রশংসাধ্বনি আকাশে বিলীন হইয়া যায়। যেন বলিয়া যায়,—হে গুণিন্! এই সমাজ তোমার গুণে মুগ্ধ নহে, তোমার গুণের পূজা করিতে প্রস্তুত নহে। এ দেশ নির্গুণের পূজায় ব্যস্ত। এ হেন দেশে তোমার জন্ম না হইলেই ভাল হইত!

গুণীর উপেক্ষায় সমাজের অমঙ্গল, ততোধিক অমঙ্গল নির্গুণের পূজায়। গুণীর অনাদর ও গুণহীনের সমাদর অস্বাভাবিক হইলেও আমাদের ইহাই যেন স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখানে গুণীর পূজা না হইয়া নির্গুণের পূজা হয়, একথায় সমাজের বড় ক্রোধ ও দুঃখ। সমাজের কথা এই যে, আমরা যেমন গুণীর পূজা করি, এমন আর কোন আধুনিক সভ্যসমাজ করে না। আমরা গুণীর সম্মান করিতে যাইয়া তাঁহার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র, সমস্ত বংশটাকেই পূজা করিয়া থাকি, এমন আর কোন্ দেশে করা হয়? অর্থাৎ যে কুলের মর্য্যাদা করিয়া আসিতেছি, সেই কুল-প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মার বাড়ী কোথায়, তিনি কোন্ কোন্ গুণে মণ্ডিত ছিলেন, কি কারণে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি কিছুই অবগত নহি, তাঁহার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না, জানিবার ইচ্ছাও রাখি না। তাঁহাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু তাঁহার বংশধর অজ্ঞ, অসৎ, দুরাচার হইলেও সেই গুণধরকে আমরা অর্ঘ্য প্রদান করি, কেবল তাহার সেই গুণী পূর্ব্বপুরুষের খাতিরে, কেবল তাঁহার প্রতি ভক্তি দেখাইবার জন্য। এমন কোন্ সমাজে করা হয়?

ইহা সত্যকথা, কিন্তু এইরূপ কুলমর্য্যাদায় সমাজের লাভ কি ক্ষতি?

বিদ্বানের পুত্র মূর্খ, সাঁধুর পুত্র অসাধু, পুণ্যবানের পুত্র পাপী,

সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মূর্খ, পামর পাপীকে সমাদর করিতে কাহারও স্বতঃপ্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু সমাজ যদি বলপূর্ব্বক জনসাধারণকে বলে,—মূর্খতা, দুশ্চরিত্রতা ও পাপকে আদর করিতেই হইবে, এবং সেই সমাজের লোকেরা, সেকালের গুরুমহাশয়ের লগুড়াঘাতের ন্যায় নির্দ্দয় কষাঘাত পৃষ্ঠে পতিত হইবে, এই ভয়ে তথাস্তু বলিয়া সমাজের শাসন মানিয়া চলে, তবে পাপ, মূর্খতা সমাজবক্ষে সগর্ব্বে আস্ফালন করিয়া ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিবে। আর একদিকে নীচকুলোদ্ভব মূর্খের পুত্র বিদ্বান্, অসাধুর পুত্র সাধু হইয়া উঠিলেন; তদীয় বিদ্যাবত্তা, সাধুতা প্রভৃতি গুণে লোকের মন আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া সমাজ যদি চোখ্ রাঙা-ইয়া, তর্জ্জনী হেলাইয়া তর্জ্জনগর্জ্জন করিতে থাকে, আর লোকে পূর্ব্ববৎ ভয়ে ভয়ে তদীয় গুণে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তবে ঐ সদ্গুণাবলী নিরাশ্রয় লতার ন্যায় সঙ্কুচিত, শুষ্ক হইতে থাকে। বংশমর্য্যাদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ক্রমে সমাজ-মধ্যে মূর্খতা, মিথ্যাচার প্রভৃতি দুশ্চরিত্রতা তাণ্ডব-নৃত্য করিতে থাকে; আর পবিত্রতা, সাধুতা শুকাইয়া মরিতে থাকে। কেননা পাপের শাসন নাই, সম্মান আছে। পুণ্যের আদর নাই, লাঞ্ছনা আছে। কিন্তু আশ্রয়-আদর পাইলে লতার ন্যায় গুণাবলী লতাইয়া লতাইয়া কেবল বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কুলীনকুলের অন্যতম আদিপুরুষ বেণীসংহার নাটকের কবি ভট্টনারায়ণ কর্ণের মুখে বলিয়াছেন :--

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যোবা স্তোবা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্॥"

একদিন অশ্বত্থামা ও কর্ণের মধ্যে কলহ বাঁধিয়া গেল। অশ্বত্থামা কর্ণকে সূত, সূতপুত্র, ছোটলোক বলিয়া গালি দিলে, কর্ণ বলিলেন,—

আমি সূত হই আর সূতপুত্রই হই, যে-সে কেন হই না, তাতে কি আসে যায়? উচ্চ বা নীচকুলে জন্মসম্বন্ধে কাহারও কোন হাত নাই, তাহা দৈবাধীন; কিন্তু পৌরুষ-বীর্য্য, যাহা পুরুষের আয়ত্ত, তাহা আমার আছে। আছে কিনা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। সমাজ কি কর্ণের এ কথায় কর্ণপাত করিবেন?

আবার, সমাজ হয়ত একথা বলিয়াও শ্লাঘা করিতে পারেন যে, ধর্ম্মের প্রতি আমাদের কেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি! "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝা বড় কঠিন। ধর্ম্ম বুঝি আর নাই বুঝি, ধার্ম্মিককে চিনিতে পারি আর নাই পারি, যিনিই ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া বাহির হন, তাহারই নিকট আমরা অবনতমস্তক। ভিতরকার খবর জানিবার কি প্রয়োজন? ভিতরে ধর্ম্ম কি অধর্ম্মভাব আছে, তাহার অনুসন্ধান করি না। বাহিরের ধর্ম্মচিহ্নই যথেষ্ট। ইহারই নিকট আমার প্রণত। একথা সত্য। ইহার ফলে সমাজে অধর্ম্ম, ধর্ম্মের পোষাক লইয়া প্রশ্রয় পাইতেছে। এবং কত ধার্ম্মিক অনাদৃত, উপেক্ষিত হইতেছে। হায়! আমরা ভুলিয়া যাই যে,—গুণ নন্দনকাননের ফুল, দেবতার দান। মাথায় তুলিয়া না নিলে অধর্ম্ম-অমঙ্গল হইবে। দেবতা অসন্তুষ্ট হইবেন।

কোন কোন অঞ্চলে এক গাছের নৌকা তৈয়ার হয়। প্রকাণ্ড সারবান্ বৃক্ষ বন হইতে কাটিয়া আনিয়া ভিতরের সারগুলি ফেলিয়া অসার বাকল দিয়া লোকে নৌকা তৈয়ার করে। সাররক্ষা করিলে হয়ত একশত টাকা লাভ হইত, নৌকার মূল্য সম্ভবতঃ দশ টাকামাত্র। এই প্রকার নৌকা নির্ম্মাণ করে যে, সে নিজের অজ্ঞতা বোঝে না, সে যে ঠকে তা বোঝে না। যদি কেহ বুঝাইতে যায়, তবে হয়ত সে রাগ করিবে, না হয় তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে যে, বাকলের নৌকা তৈয়ার করিয়া তার বেশ লাভ হয়। সার লইয়া কি হইবে? হায়! "নির্গুণ

মানুষের তিনগুণ জ্বালা" ! প্রায় সকল বিষয়েই এই প্রকার অসার-গ্রাহিতা ও সারসংহারিতা যে সমাজে বর্ত্তমান, সে সমাজ লাভবান্ বা ক্ষতিগ্রস্ত, বুদ্ধিমান্ কি তদ্বিপরীত, তাহা কে কারে বুঝাইবে ? কারণ নির্গুণ সমাজেরও তিনগুণ জ্বালা !

গুণী গুণকে গুণ বলিয়া আদর করেন, নির্গুণ ব্যক্তি গুণকে দোষ বলিয়া বোঝে। নির্গুণ সমাজে দোষের আদর দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে লোকের গুণগ্রহণশক্তি লোপ পায়। গুণের অনাদরে সমাজ কেবল নির্গুণেরই জন্ম দেয়। পুরুষত্বের উপেক্ষায় সমাজে কেবলই কাপুরুষ জন্মে। তখন শক্তিহীন ব্যক্তিদিগকে লইয়াই সমাজ গঠিত হয়। তখন সমাজে দুর্ব্বলতার পূজা চলিতে থাকে।

শক্তির পূজা না করিয়া দুর্ব্বলতার, গুণের পূজা না করিয়া নির্গুণতার পূজা করিলে, বিশ্বমাতার পূজা করা হয় না। শক্তি বা গুণের পূজাতেই **তাঁহার পূজা**। তিনি "সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।" সকল প্রাণীর মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজ করেন।

কি শিখিব ?

শিখিব আমরা গুণকে বরণ করিতে। শিখিব আমরা গুণীর গলায় মালা দিতে।

চাটুতা।

"অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।"

প্রভাতের নদীবাতনিস্বন, পারাবতের প্রণয়কূজন, তানপুরার তান-বিভব, নুপূরের রুনুঝুনুরব, বুল্‌বুলির কল-কাকলী, প্রেমিককবির কান্ত-পদাবলী-গীতধ্বনি অপেক্ষাও স্নিগ্ধমধুরধ্বনি যদি কেহ শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি একবার লক্ষ্মীর বরপুত্রের ভবনে পদার্পণ করিবেন। যিনি, ভুজঙ্গের বক্রকুটিলমন্থরগমন, চটুলসফরীর উদ্বর্ত্তন, শাখামৃগের উল্লম্ফন, অকারণ অট্টহাসির রোল, আর হরবোলার বোল, যুগপৎ একস্থানে দেখিতে ও শুনিতে চান, তিনি ধনীর ভবনে গমন করিবেন। দেখিবেন,—সেখানে চতুর চাটুকলাবিদ্‌গণ ধনীর শ্রবণবিবরে মনের আনন্দে কত মধুধারা ঢালিয়া দিয়া তাহার প্রাণ-মন কাড়িয়া লইতেছে। স্বর্গের সভায় দেববন্দীগণ দানববিজয়ী দেবরাজকে বুঝি এত আনন্দ দিতে পারে নাই।

মৃদুকোমল হইলেও চাটুতার প্রভাব অপরিসীম। ইহার ঐন্দ্র-জালিকমন্ত্রে কমলার প্রিয়পুত্র, বিষধর সর্পের ন্যায় মুগ্ধ, বিবশ, আত্মহারা। নীচকুলে জন্মলাভ করিয়াও ধনীর তুঙ্গপ্রাসাদে ইহার নিয়ত বসতি। কবির উদ্দাম কল্পনা ও চিত্রকরের কলানৈপুণ্য ইহার নিকট পরাজিত। পৃথিবীর কোন কবি বা চিত্রকর, চাটুচিত্রিত চিত্রের ন্যায় মনোহর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই, পারেন না।

চাটুতা এত সৌভাগ্যশালিনী হইয়াও আত্মগোপন করিতে ব্যাকুল কেন? দুর্ব্বলের এই একটা দুর্ব্বলতা যে, সে লোকের নিকট সবল বলিয়া পরিচিত হইতে চায়। চায়,—কিছুতেই যেন তাহার দুর্ব্বলতা ধরা না পড়ে। এই জন্যই তাহার আত্মগোপনের প্রয়োজন ও ব্যর্থ আয়োজন। গোপনের শত চেষ্টাসত্ত্বেও, উপাস্যদেবতার বন্দনা করিতে গিয়া চাটুকারদলের এই প্রচ্ছন্নভাবটা স্বতঃই যেন ব্যক্ত হইয়া পড়ে—"All is little and low and mean among us." আমাদের মধ্যে কেবলই দীনতা, হীনতা ও নীচতা।

সাংখ্যের প্রকৃতি ও চাটুতা উভয়েই সৃষ্টিকারিণী। বিশেষ এই যে, প্রকৃতি পঙ্গুপুরুষকে স্কন্ধে লইয়া সৃষ্টি করে। চাটুতা নিজে পঙ্গু, ইহার অবলম্ব মিথ্যা, মিথ্যার স্কন্ধে চড়িয়া অদ্ভুত রচনা করে। প্রকৃতির রচনা ভাবকে লইয়া, প্রকৃতকে লইয়া; চাটুতার রচনা অভাবকে লইয়া, অলীককে লইয়া। প্রকৃতির রচনা পরার্থে, চাটুতার রচনা স্বার্থে। গুণহীনের স্বার্থগর্ভ স্তুতিবাদই চাটুতা। গুণীর গুণস্তব চাটুতা নহে। উপাস্যের দোষকে গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা ও প্রশংসা করা চাটুতার স্বভাব। ইহার নিকট শৃগাল সিংহের, মূর্খ পণ্ডিতের, পাপী পুণ্যশীলের প্রশংসা লাভ করে। "মাতর্লক্ষ্মি তবানুকম্পিতজনে দোষা হি বৈ সদ্‌গুণাঃ"। মা লক্ষ্মি! তুমি যারে দয়া কর, তার দোষগুলিও গুণ বলিয়া আদর পায়!

উপাসক ও উপাস্য ইহারা উভয়েই সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট, উভয়েই দুর্ব্বলচিত্ত। নীচতা হইতেই চাটুবাদের উৎপত্তি, এবং নীচতাকে নীচভাবে চরিতার্থ করিতে চাটুতা যেমন সমর্থ, এমন আর কিছুই নহে। সুতরাং চাটুকার যে দুর্ব্বলচিত্ত তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু উপাস্যকে দুর্ব্বল বলা যায় কি? দুর্ব্বল, দুর্ব্বলেরই স্তাবক, ইহা সত্য কি? লোকসমাজে ত

ইহাই দেখা যায় যে, যে নির্ধন, অক্ষম, সে ধন বা পদার্থী হইয়া ধনী, পদস্থ, ক্ষমতাবানের গুণস্তব করে। ধনী বা পদস্থ ব্যক্তিকে ত দীন হীন, নিম্নপদস্থ ব্যক্তির গুণানুবাদ করিতে প্রায়ই দেখা যায় না। সুতরাং ইহা বরং সত্য যে, চাটুতা ক্ষমতার উপাসনা, শক্তিমানের পূজা। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আত্মপ্রশংসা শুনিতে দুর্ব্বলচিত্ত যেমন লালায়িত, সবলচিত্ত তেমন নহে। যাহার যাহা নাই, চাটুতার কাছে সে তাহা পায়, সুতরাং নিগুর্ণ, দুর্ব্বল ব্যক্তি চাটুকারীর শরণ লয়। দুর্ব্বলতা দুর্ব্বলতার দিকেই ধাবিত হয়। চাটুকারী, আশাতিরিক্ত প্রশংসা দান করিতে, দোষে গুণারোপ করিতে প্রতিশ্রুত এবং সেই প্রতিশ্রুতিপালন করিতে কখনও পরাঙ্মুখ নহে। চাটুতার আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা দুর্ব্বলচিত্ত। চাটুতার সাহায্যে উন্নতপদ লাভ করিয়া বা ধনী হইয়া মানুষ চাটুবাক্য শুনিতে ভালবাসিবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে। চাটুপ্রিয় ব্যক্তি নিজে চাটুবিদ্যায় অভ্যস্ত। সে স্বার্থপর। স্বার্থের অনুরোধে যথাকালে তদপেক্ষা উচ্চপদস্থ ও বিত্তবিভবশালীর প্রাঙ্গনে হয়ত চাটুতার অভিনয় করিয়াছে ও করিবে। পক্ষান্তরে অসত্য যাহার আশ্রয়, ছল যাহার সম্বল, ঘৃণিত স্বার্থ যাহার মূলমন্ত্র, দীনতা যাহার সঙ্গিনী, আত্মাবমাননা যাহার ফল, তাহার প্রশ্রয়দান শক্তিমানের কার্য্য নয়। শক্তিশালী লোক শক্তি ও সত্যে সমাদর এবং দৈন্যে ঘৃণা করিয়া থাকেন। তিনি স্বার্থের শত্রু। তিনি কখনও নীচতা বা চাটুতার পৃষ্ঠপোষক হইতে পারেন না। নীচতার পোষকতা করে কে? নীচ মন। শক্তিমানের মন নীচ নহে। শক্তিমানের আত্মাদর জ্ঞান যেমন প্রবল, অন্যের মানরক্ষা করিতেও তিনি সেইরূপ যত্নপর। নিজেরই হউক, বা পরেরই হউক, মানের অবমাননা তাঁহার অসহনীয়। তিনি শক্তির ভক্ত, অশক্তের সহায়। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি, "শক্তের ভক্ত, নরমের যম।" সে

প্রবলের পদতলে গড়াগড়ি আর অতি দুর্ব্বলের গলায় দড়ি দিতে বিলক্ষণ পটু। শক্তিশালী পুরুষ চাটুতার মোহনমন্ত্রে মুগ্ধ নহেন। ইংলণ্ডের রাজা ক্যান্যুট (Canute) এ কথার উজ্জ্বল প্রমাণ।

রাজা ক্যান্যুটের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী পারিষদবর্গ মনোহর চাটুবাক্য বলিয়া তাঁহাকে কেবলই উঁচুতে উঠাইতে চেষ্টা করিত। এমনকি, তাঁহাতে ঐশ্বরিক গুণ ও শক্তি আরোপ করিতে, তাঁহাকে 'জগদীশ্বরো বা', জগদীশ্বর বলিয়া স্তুতি করিতে লজ্জাবোধ করিত না। মহাত্মা ক্যান্যুট হিরণ্যকশিপুর প্রকৃতি পাইলে হয়ত: দৈত্যরাজের ন্যায় মনে করিতেন ও বলিতেন, 'আমিই পরমেশ্বর, আমি থাকিতে আর অন্য পরমেশ্বর কে ? কিন্তু ক্যান্যুট উন্নতমনা রাজা ছিলেন। তিনি চাটুকারদিগের কথায় ভুলিতেন না। তাহাদের ভুল বুঝাইয়া, লজ্জা দিবার জন্য একদিন তিনি সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,—কেমন, সমুদ্র আমার আদেশ মানিবে ? চাটুকারেরা বলিল—নিশ্চয়ই, মহারাজ ! তখন রাজা জলের নিকট আসন নেওয়াইয়া বলিলেন—সমুদ্র ! আমি তোমার প্রভু। আমি আদেশ করিলাম, আমার নিকট আসিও না, সরিয়া যাও। কিন্তু সমুদ্র রাজার আদেশ মানিল না। ঢেউর পর ঢেউ আসিয়া তাঁহার আসন ও চরণ ভিজাইবার উপক্রম করিল। রাজা তখন মোসাহেবদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—দেখ, সমুদ্র আমার হুকুম মানিল না। মানিবে কেন ? তোমরা নিশ্চয় জানিও যে—বারি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য—সমস্তবিশ্ব, এক বিশ্বপতিরই আদেশ মানিয়া চলে, অন্য কাহাকেও গ্রাহ্য করে না।

শক্তিশালী পুরুষ ধনহীন হইতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই দৈন্যগ্রস্ত হইবেন না। শক্তির কাছে দীনতা আসিতে পারে না। "মনস্বী ম্রিয়তে কামং কার্পণ্যং নতু গচ্ছতি"। মনস্বী ব্যক্তি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন, তথাপি কিছুতেই দৈন্য স্বীকার করিবেন না। অনল ভস্মে পরিণত

হইবে, তথাপি শৈত্য প্রাপ্ত হইবে না। খলতা শক্তির কাছে ঘেঁসিতে পারে না। শৃগালের বল নাই, তাই সে ছল-চাতুরী খেলে। সিংহের বল আছে, তাই সে শৃগালের পথে চলে না। খলতা ও ছল দুর্ব্বলের বল। শক্তি ও অশক্তির স্বভাবই এইরূপ। শক্তিমান্ পুরুষ চাটুপ্রিয় নহেন। অন্যের নিকট আত্মগুণানুবাদ শুনিতে তিনি সমুৎসুক নহেন, আবার স্বার্থের খাতিরে দীনবেশে ধনীর দ্বারস্থ হইয়া ধনীর তোষামোদ করিতে ঘৃণা করেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে চাটুতা অক্ষমতারই পূজা। শক্তির পূজা নহে, শক্তিহীনতার পূজা।

নির্ধন সমাজে ধনের মান খুব বেশী। অজ্ঞসমাজেও সেইরূপ বিদ্যার গৌরব অধিক হওয়া উচিত বটে, কিন্তু সেখানেও ধনের আদর অত্যধিক। উভয়ত্রই ধনী বিশেষ সম্মানিত। উভয় সমাজেই এতদ্দেশে পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত ধনে ধনবান্ ব্যক্তি গুণহীন হইয়াও দেবতার পূজা পাইয়া থাকেন। আবার, আধুনিক শিক্ষিত সমাজে পদের গৌরব অতিমাত্র। প্রায় সকলেই পদপ্রার্থী। পদহীন ব্যক্তি পদের জন্য পদস্থ ব্যক্তির, ও নিম্ন-পদস্থ, উর্দ্ধপদের জন্য উচ্চপদস্থের দ্বারে চাটুতার অভিনয় করে। পরের প্রসাদে ধন-উপার্জ্জনকালে, শক্ত প্রতিযোগিতাস্থলে, অশক্ত ব্যক্তিরাই চাটুতার আশ্রয় লয়। সেই জন্যই বোধ হয়, চাটুতার সহিত চাকরির সখ্যভাব দেখা যায়। যাহারা এই বিদ্যায় বিশারদ, তাহারা নিজেকে শারদ-গগনের নক্ষত্র. 'আসমান্-তারা' বলিয়া মনে করিলেও তাহাদের মন উর্দ্ধগামী নহে।

চাটুতা, আরাধ্যদেবতার পাদুকা বহন করিয়া প্রসাদলাভের জন্য কেবলই ব্যস্ত। ইহাকে কেবল স্বর্গেই উঠায়! কিন্তু শনিঠাকুরের মতন এই দেবতার মনটা তরল, অস্থির। মেজাজ—এই নরম, এই গরম। কখন কি মর্জি হয়, বুঝা বড় কঠিন। ইনি ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট।

কাজেই, অনুগ্রহ-জীবীর ক্ষণে স্বর্গসুখ, ক্ষণে নরকভোগ। এই গাঢ়-প্রেমালিঙ্গনসুখ, এই অর্দ্ধচন্দ্রভোগ।

চাটুতার এই সঙ্কটাবস্থা স্মরণ করিয়াই বুঝি কবি বলিয়াছেন,—

"অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।"

অর্থাৎ অস্থিরমতি মানুষের অনুগ্রহের মধ্যেও ভয় আছে। সাবধান! দুঃখের বিষয়, চাটুতা ইহা বুঝিয়াও বোঝে না; সে বড় নির্লজ্জ।

যে সমাজে চাটুতার জয়জয়কার, সেখানে গুণের অনাদর না হইয়া সমাদর হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। সেখানে গুণ, বনজকুসুমের ন্যায়, লোক-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া, বিফলে সৌরভ ঢালিয়া, অন্তস্তাপ লইয়াই যেন ঝরিয়া পড়ে। সেখানে মান-অপমান জ্ঞান নাই; আছে. যেন-তেন প্রকারেণ স্বকার্য্যসাধন।

"অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠকে।
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসশ্চ মূর্খতা॥"

অর্থাৎ অপমানকে সম্মুখে ও মানকে পশ্চাতে রাখিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজকার্য্য উদ্ধার করিবেন। কার্য্যধ্বংসে মূর্খতা। ইহা কাপুরুষের কথা। কিন্তু পুরুষের কথা—'দিব প্রাণ, না দিব মান'। রাণাপ্রতাপ, সর্ব্বস্ব দিতে, প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু কিছুতেই মান দিতে রাজি ছিলেন না।

গুণস্তুতিপরায়ণ মন যদি একশহাত উপরে ওঠে, নির্গুণতার স্তুতি-শীল মন পাঁচশহাত নীচে নামে। নির্গুণের উপাসনা করিয়া২ মানুষের মন কেবলই অধোগামী হইতে থাকে। গুণের উপাসনায়, সর্ব্বগুণাধার ঈশ্বরের আরাধনায়, মন ঊর্দ্ধেই ওঠে। সকাম অপেক্ষা নিষ্কাম উপাসনা

শ্রেষ্ঠ হইলেও ভগবানের নিকট যাজ্ঞা করিয়া মন উপরেই উঠে। চাতক পৃথিবীর আবিল জল চায়না, মেঘের কাছেই "দে জল, দে জল" বলিয়া জল চায় ও নির্ম্মল জল পায়, এবং সরস সঙ্গীতময় জীবন লইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্যই বুঝি গগনে সুস্বর ছড়ায়। গায় আর ঊর্দ্ধে ওঠে, ঊর্দ্ধে উঠে আর গায়,—নির্গুণের পদতলে লুণ্ঠিত, ধূলি-ধূসরিত মস্তক নিরঞ্জনের নীরজ চরণে স্থান পাইবার উপযুক্ত নয়।

কি শিখিব ?—

শিখিব আমরা চাটুতার কর্ণ মর্দ্দন করিতে। শিখিব আমরা নির্গুণের পূজা না-করিতে।

চাকরি।

"প্রণমত্যুন্নতিহেতো র্জীবিতহেতো র্বিমুঞ্চতি প্রাণান্‌।
দুঃখীয়তি সুখহেতোঃ কো মূঢ়ঃ সেবকাদন্যঃ ॥" হিতোপদেশ।

ভৃত্য ভিন্ন আর এমন মূর্খ কে আছে, যে নাকি উন্নতি লাভের জন্য অবনত থাকে, জীবনরক্ষার জন্য জীবন হারায়, এবং সুখের আশায় দুঃখ ভোগ করে ?

অশিক্ষিত দরিদ্রপরিবারে, পুত্র বয়স্ক হইলেই মাতার নিকট শুনিতে পায়,—বাছা আমার চাকরি করিয়া টাকা আনিবে, আমাদের দুঃখ দূর হইবে। ধনী, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত পরিবারেও জননীর আশা,—বাড়ীর অন্যান্য সকলে ভাল ভাল চাকরি করে, কেহ মুন্সেফ, কেহ মহাপেচ, কেহ দারোগা; খোকাও বড় হইয়া অন্ততঃ এইরূপ একটা চাকরি লইয়া বড় বাড়ীর বড় মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিতে পারিবে। কেবল মাতা কেন, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলের মুখেই, ভদ্রাভদ্র ধনী-দরিদ্র সকল পরিবারেই, বালকেরা সর্ব্বদা ঐরূপ কথা শুনিতে পায়। বিদ্যালয়ে যায়, সহাধ্যায়ীর মুখেও ঐ কথাই শুনিতে পায়। এই

ভাবটা বালকদিগের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়া থাকে। বয়স ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া-শুনিয়া এই ভাবটা ক্রমশঃ পাকিয়া উঠে। বালকেরা তখন মনে করে,—চাকরিই জীবনে মহাসুখের অবস্থা। মনে করে—পাশ আর চাকরি জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য।

ক্ষুদ্র প্রাণীর ক্ষুদ্রপ্রাণ, ক্ষুদ্র আশা। পাশের পর চাকরি যা জোটে, তাহা অনেকের ভাগ্যে আশানুরূপ ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্রতার মধ্যে রক্ষিত, বৰ্দ্ধিত বাঙালী ক্ষুদ্রতায়ই সন্তুষ্ট। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বর্ণের, সকল শ্রেণীর লোকই পৈতৃক ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া চাকরির জন্য লালায়িত! ফলতঃ চাকরিই বাঙালীর জাতীয় ব্যবসা হইয়া পড়িয়াছে। যে জাতির জাতীয়ব্যবসায় চাকরি, নিশ্চয়ই সেই জাতি, সকল সভ্যোন্নত জাতির নিকট ঘৃণাস্পদ, অধম।

যে যত বড় চাকরিই করুক না কেন, সে চাকর ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রভুর নিকট সে সর্ব্বদাই ছোট। প্রভু অগ্রগামী সচেতন কায়া, ভৃত্য অনুগামী প্রাণহীন ছায়া। মনস্বিতা থাকিলেও ভৃত্য ক্রমশঃ তাহা হারাইতে বসে। যদি কিছু মনস্বিতা অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা কেবল প্রভুর মন যোগাইবার নিমিত্ত। বিচক্ষণ প্রভু ইক্ষুপেষণের ন্যায় বিলক্ষণ পেষণ করিয়া ভৃত্যের সমস্ত যৌবনের রসটুকু বাহির করিয়া ছাড়িয়া দেয়; ভৃত্যও পিষ্টদেহে, কুব্জপৃষ্ঠে অবশিষ্ট কয়েকটা দিন কোন রকমে কাটাইয়া দেয়। প্রভু অতি দয়ালু, সুমানুষ হইলেও ভৃত্য যে ছোট, এই ভাবটা অলক্ষিতভাবে ভৃত্যের প্রাণের ভিতর ক্রিয়া করিতে থাকে, এবং অবশেষে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে ক্ষুদ্র করিয়া তোলে। নিজে ক্ষুদ্র হইয়া পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রতা আনয়ন করে। সন্তান উত্তরাধিকারী-সূত্রে পিতার মৃত্যুর পরেও ক্ষুদ্রতা, ভীরুতা ও নির্জীবতা প্রাপ্ত হয়।

বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, বিদ্যায় ব্যাস হইলেও ভৃত্যের পদোন্নতি প্রভুর অনুগ্রহ ভিন্ন সম্ভবপর নহে, বুদ্ধিমান্ ভৃত্য ইহা জানে। প্রভুর চিত্তানুবৃত্তি ও মনস্তুষ্টিসাধনই তাহার কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। এই প্রকারে তাহার আত্ম-শক্তি সঙ্কুচিত হইতে থাকে, পরিশেষে আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস, আত্ম-নির্ভরক্ষমতাহ্রাস, পরকীয় ইচ্ছার অধীনতায় স্বীয় ইচ্ছাশক্তির নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতি আসিয়া দেখা দেয়, সাহস লোপ পায়, আত্মমর্য্যাদাবোধ কোথায় চলিয়া যায়। তদবধি ক্লীবতা-দীনতা ও ভীরুতা ভৃত্যের জীবনসঙ্গিনী হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক চালক, কর-চরণাদি চালিত; মস্তিষ্কের স্থান সকলের ঊর্দ্ধে। চৈতন্য চালক, অচেতন চালিত। চৈতন্য, জড় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নেতা ও নীতের এইরূপই সম্বন্ধ। সচেতন প্রাণী অপর কোন সচেতন প্রাণী-কর্তৃক কেবলই পরিচালিত হইতে থাকিলে, তাহার চৈতন্য লুপ্ত হইতে থাকে, অবশেষে সে অচেতন জড়পদার্থে পরিণত হয়। তখন আর সুখ-দুঃখ বোধ থাকে না।

ভৃত্যভাব সকল প্রকার মান-সম্ভ্রম হরণ করে, কিন্তু আমরা মান-সম্ভ্রম লাভ করিবার জন্যই সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেবাধর্ম্মের পক্ষ-পাতী। মানবপ্রভুর সেবা করিতে যাইয়া পরমপ্রভু পরমেশ্বরকে ভুলিয়া যাই! ভগবানের সেবা করিতে অবসর পাই না!

ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া চাকরি করিতে শিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহা দুর্ব্বলতার অপর পৃষ্ঠা। যাহারা জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য প্রয়াসী, তাহাদের চিন্তার কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ, জাতিভেদ আপনা হইতেই উঠিয়া যাইতেছে, ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিই এক জাতিতে পরিণত হইতেছে। ব্রাহ্মণ চাকরি করেন, তাঁহাকে কি বলিব?—চাকর। বৈদ্য বা কায়স্থ চাকরি করেন, তিনি কি?—চাকর।

সকল চাকরেরই সাধারণ নাম চাকর। সকলেই একই শ্রেণীভুক্ত। চাকরের জাত্যভিমান চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ণবিচার হয় না; হয় কর্ম্মবিচার।

চাকরির কি সুখ, ভুক্তভোগী যে আদৌ বোঝেন না তা নয়, কিন্তু কি মোহ যে, চাকরির মায়া তিনি ত্যাগ করিতে পারেন না। বরং ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে চাকর তৈয়ার করিবার জন্য, চাকরি দিবার জন্য, তিনি যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটী করেন না। ইহা মহামায়ার মায়া। মা ভগবতি! আমাদিগকে হেন বল দেও, যেন তোমার মায়াপাশ ছেদন করিতে পারি!

কি শিখিব?

শিখিব আমরা জীবনের মূল্য বুঝিতে। শিক্ষিব আমরা 'কাচমূল্যে কাঞ্চন' না-বেচিতে।

ভীরুতা

ও

সাহস।

অব্যবসায়িন মলসং দৈবপরং সাহসাচ্চ পরিহীনম্।
.........................নেচ্ছত্যুপগূহিতুং লক্ষ্মীঃ ॥

হিতোপদেশ

ক্ষুদ্র, ইতর প্রাণীর নিকটও আমরা অনেক অমূল্য উপদেশ লাভ করিতে পারি। অলসজীবন কত কদর্য্য, ঘৃণিত, তাহা আমেরিকার শ্লথ (Sloth) নামক জন্তুর চরিত্রে বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। সেইরূপ, ভীরুর জীবন, অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর হইলেও জগৎকে এই শিক্ষা দেয় যে, জয়শ্রী সাহসীকেই বরণ করে, ভীরুকে বরণ করে না।

আমরা পিপীলিকার নিকট সাহসের উপদেশলাভ করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিয়া, কৃতার্থ হইতে পারি। পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্রকায় লইয়া বলশালী। শরীরের চতুর্গুণ আয়তন, দশগুণ ভারী, একটা অন্ন বহন

করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে কত যত্ন, কত শ্রম করে, ভাবিলে বিস্ময় জন্মে। এই ক্ষুদ্রদেহে এত বল কে দিল? উত্তর,—সাহস। আবার, কত পিপীলিকা দল বাঁধিয়া তাহার সাহায্যের জন্য কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহারা প্রাণপাত করিবে, তথাপি আরব্ধ কার্য্য ছাড়িবে না। কোন কোন অঞ্চলে প্রাচীনারা এখনও দুধে চিনি দিবার সময়, পিপ্ড়ে থাকিলে বালকদিগকে বলিয়া থাকেন,—খাও, পিপ্ড়ে খাইলে বল হবে, সাঁতার শিখ্বে। একথার অর্থ এই যে, তোমরা সকলে পিপীলিকার ন্যায় সাহসী হও; পিপীলিকার সাহসে বুক বাঁধিয়া সংসার-সমুদ্রে সাঁতার দিতে শিখ; শত তরঙ্গাঘাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অধ্যবসায় ও সাহসের বলে সাঁতার দেও, কূল পাইবে।

সাহসে দেহ ও মনে বল আসে, ভীরুতা বল হরণ করে। তরুণ যুবক ফরিদ—যিনি উত্তরকালে সেরশাহ উপাধি লইয়া দিল্লীর বাদশাহ হইয়াছিলেন—সেই ফরিদ দ্বিতীয় যমস্বরূপ, ভীমকায় ব্যাঘ্রের নিকট যাইয়া তাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া বধ করিয়াছিলেন। ইহাতে ফরিদের শারীরিক বিশেষতঃ মানসিক বলের কেমন পরিচয় পাওয়া যায়! মামুদশার সৈন্যদলের মধ্যে প্রবীণ বীরপুরুষেরা কেহই বাঘের কাছে যাইতে সাহস পায় নাই। ইহাদের চেয়ে ফরিদের শরীরে বল বেশী না থাকিলেও মনের বল নিশ্চয় বেশী ছিল। বাঘ জাগিয়া যখন ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তখন দূর হইতে কত লোক ভয়ে প্রাণ লইয়া পলাইল। ফরিদ কিন্তু নির্ভয়ে তরবারীদ্বারা বাঘের প্রাণ বিনাশ করিলেন, জিহ্বা কাটিয়া আনিলেন।

"বনের বাঘে খায় না, কিন্তু মনের বাঘে খায়।" বনের বাঘে আর কয় জনকে খায়? বনে বাঘের সহিত দেখা সাক্ষাৎ অনেকেরই হয় না। কিন্তু মনের বাঘেই অনেককে খাইয়া ফেলে, অনেকের সর্ব্বনাশ করে।

'রোগোন্মাদ' (Hypochondria) রোগী কেমন বিভীষিকা দেখে! এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি কল্পিত রোগ লইয়া কত অশান্তি ভোগ করে। রোগ নাই, তবু রোগের জ্বালায় অস্থির। 'রোগোন্মাদ'এর ন্যায় ভীরুতাও রোগবিশেষ। ভীরু মনে মনে অলীক ভয় কল্পনা করে। জীবন-পথে হাঁটিতে কেবল বাঘ-সাপ দেখিয়া মূর্চ্ছা যায়। মনের বাঘ-সাপ তাড়াইতে না পারিলে রোগ প্রতীকারের আশা অল্প।

ফরিদের ন্যায়, অষ্টাদশবর্ষীয় বালক জগদীশ—যিনি পরবর্ত্তীকালে তর্কালঙ্কার-উপাধি-ভূষিত, অতি শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত হইয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন—সেই বালক জগদীশ প্রকাণ্ড বিষধর সর্প মারিয়া নিজেকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্যকালে জগদীশ বড় দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার পাখী-ধরা রোগ ছিল। তিনি একদিন পাখীর বাসা দেখিয়া একটা প্রকাণ্ড তালবৃক্ষে উঠিলেন। যাই পাখীর বাসায় হাত দিয়াছেন, অমনি একটা ভয়ঙ্কর সর্প দংশন করিতে উদ্যত হইল। জগদীশ সাপের মুখ হাত দিয়া শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিলেন। সর্প লেজ দিয়া তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিল, জগদীশ তালপাতা দিয়া সাপটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। জগদীশ প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন, কেবল সাহসের বলে। সাহসের কাছে বাঘ-সাপ কিছুই নয়।

ভীরুতা মানসিক দুর্ব্বলতা বই আর কিছুই নহে। দুর্ব্বলতা বোধ হইতেই ইহার জন্ম। মানুষ, বাঘ দেখিলে ভয় পায়। কেন? কারণ, সে জানে বাঘ তাহার অপেক্ষা বলবান্, বাঘের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু, যদি তাহার এরূপ ধ্রুব বিশ্বাস থাকে যে, বাঘ তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, নিজের এমন শক্তি আছে যে, বাঘের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে, তবে সে বাঘকে ভয় করিবে না। ফলতঃ, আত্মশক্তির অভাববোধই

ভয়ের কারণ। ভীরুতা আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। শক্তিরূপিণী বিশ্বজননী ভীরুর অন্তরেও শক্তির বীজই দিয়াছেন, ভীরুতার বীজ দেন নাই। তবে ভীরুতা আসে কোথা হইতে? জাতীয় ভীরুতার জন্য কেবল সমাজ দায়ী। সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষা দায়ী। ভীরু, ভীরুতা ভিন্ন সাহস শিক্ষা দিতে পারে না। বঙ্গীয় শিশু, জন্মিয়াই কত জুজুর ভয়, ভূতের ভয় শিখিতে থাকে। ঘুমপাড়ানি মন্ত্রেও*, শিশু ভয়ের কথাই শুনে, ভয়ে ভয়ে চোখ মুদিয়া থাকে, এবং নিদ্রাবস্থায়ও মাঝে মাঝে আতঙ্কে চমকিয়া উঠে। এই প্রকারে ভয়ের শিক্ষা শিশুর স্বভাব হয়। ভীরুসমাজে মানুষ আশৈশব সৎসাহসের পরিবর্ত্তে কেবলই ভয় শিক্ষা করে, উত্তরকালে তাহাই দৃঢ়মূল স্বভাবে পরিণত হয়। বাল্যে কি যৌবনে, গৃহে কি কর্ম্মক্ষেত্রে, ভিতরে কি বাহিরে, কখনও কোথাও যদি কেহ সাহসের শিক্ষা, সাহসের দৃষ্টান্ত না পায়, তবে সে ভীরু ভিন্ন সাহসী হইতে পারে না।

শক্তির অভাব বা অক্ষমতাবোধ সর্ব্বপ্রকার ভয়ের হেতু। এই মূলকারণের মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে কোন জাতির জাতীয় ভীরুতা নির্ম্মূল হইতে পারে না। শৈশবাবধি শিশুর মনে যাহাতে ভয় না আসিয়া, পুরুষোচিত সাহস জন্মিতে পারে, প্রতি পরিবারে এরূপ শিক্ষাদান একান্ত আবশ্যক। সরল সত্যকথা বলিতে নির্ভীকতা, পাপপ্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে সৎসাহস, ন্যায়ের কণ্টকময় পথে চলিতে উৎসাহ ও অধ্যবসায় শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক জনক-জননীর কর্ত্তব্য। মৌখিক বা পুস্তকের লিখিত উপদেশ অপেক্ষা সৎসাহসের দৃষ্টান্ত বহুফলপ্রদ।

---

* "ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে।
বুল্‌বুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্গসমাজে দৃষ্টান্তের অত্যন্ত অসদ্ভাব। সমাজের সর্ব্বত্রই যেন একটা ভয়ানকরসপ্রধান নাটকের নিত্য অভিনয় চলিতেছে! অভিনেতৃগণ রঙ্গমঞ্চে আসিয়া ভয়ের অভিনয় করিয়া থাকেন, দর্শকগণ স্থায়ীভাব ভয়কে লইয়া একপ্রকার আনন্দ অনুভব করেন। গ্রামে, নগরে, প্রতি পরিবারে, দিবাযামিনী যে যে নাট্যাঙ্ক অভিনীত হইয়া থাকে, তাহার প্রতিপৃষ্ঠা ভয়ানকরসপূর্ণ। এ অবস্থায় ভীরুতা ভিন্ন সাহস শিক্ষা করা অনেকের পক্ষেই একপ্রকার অসম্ভব। পিতামাতা প্রভৃতি গুরু-জনেরা সাহসী না হইলে কি প্রকারে সন্তানদিগকে সাহসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন? দৃষ্টান্তের বৈপরীত্যে বা অভাবে উপদেশ নিষ্ফল। ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্ষপীর বলিয়াছেন,—"Cowards die many times before their deaths". না মরিতে মরে ভীরু কত শতবার। তিনি আরও বলিয়াছেন,—"It seems to me most strange that men should fear". ইহা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, পুরুষ, পুরুষ হইয়া ভয় পায়। ছাত্রগণ এই সকল উপাদেয় উক্তি অতি আগ্রহসহকারে কণ্ঠস্থ করে, চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে, কিন্তু ভীরুত্ব দূর করিতে ইচ্ছা করে না, পারে না। আবার—

> "ঈর্ষী ঘৃণীত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
> পরভাগ্যোপজীবী চ যড়েতে দুঃখভাগিনঃ॥"

ঈর্ষাবান্, দয়াশীল, অসন্তুষ্ট, কোপনস্বভাব, নিত্যশঙ্কিত (ভীরু), এবং পরভাগ্যজীবী এই ছয় ব্যক্তি দুঃখভাগী। এই শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া কয়জন ভীরু ভীরুত্বাপবাদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন? "No arguments will give courage to the coward" কোন উপদেশ, যুক্তি-তর্ক ভীরুকে সাহস দিতে পারে না।

ভীরুতার কি উপহাসাস্পদ দৈন্য এবং সাহসের কি আশ্চর্য্য মহিমা, তাহা উত্তর-গোগৃহে কৌরব-কবল হইতে গোধনরক্ষার্থী উত্তর অর্জ্জুনের চরিত্রে কেমন সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। উত্তর,—মূর্ত্তিমতী ভীরুতা; অর্জ্জুন মূর্ত্তিমান্ সাহস। মহারথ-ভীষ্ম-দ্রোণ-পরিচালিত বিপুল কৌরববাহিনী এক অর্জ্জুনের নিকটে পরাজিত। ইহার কারণ, অর্জ্জুনের দুর্জ্জয় সাহস ও তজ্জনিত অলঙ্ঘ্য, অমিত বল। ইহা জানিয়াই অক্ষক্রীড়ারত যুধিষ্ঠির উত্তর-জনক বিরাটরাজকে আশ্বাস দিয়াছিলেন,—"বৃহন্নলা সারথির্যস্য কুতস্তস্য পরাভবঃ।" বৃহন্নলা যার সারথী, তার পরাভব কোথায়? বৃহন্নলানামধারী অর্জ্জুন যাহার সহায়, তাহার পরাভব অসম্ভব। যুধিষ্ঠিরের এই প্রবোধবাক্য যেন আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। প্রতিধ্বনি যেন বলিতেছে,—সাহস যাহার সারথী, সংসার-সমরে সেই রথীর পরাভব নাই।

মানবের পক্ষে এই সংসার একটী বিপুল বিস্তীর্ণ সমরপ্রাঙ্গন। এখানে কি ধর্ম্মে, কি দর্শন-বিজ্ঞানে, কি সংস্কারকার্য্যে, কি সাহিত্যে, কি দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে, সর্ব্বত্রই সাহসের প্রয়োজন। সর্ব্বত্রই সাহসের জয়, ভীরুতার পরাজয়।

প্রকৃত সাহসী মহাত্মারা কাহাকেও ভয় করেন না, না সমাজকে না যমকে। প্রাচীন গ্রীশদেশে লোকহিতৈষী, জিতেন্দ্রিয় সক্রেটিস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, স্বদেশবাসী যুবকদিগকে সংশিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার অপরাধে। ইচ্ছা করিলে তিনি পলাইয়া গিয়া নিজেকে বাঁচাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া অকাতরে, অম্লানবদনে দণ্ড-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যম ও যমস্বরূপ সমাজকে ভয় না করিয়া এই প্রকারে মরিয়াই অমর হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও বৃদ্ধকালে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, 'পৃথিবী ঘোরে' এই তত্ত্ব আবিষ্কারের অপরাধে।

মহাপ্রাণ যিশু ধর্ম্মের জন্য, সরলসত্য প্রচারের জন্য প্রাণ দিয়া লোকের প্রাণসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে অদ্যাপি যথার্থ খৃষ্টান্, সত্যের জন্য প্রাণপাত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। ধর্ম্মসংস্কার করিতে যাইয়া জর্ম্মেণির মার্টিন লুথারকে কত নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশে এই প্রকারে কত মনীষী-মহাত্মা সত্য ও ন্যায়ের জন্য সঙ্কীর্ণ, অনুদারনীতিক সমাজের নিকট কত নিষ্ঠুর, অমানুষিক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের জীবনবৃত্তে বিবৃত আছে।

তত্তৎকালীন য়ুরোপ-সমাজের ঘোরতর নৃশংসতা স্মরণ করিলে মনে যুগপৎ বিষাদ ও হর্ষের উদয় হয়। বিষাদ—অন্যায় নির্যাতনে, হর্ষ—ন্যায়ের জয়দর্শনে। যেমন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইল, অমনি সমাজ বদ্ধকক্ষ হইয়া সমগ্র বলপ্রয়োগপূর্ব্বক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। আবিষ্কর্ত্তাও পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তি, বজ্রদণ্ড, বজ্রাদপি দৃঢ়তর মস্তকে বহন করিতে পর্ব্বতের ন্যায় অচল-অটল। একদিকে সমাজ, অন্য দিকে মহাত্মা একক। একদিকে সেই কৌরব সেনা, অন্য দিকে মহাবীর অর্জ্জুন একা। কিন্তু, 'সত্যমেব জয়তে'। অবশেষে সত্যেরই জয়। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।" সমাজ অন্যায়রূপে নিপীড়ন করিয়াই মহাত্মাদিগের মহিমা শত গুণে উজ্জ্বল করিত, চরিত্রের বল সহস্র গুণে বাড়াইয়া তুলিত। ঈদৃশ নির্ভীক মনস্বীগণের অলোকসামান্য সাধুদৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য-সমাজের প্রাণের ভিতর তাড়িত সঞ্চার করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু ভারতে যিশুর ন্যায় বুদ্ধের প্রাণ দিতে হয় নাই। ভারত-সমাজ প্রাণ নিতে চায় নাই। তথাপি বুদ্ধের নির্ভীকতা সামান্য নহে। বুদ্ধের সময়ে বেদের প্রভাব অপ্রতিহত। ঈশ্বরকে অমান্য করিলেও সমাজের কাছে যে কেহ নিস্তার পাইত, কিন্তু বেদকে মান্য না করিলে তাহার অব্যাহতি ছিল না। মহর্ষি কপিল, 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ', ঈশ্বরের অস্তিত্বে

প্রমাণাভাব, একথা বলিয়াও কেবল বেদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই লোকমান্য হইয়াছেন। তাঁহার দর্শন আস্তিকদর্শনের মধ্যে পরিগণিত হইয়া সমাজে সমাদৃত। এ অবস্থায় বুদ্ধ যে বেদকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। জয়দেব কবি গাহিয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধে রহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্॥"

হে অমিতাভ! তুমি সদয়হৃদয়ে পশুবলির দোষ দেখাইয়া দিয়া যজ্ঞবিধানাত্মক শ্রুতিসমূহের নিন্দা করিয়াছ। সেই সময়ে বেদনিন্দা নিঃসন্দেহ অসামান্য সাহসের পরিচায়ক।

লুথারের ন্যায়, চৈতন্য নিগ্রহ ভোগ করেন নাই সত্য, কিন্তু চৈতন্যের সাহস বাস্তবিক দুর্লভ। যে হাড়ি-ডোম-চণ্ডালের ছায়াস্পর্শে উচ্চবর্ণের হিন্দুর পাপ-স্পর্শ হয়, আভিজাত্য নষ্ট হয়, তাহাদিগকে নিমাইপণ্ডিত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রেমালিঙ্গন দিয়া, এক সঙ্গে আহার-বিহার করিয়া আপ্যায়িত করিতেন। এই প্রকারে যিনি দৃঢ়মূল আভিজাত্যের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, তাঁহার সাহসের বল কত! ঈদৃশ মহাপুরুষগণ লোকমঙ্গলার্থ যে অলোকসামান্য বীরত্ব ও ধীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার তুলনায় দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর প্রভৃতি যোদ্ধৃগণের স্বার্থ-প্রণোদিত, নরশোণিতলোলুপ, ক্ষুধিত-অতৃপ্ত শূরত্ব অকিঞ্চিৎকর।

আবার, গ্যালিলিওর ন্যায় নব্যন্যায়ের আদিগুরু রঘুনাথ শিরোমণিকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই বটে, কিন্তু তিনি যে সাহস দেখাইয়াছেন, তাহাও সামান্য নহে। মহর্ষি কণাদ, 'বিশেষ' একটী পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, সেই জন্যই তৎপ্রণীত দর্শন বৈশেষিক দর্শন

নামে অভিহিত। তার্কিকশিরোমণি সেই 'বিশেষ' ও মহর্ষির স্বীকৃত আরও কয়েকটী পদার্থ অগ্রাহ্য করিয়া নূতন কয়েকটী পদার্থ মানিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

অর্থানাং যুক্তিসিদ্ধানাং মদুক্তানাং প্রযত্নতঃ।
সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্ত বিরোধো নৈব দূষণম্ ॥"

মদুক্ত পদার্থসকল, সকলদর্শনবিরুদ্ধ হয় হউক, যুক্তিসিদ্ধ হইলে অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

তাঁহার কথার তাৎপর্য্য এই যে, ঋষিপ্রণীত হইলেই যে শাস্ত্র অভ্রান্ত হইবে, এমন কথা হইতে পারে না। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"। মুনিঋষিদেরও ভুল হইতে পারে। শাস্ত্রের ভ্রম থাকিলে তাহা অবশ্যই বিচারপূর্ব্বক সংশোধন করা আবশ্যক। শাস্ত্রের ভ্রান্তমত জনসমাজে প্রচলিত হইতে থাকিলে অকল্যাণই হইয়া থাকে। এরূপ কথা বলিতে কত সাহসের প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাতে তাঁহার মৌলিক, স্বাধীন চিন্তায় কেমন একটা নিশ্চিন্ত সাহস প্রকাশ পাইয়াছে! এখানেও সাহসের জয়। বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠকগণ ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের ধার না ধারিয়াও, 'শিরোমণি' ও তাহার টীকা-টিপ্পনী পড়িয়াই পণ্ডিত হইয়াছেন, অদ্যাপি হইতেছেন।

আবার, বঙ্গীয়কাব্যে যে নূতন ভাব, ভাষা ও ছন্দ মাইকেল কবি আনিয়াছেন, তাহাতে কবির আত্মশক্তিতে বিশ্বাস সহকৃত সাহসেরই নিদর্শন পাওয়া যায়।

ক্লাইব-চরিত্রের প্রধান উপকরণ আবাল্য অদম্য সাহস। দরিদ্র কৃষকবালক গার্ফিল্ড যৌবনে যে জয়শ্রীমণ্ডিত হইয়া মার্কিন যুক্তরাজ্যের সর্ব্বোচ্চপদে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ অক্লান্ত অধ্যবসায় ও সাহস।

এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক দেশে যুগে যুগে সাহসীরাই যুগপ্রবর্ত্তক, ভীরুরা নহে। বস্তুতঃ সাহসের নিকট মানব-সভ্যতা বহু পরিমাণে ঋণী।

পূর্ব্বে যে সকল মনস্বীর কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের মত প্রতিভা সকলের নাই, সেই প্রকার বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ সকলের ঘটে না সত্য, কিন্তু সকলেই দৈনিক কার্য্যে, লোক-ব্যবহারে, কার্‌কারবারে, নিজ নিজ পরিবারে সংসাহস দেখাইতে পারেন। আমরা হয়ত জানি ইহা ভাল, উহা মন্দ; কিন্তু ভালকে গ্রহণ করিতে ও মন্দকে ত্যাগ করিতে সাহস পাই না। কর্ত্তব্য কি হয়ত তাহা বুঝি, কিন্তু করিবার সাহস নাই। সত্য বলিতে ইচ্ছা আছে, কিন্তু ভয় আসিয়া বাধা দেয়। ভয়ে-ভয়ে কর্ত্তব্যের স্থলে অকর্ত্তব্য করি, সত্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যা বলি। এই প্রকারে পৃথিবীর অনেক পাপ ভীরুতা প্রসব করিয়া থাকে। চোরের ন্যায় ভীরুর কার্য্য গোপনে, আঁধারে। কারণ, সর্ব্বদাই ভীরুর নিঠুর 'হিয়া কাঁপে দুরু দুরু'। ঘরের বাহির হইয়া কাজ করিতে হইলেই তাহার প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে। সাহসীর কার্য্য স্পষ্ট দিবালোকে, প্রকাশ্যে। তাহার বুক সাতশ বুরুল পুরু। ভীরুতা—অন্ধকূপগর্ভস্থ শৈবাল; সাহস—মানস-সরোবরের প্রফুল্লকমল। ভীরুতা—শকুনির কপট পাশা; সাহস—অর্জ্জুনের জয়শীল গাণ্ডীব। ভীরুতা—মলিনশয্যার মৎকুণ; সাহস—মহারণ্যের মহাসিংহ।

দুর্ব্বল সমাজ সকল প্রকার দুর্ব্বলতাকে সযত্নে পোষণ করে, এবং কর্ত্তব্যের পথে কৃত্রিম বাধা জন্মাইয়া থাকে; অধর্ম্মকে ধর্ম্মের পোষাকে সাজাইয়া গৌরব প্রকাশ করে। এ হেন সমাজে অশাস্ত্র, শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া বসে।

সমাজের ছদ্মবেশী পাপ সকল দূর করিতে বহুবল ও সংসাহসের

প্রয়োজন। শুভ, মহৎ অনুষ্ঠানে দুর্ব্বল সমাজ কেবল উপেক্ষা নয়, নানা প্রকার দুর্ব্বল শাসন-ভয় দেখাইয়া বিঘ্ন জন্মায়। তাহা পায়ে ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে নির্ভীকতার প্রয়োজন।

যাহার অধ্যবসায় নাই, সাহস নাই, যে অলস দৈবপর, তাহার কাছে লক্ষ্মী আসেন না, সে লক্ষ্মীছাড়া। এ কথা হিতোপদেশকার বলিয়াছেন। ইংলণ্ডের ম্যাকে সাহেবের কবিতায় ইহারই দীর্ঘ প্রতিধ্বনি শুনা যায়।

"If thou canst plan a noble deed,
And never flag till it succeed,
Though in the strife thy heart should bleed,
Whatever obstacles control,
Thine hour will come,—go on, true soul!
Thou' lt win the prize, thou' lt reach the goal."

যদি কোন মহান্, উদার সঙ্কল্প লইয়া আফলোদয় কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর থাক, কখনও পশ্চাৎপদ না হও, যে কোন বাধাবিপত্তিই উপস্থিত হউক না কেন, হৃদয়ের শোণিতপাত করিয়াও যদি সেই বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে পার, তবে নিশ্চয়ই তোমার সুসময় আসিবে। অতএব বলিতেছি, একচিত্ত, একনিষ্ঠ হইয়া, সাহসে ভর করিয়া আরব্ধ কর্ম্ম করিতে থাক, কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

ভীরু কিন্তু এসব কথায়, সাহসের কথায় একেবারে বধির।

ভীরু বাঙালী বলিয়া আমাদের একটা চিরদিনের কলঙ্ক আছে। অন্যে যদি আমাদিগকে ভীরু বলে, তবে আমরা গালি মনে করি। "আপ্না কথা আপ্নে কই, পরে কৈলে বেজার হই" নিজের দোষ

অন্যে বলিলে রাগ হইতে পারে, কিন্তু নিজের দোষ নিজে দেখিলে, নিজ দোষের কথা নিজে বলিলে, উপকার দর্শিতে পারে।

ভীরুতা কর্ত্তব্যের মহা কণ্টক, মনের মহাব্যাধি, মনুষ্যত্বের মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন। ভীরু, মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়। অন্যান্য অনেক গুণ থাকিলেও একমাত্র সৎসাহসের অভাবে মানুষ, মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ে। আমরা যদি মানুষ হইতে চাই, তবে এই কণ্টক দূর করিতে হইবে, এই মহাব্যাধির প্রতিকার করিতে হইবে। কিন্তু কোনও ঔষধ আছে কি? রোগ মাত্রেরই ঔষধ আছে, চিকিৎসা আছে। ভীরুতা-রোগ দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। প্রতীকারের কথা পূর্ব্বেই একপ্রকার বলা হইয়াছে; এখন সংক্ষেপে আরও দুই একটী কথা বলিতেছি। আগে বুঝিতে হইবে, আমরা ভীরু কি না। ভীরু নই, একথা বলিলে আত্মবঞ্চনা করা হইবে। বুঝিয়া, ভীরুতা দূর করিবার ইচ্ছা জন্মাইতে হইবে। ইচ্ছার অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই। বলের অভাবে, বিনা কারণেও মনে ভয় আসে। শরীরের ও মনের বলবৃদ্ধি হইলে ভীরুতা আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। বলের জন্য গৃহীমাত্রেরই সংযম শিক্ষা করা ও সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

ভয়কে জয় করিবার জন্য ভক্ত রামপ্রসাদের ভাব লইয়া যদি মনকে প্রবোধ দিতে পারা যায়, তবে আর ভয় থাকিতে পারেনা।

'মন্ কেনরে ভাবিস্ এত,
মাতৃহীন বালকের মত?

ফণী হয়ে ভেকে ভয়, এযে বড় অদ্ভুত!
ওরে তুই করিস্ কালে ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীসুত?'

ভয়হারিণী ভগবতী বিশ্বজননী যার হৃদয়-মাঝে বিরাজ করেন, তার আবার কিসের ভয়? কারে ভয়?

অভয় দেও মা অভয়া! আমাদের জাতীয় ভীরুতা দূর হউক।

কি শিখিব?

শিখিব আমরা ভয়কে জয় করিতে। শিখিব আমরা সাহসকে জীবনরথের সারথী করিতে।

আত্মসংযম।

"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।"—গীতা

মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু।

শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া মানুষের একটা গর্ব্ব ও গৌরব আছে। বাস্তবিক পশুধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া পশু হইতে বিশেষত্ব লাভ করিতে পারিলেই মানুষ, মানুষ বলিয়া গৌরব করিবার অধিকারী হয়। পশুধর্ম্ম কেবল প্রবৃত্তিমূলক। ইহা অবিবেকপূর্ব্বক প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির দাসত্ব। এই দাসত্ব পরিহারে মানবের প্রকৃত গৌরব। মানবধর্ম্ম প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মূলক। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই লইয়াই মানবধর্ম্ম। কেবল ভোগে পশু। ভোগে ও ত্যাগে মানুষ। কেবল ত্যাগে দেবতা। ভীষ্মের জীবন কেবল-ত্যাগের জীবন। তিনি দেবতা। সংসারের পূর্ণকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও তিনি ভোগে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তিনি যেমন দিগ্বিজয়ী তেমনি ইন্দ্রিয়জয়ী মহাবীর। রিপুজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় শব্দ তাঁহাতে সম্পূর্ণ সার্থক। কাম বা ক্রোধ, লোভ বা মোহ, মদ বা মাৎসর্য্য—কোন একটা রিপুও তাঁহার পবিত্র হৃদয়-মন্দির স্পর্শ করিতে কোন দিনও সাহস পায় নাই। তাঁহার বীর্য্যহুঙ্কারে রিপু ছয়টা ভয় পাইয়াই বুঝি কোথায় লুকাইয়াছিল!

আমরা দেবতা হইতে না পারিলেও মানুষ হইতে পারি। মানুষ হইলেই মনুষ্য-জন্ম সার্থক।

প্রত্যেক মানবাত্মা নিজ নিজ অন্তর-রাজ্যের রাজা। যে রাজা, 'রূপকথার' বর্ণিত রাজার ন্যায় 'দুয়োরাণী' ও 'সুয়োরাণী' (সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি) লইয়া ঘর করেন; এবং দুয়োরাণীকে নিগ্রহ করিয়া সুয়ো-রাণীর বশীভূত হন, তিনি 'রূপকথার' রাজার ন্যায় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হন।

বৃত্রাসুর মূর্ত্তিমান্ দম্ভ। বৃত্রাসুরের পত্নী ঐন্দ্রিলা মূর্ত্তিমতী কুপ্রবৃত্তি। ঐন্দ্রিলা পতির বাসনানলে কেবলই ইন্ধন যোগাইত। ঐন্দ্রিলার উত্তে-জনায় দেবদ্রোহী বৃত্র ইন্দ্রাণীকে হরণ করিয়াছিল। কেবল-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী, অবশী বৃত্র পাপে ডুবিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল।

মানুষের অন্তরে অসুর আছে, দেবতা আছেন। এই অসুরকে যিনি জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বীর। তিনি দেবতার সেবা করিয়া দেবত্বলাভে সমর্থ। সাধারণতঃ মানুষের অসংযত আত্মা 'সুয়োরাণীর' (কুপ্রবৃত্তির) কুহকে ভুলিয়া তাহাকেই ভালবাসে, তাহারই কথা শুনে, এবং 'দুয়োরাণীকে (সুপ্রবৃত্তিকে) অনাদর করে।

বৃত্রাসুর প্রভৃতির কথা কল্পনার সৃষ্টি বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি; কিন্তু কুপ্রবৃত্তি লইয়া মানুষ অসুর হয় একথা সত্য; ইতিহাস তার সাক্ষী।

মাতৃহন্তা, স্ত্রীহন্তা, গুরুহন্তা, অসংখ্য নরহন্তা রোমসম্রাট্ নিরোর (Nero) কুকীর্ত্তি ইতিহাসের কলঙ্কিত পৃষ্ঠা অদ্যাপি ঘোষণা করিতেছে। অদ্যাপি লোকে তাহার নামে শত ধিক্কার দিতেছে। দুরন্ত বন্যশার্দ্দূলও বোধ হয় মাতৃহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয়, যে বাঘিনীর সহিত সে পত্নীবৎ ব্যবহার করে, তাহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু মনুষ্যদেহ

ধারণ করিয়া নিরো ক্রমে মাতাকে, ভার্য্যাকে, শিক্ষকমহাশয়কে বধ করিয়াছেন, কত কত নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। মানুষ হিংস্র ব্যাঘ্র অপেক্ষাও হিংস্র হইতে পারে না কি? অসুর অপেক্ষাও অসুর হইতে পারে না কি?

একদা নিরোর ইচ্ছা হইল অগ্নিদাহে ঘরবাড়ী কেমন জ্বলিতে থাকে, জ্বলন্ত অগ্নিশিখার কিরূপ শোভা হয়, নগরে আগুন লাগাইয়া দেখিব। যেই ইচ্ছা, সেই কার্য্য। আগুন জ্বালাইয়া নগর দগ্ধ করিবার হুকুম দিয়া সম্রাট্ তামাসা দেখিবার জন্য উচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নগরের অনেক ঘর বাড়ী ভস্মসাৎ হইল। এই অগ্নিকাণ্ডে নগরবাসিগণের কি দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণেও লোমহর্ষণ হয়! ইহাতে কেবল নাগরিকদিগের নয়, নিজেরও প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। এইরূপ নৃশংসকার্য্য করিয়া সম্রাট্ নিজের মৃত্যু নিজে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন।

সম্রাটের এই বৃহৎ কু-ইচ্ছা সাধারণ লোকের হৃদয়ে জাগিয়া এই প্রকার বৃহৎ কুকার্য্য সাধন করিতে সম্ভবতঃ পারে না, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুবাসনা লইয়া কত অসংযমী যুবক কুপথে চলিয়া নিজের সর্ব্বনাশসাধন করে। কত সোণার সংসার এই প্রকার অসংযমাগ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হয়। কত লোক সামান্য একটু কর্ত্তৃত্ব-প্রভুত্ব পাইয়াই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরো হইয়া বসে। ইতিহাসে ইহাদের নামগন্ধ না থাকিলেও ইহাদের দুর্গন্ধময় চরিত্রে সমাজ অপবিত্র হইয়া থাকে। এই অসুরত্ব বা পশুত্ব দূর করিবার জন্য সংযম-শিক্ষার প্রয়োজন।

নির্ম্মল-সরল বলিয়াই শিশুর মন স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ। শিশু ভগবানের প্রিয়। তাহার হৃদয় ভগবানের মন্দির। 'Heaven is about us is our infancy'. শিশুর গাত্রে ধূলি-কাদা থাকিলেও

তাহার 'সাদা মনে কাদা নাই'। কিন্তু 'বয়স বাড়ে আর দোষ বাড়ে'। যতই বয়স বাড়িতে থাকে, পৃথিবীর সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে থাকে, ততই মনে ময়লা ও বিকার জন্মে। মলে ঘৃণিত কৃমি-কীটের জন্ম হয়। মলিন, অপবিত্র মনের মধ্যে ভূত পিশাচ, রাক্ষসেরা আসিয়া বাস করে। কুভাব-কুচিন্তা সকল সর্ব্বদা কিলিবিলি করিতে থাকে, দেবমন্দিরকে সয়তানের মন্দির করে, স্বর্গকে নরক করিয়া তোলে।

আজকাল এই দেশে ভদ্র হওয়ার একটা সাড়া পড়িয়াছে। ছোট, বড় সকলেই ভদ্রবেশ লইয়া ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে চায়। কিন্তু মনকে ভদ্রলোক করিতে না পারিলে, কেহই ভদ্র হইতে পারে না। সাদা ধব্-ধবে, সুন্দর পোষাকের নীচে, সুগন্ধ মাখা, মার্জ্জিত দেহের ভিতরে কালকূটে ভরা কাল মন থাকিতে পারে। কাল, অভদ্র মন লইয়া ভদ্রসমাজে বাহির হওয়া নিতান্ত লজ্জার কথা। মন ভদ্রলোক হইলে, তখন আর সে অভদ্রসমাজে থাকিতে চায় না, তখন সে ইন্দ্রিয়-গুলিকেও ভদ্র করিয়া লয়। তাহার সমস্ত পরিবার ভদ্র হইতে থাকে। তখন সে চায় কেবল ভদ্রকথা শুনিতে, ভদ্রবস্তু দেখিতে।

'ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যজত্রাঃ'।

বিনা শিক্ষায় মনকে ভদ্রলোক করা কঠিন, সুতরাং বাল্যকাল হইতে সংযম অভ্যাস করা আবশ্যক, যেন মনে কোন ময়লা জন্মিতে না পারে।

সংযম অর্থ ইন্দ্রিয়ের নিরোধ, সংহার নহে। কু-ইচ্ছার দমন, ইচ্ছা-বৃত্তির উচ্ছেদন নহে।

"প্রত্যাহার-বড়িশেন ইচ্ছা-মৎসীং নিযচ্ছত।"

প্রত্যাহার-বড়িশেরদ্বারা ইচ্ছা-মৎস্যীকে ধর, আট্কাইয়া রাখ। অন্যায়রূপে ভোগলালসা চরিতার্থ করিতে যে কোন ইন্দ্রিয় যখনই ধাবিত

হইবে, তখনই তাহাকে খপ্ করিয়া ধরিবে এবং ভিতরের দিকে টানিয়া লইবে। কচ্ছপ যেমন শুঁড়, হাত, পা বাহির করে, আবার গুটাইয়া ভিতরে লইয়া যায়, সেইরূপ বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখীন করিতে হইবে। বাহ্যবস্তুভোগের জন্য ইন্দ্রিয়সকল বাহিরে ছুটিয়া বেড়ায়। মন ইহাদের সহায়, সর্দ্দার। কু-ইচ্ছা লইয়া মন যখন ইহাদিগকে কুপথে চালায়, তখন বিবেকের বেত্রাঘাত করিয়া মনকে ফিরাইতে হয়

যৌবনে, মনে বিকার জন্মে, যৌবন বিষমকাল। যৌবনে বল আসে, যৌবন সুন্দর, যদি মনকে সুন্দর-পবিত্র রাখা যায়। এই সময় ইন্দ্রিয় ও মন স্বভাবতঃ সতেজ ও বলশালী হয়। ইহাদিগকে বশে রাখিয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্যসাধনই সংযমের উদ্দেশ্য। দ্রুতগামী, তেজস্বী অশ্ববরের পৃষ্ঠারোহণে বলবান্ শিক্ষিত আরোহীর যেমন আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি, তেমনি গন্তব্য স্থানে সত্বরে উপস্থিতি। দুর্ব্বল, অর্দ্ধমৃত গর্দ্দভতুল্য অশ্বচালন বিরক্তিজনক, বিড়ম্বনামাত্র। সেইরূপ বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও মন লইয়া, উহাদিগকে স্ববশে আনিয়া যেমন সুখে গুরুকার্য্য সম্পাদন করিতে পারা যায়, বলহীন ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা তেমন পারা যায় না। আমরা দুর্ব্বল জাতি, দুর্ব্বল আমাদের ইন্দ্রিয়, দুর্ব্বল আমাদের মন। দুর্ব্বল বলিয়াই ইহাদিগকে বশে রাখা বড় কঠিন। দুর্ব্বল দেহ অচল হইলেও দুর্ব্বল মন সতত চঞ্চল, দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সতত বিপথগামী। ইহা-দিগকে কেবলই টানিয়া লইতে হয়। ইহারা গাধার মতন চাবুকের শত আঘাতেও চলিতে চায় না, বসিয়া পড়ে। কিন্তু তেজী টাট্টু ঘোড়ার এক চাবুকই যথেষ্ট। বলবানের পক্ষে সংযম শিক্ষা তত কঠিন নহে।

মানুষের অন্তর-রাজ্যমধ্যে কামক্রোধাদি রিপুসকল সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। কামের এক নাম মনসিজ বা মনোজ। কাম

মনেই জন্মে, মনের মধ্যেই থাকে। ক্রোধলোভাদি কামের সঙ্গী। ইহাদের মতন দুর্জ্জয় শত্রু আর নাই। কিন্তু দুর্গ জয় করিতে পারিলেই দুর্গবাসিগণ বশে আসে, না-হয় পলাইয়া প্রস্থান করে। মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয় জয়, মনের দ্বারাই মনের জয় করিতে হয়।

সাধারণতঃ লোকে পরের উপর আধিপত্য করিতে একান্ত সমুৎসুক; কিন্তু নিজের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারিলেই প্রকৃত সুখ। নিজের উপর যাহার প্রভুত্ব নাই, যে রিপুর দাস, তাহার স্বাধীনতা কোথায়? আত্মজয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা। পরিবার মধ্যে যদি সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া কর্ত্তার অবাধ্য হয় ও কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব লোপ করে, তবে সেখানে কেবল বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। পক্ষান্তরে, কর্ত্তা যদি উহাদিগকে শাসনে-অধীনে রাখিতে পারেন, তবে সুখশান্তি সম্ভবপর। সেইরূপ অন্তর-পরিবারে সকলকে বশীভূত রাখিতে পারিলেই আত্মা সুস্থ-সুখী হইতে পারে।

সংযম চারিত্র্যলাভের প্রধান সাধন। ইহার বলে মানুষ পশুর উপরে আসন পাইয়া থাকে। এই সংসার পরীক্ষা-প্রলোভনে, বিঘ্ন-বিপদে পরিপূর্ণ। সংযম অভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া দুষ্কর। বিপদে আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য। সংযমবিহীন নর জীবনস্রোতে তৃণবৎ ভাসিতে থাকে, কূল পায় না। অসংযমে অমিতাচার, অত্যাচার, স্বেচ্ছাচার। বিবেকাধীন থাকিয়া নিয়মপূর্ব্বক যথেচ্ছ প্রবৃত্তির শাসন-সংযম না হইলে জীবন উচ্ছৃঙ্খল ও দুঃখময় হইয়া থাকে।

সংযমের উপকারিতা উত্তম রূপে জানিয়াও অভ্যাসদোষে অনেক যুবককে ইন্দ্রিয়সংযমে সম্পূর্ণ অসমর্থ দেখা যায়। কবি বর্ণস্ স্বয়ং লিখিয়াছেন :—

Reader ! attend, whether thy soul'
Soars fancy's flight beyond the pole,
Or darkling grubs the earthly hole
In low pursuit ;
Know—prudent, cautious self-control
Is wisdom's root.

পাঠক ! প্রণিধান করুন, আপনার আত্মা কল্পনাবলে মেরু অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধেই উঠুক অথবা সামান্য কার্য্যের লাগিয়া আঁধারে থাকিয়া মাটীর নীচে গর্ত্তই খনন করুক, ইহা জানিবেন যে, সুবিবেচিত, সতর্ক আত্মসংযমই বিজ্ঞতার মূল।

কি সুন্দর উপদেশ! কিন্তু উপদেষ্টা স্বয়ং সংযমের কোন ধার ধারিতেন না। তিনি অত্যন্ত সুরাসক্ত ছিলেন, পানলোভ সম্বরণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার আদৌ ছিল না।*

কতলোক পরকে এই প্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু নিজে পালন করিতে পারেন না।

"পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাম্।
ধর্ম্মে স্বীয় মনুষ্ঠানং কস্যচিৎ তু মহাত্মনঃ ॥"

পরকে উপদেশ দিতে সকলেই পণ্ডিত। কিন্তু সেই উপদেশ-অনুসারে কার্য্য করিতে অনেকেই পারেন না। যিনি পারেন, তিনি মহাত্মা।

---

* No one knew the value of self-control better than the poet Burns, and no one could teach it more eloquently to others; but when it came to practice, Burns was as weak as the weakest. One of the vices before which Burns fell and it must be said to be a master-vice, because it is productive of so many other vices—was drinking.

Smile's Character.

জাট্‌ফেনের যুদ্ধে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া সার ফিলিপ সিদ্‌নি (Sir Philip Sidney) দারুণ জল-পিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন, কিন্তু জলের অত্যন্ত অভাব। অতি কষ্টে একটু জল আনিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি তাহা পান করিবার জন্য মুখের কাছে নিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, তদবস্থ একজন সামান্য সৈনিক সেই জলের গ্লাসের পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। ফিলিপ তৎক্ষণাৎ নিজে পান না করিয়া সৈনিককে পানার্থ সেই জল দিলেন। কেমন সংযম! কেমন ত্যাগস্বীকার! কবি বর্ণস্ ও ইঁহার কার্য্যে কত পার্থক্য! কেবল এই একটী মাত্র কার্য্য স্মরণ করিয়াই আমরা বলিতে পারি, ইঁহার 'সার'-উপাধি সম্পূর্ণ সার্থক। ইনি প্রকৃতই মহাশয় ব্যক্তি।

বঙ্গের অসামান্য প্রতিভাশালী কবি মধুসূদনের কি শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল, তাহা ভাবিতে বুক ফাটিয়া যায়! ধনীর পুত্র হইয়া, বাগ্দেবীর বরপুত্র হইয়া, বহুভাষাবিৎ ব্যারিষ্টার হইয়া, কেন তাঁহার এত অর্থাভাব? কেন তিনি অর্থাভাবে নিদারুণ মনঃকষ্টে দাতব্য চিকিৎসালয়ে অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন? সংযমের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। মধুসূদনের জীবন অবশী-বিদ্বান্‌দিগের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

শরীর ও চরিত্রগঠন শাসন-শিক্ষণ-সাপেক্ষ। শরীরকে গড়িয়া পিটিয়া লোহার ভীম করা যায়, আবার ননীর পুতুলও করা যায়। আমরা কিন্তু ননীর পুতুলই ভালবাসি। একটু সূর্য্যতাপেই ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েগুলি কেমন গলিয়া যায়। ছোটবেলা হইতে, রৌদ্র-বাত-বৃষ্টি হইতে সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে ভদ্রঘরের পিতামাতা সর্ব্বদা এত সতর্কতা অবলম্বন করেন যে, যদি দৈবাৎ সামান্য একটু রৌদ্র বা বৃষ্টির জল গায়ে লাগে, তবেই তাহাদের মাথা ধরে, জ্বর হয়, বা অন্য কোন রকম অসুখ হইয়া পড়ে। এই অভ্যাসের ফলে তাহারা বড় হইয়াও বড় ননীর পুতুলই

হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আমরা অহরহ দেখিতেছি, শ্রাবণের ধারা কৃষকের অনাবৃত মস্তকে অবিশ্রান্ত পতিত হইয়াও মাথা ধরা জন্মাইতে পারে না। সে অনায়াসে পৌষের শীত, চৈত্রের রৌদ্র সহ্য করিয়া শরীরটাকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। ইহা আবাল্য অভ্যাসের ফল। মুটে মজুর তিন মণী বস্তা বহন করিয়া পৃষ্ঠের শক্তি পরীক্ষা করে। নগ্ন-পদে প্রস্তর-ইষ্টক-নির্ম্মিত রাজপথে যোজন পথ হাটিতে অথবা দিনে ২৫।৩০ মাইল চলিতে কেহ ক্লেশ বোধ করে না। কেহ বা পোয়া মাইল হাটিয়া ক্লান্ত হয়। কেহ দশ মণ পাথর বুকে লইতে পারে, কেহ পাঁচ সের পাথরের চাপ সহিতে পারে না। ইহা অভ্যাসের ফল। ফলতঃ "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়।"

ননীর পুতুলে কোন কাজ হয় না। লোহার শরীর চাই। লোহা যেমন কাজের জিনিষ, এমন কোন ধাতুই নহে। সেইরূপ লোহার শরীরদ্বারা জীবনে অনেক কাজ পাওয়া যায়। লোহার শরীর পাইতে হইলে, শরীরকে না বসাইয়া প্রতিদিন নিয়মিতরূপে খাটাইতে হইবে। ধনী, বাবু, ভদ্র সকলেরই শ্রম-ব্যায়াম, প্রকৃতির সঙ্গে খেলা, উদ্যম-সাপেক্ষ ক্রীড়া অভ্যাস করিতে হইবে।

আমরা বলিয়াছি, শরীরকে গড়িয়া লোহার ভীম করা যায়। ইহা যে কথার কথা নয়, ইহা যে বস্তুগত্যা সত্য, তাহা ঢাকার শ্যামাকান্ত এবং মাদ্রাজের রামমূর্ত্তি প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্যামাকান্ত নিজের সার্কাসে বড় বড় বাঘের সহিত খেলা করিয়া, বার তের মণ পাথর বুকে লইয়া, শারীরিক শক্তির যেরূপ পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহা আমরা অনেকেই দেখিয়াছি।

রামমূর্ত্তি যদিও বাল্যকালে হাপানিরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং অতিশয় দুর্ব্বল ছিলেন, তথাপি প্রবল ইচ্ছা লইয়া, রীতিমত নানা প্রকার

ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া, ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি অসামান্য শারীরিক শক্তিলাভ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে চলন্ত-মোটর গাড়ীর গতিরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার বুকের উপর দিয়া যে প্রকাণ্ডহাতী চলিয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন।

শ্যামাকান্ত বা রামমূর্ত্তির পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছে, তাহা যড়-মধু-বিধুর পক্ষে কেন অসম্ভব হইবে?

শরীরের পক্ষে বাহ্যিক ড্রিল (Drill) যেমন, আত্মজয় সম্বন্ধেও তেম্‌নি আভ্যন্তরীণ ড্রিল, মনের ড্রিল হিতকারী। শরীরকে মহাশয় করিয়া মনকে মহাশয় করিতে পারিলেই মানুষ মহাশয় হইতে পারে। শৈল-গাত্রের ন্যায় রৌদ্র, বাত, বৃষ্টি সহিয়া শরীর—মহাশয়। স্তুতি-নিন্দা, সুখ-দুঃখ সহিয়া মন, মহাশয় হয়। নিজের প্রশংসায়, সুখসম্পদের অবস্থায়, যাহার মন উৎক্ষিপ্ত তুলার মতন ১০ হাত উর্দ্ধে, আকাশে উড়িয়া বেড়ায় না, আর নিন্দাবাদে, দুঃখবিপদে যাহার মন নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় দশ হাত জলের তলে ডুবিয়া যায় না, তিনিই মহাশয়।

আমরা লোহার শরীর লইয়া সোনার মন গড়িতে চাই। সোনার মন লইয়া সোনার মানুষ, খাঁটি সোনাব মানুষ হইতে চাই। আমরা শরীরে অসুরের বল লইয়া দেবতার মতন প্রয়োগ করিতে শিখিব। সেক্ষপির বলিয়াছেন :—

O! it is excellent
To have a giant's strength; but it is tyrannous
To use it like a giant. (Measure for Measure)

দৈত্যের বল লাভ করা অতি উত্তম, কিন্তু দৈত্যের মতন বল প্রয়োগ করা নৃশংসতা।

যিনি আত্মজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, তিনি বিশ্বমানববিজয়ী, প্রকৃত বীরপুরুষ। লোকের হৃদয় তিনি যেমন জয় করিতে পারেন, কোন দিগ্বিজয়ী সৈনিক-পুরুষ তেমন পারেন না। দেশজয় অপেক্ষা কামক্রোধ জয় শতগুণে কঠিন, সুতরাং শতগুণে প্রশংসনীয়। মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করা, কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর বশীভূত না হইয়া ইহাদিগকে বশে রাখাই আত্মজয়। অসংযত, অবাধ্য মন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে লইয়া আত্মদ্রোহী। এই বিদ্রোহ দমন ও ইহাদের সমুচিত শাসনের নাম আত্মশাসন। আত্মশাসনই প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন। এ কার্য্যে বিদ্রোহী-দিগের প্রতি সর্ব্বদা শ্যেনদৃষ্টি রাখা চাই। কোন সময়েও ইহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে নাই। যিনি প্রশ্রয় দেন, তিনি নিজেই নিজের শত্রু। যিনি শাসন করেন, তিনি নিজেই নিজের বন্ধু।

কাম-বশে বা ক্রোধের উত্তেজনায় লোকে আত্মহত্যা করে, মানুষ খুন করে, নিজের ও পরের ধর্ম্মনাশ ও সর্ব্বনাশ করে। লোভের বশে লোক চুরি করে, ফাটক খাটে। জিহ্বাকে শাসন করিতে না পারিয়া কতলোক কুখাদ্য খাইয়া পেটের অসুখে কত কষ্ট পায়। শুনিয়াছি, ঢাকার কোন ছাত্রনিবাসে একছাত্র আহারের পর অপরিমিত মিঠাই খাইয়া বিসূচিকারোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

কামাদি ষড়্‌বর্গ আমাদের পরম শত্রু। তন্মধ্যে কাম সর্ব্বপ্রধান। কাম প্রধান মল্ল। ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেই তার দলের আর সকল আপনা হইতেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে। কাম চরিতার্থ হইতে বাধা পাইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। লোভ, মোহ, মদ অজ্ঞানমূলক। এই রিপুগণ আমাদিগকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপের পথে লইয়া যায়।

ভগবৎপ্রেমের উজ্জ্বল কিরণপাতে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, পাপ কাম কোথায় চলিয়া যায়।

কামের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ ও লোভ অন্তর্হিত হয়। তেজস্বীরা ক্রোধ পরিহার করেন, কিন্তু তেজ পরিত্যাগ করেন না। ক্রোধ আর তেজ ভিন্ন পদার্থ। তেজ—বল। ক্রোধ—দুর্ব্বলতা।

তেজস্বীতি যমাহুর্ব্বৈ পণ্ডিতা দীর্ঘদর্শিনঃ।
ন ক্রোধোঽভ্যন্তরস্তস্য ভবতীতি বিনিশ্চিতম্॥

(মহাভারত)

দীর্ঘদর্শী পণ্ডিতেরা যাঁহাকে তেজস্বী বলিয়া থাকেন, তাঁহার অন্তরে ক্রোধ নাই; ইহা সুনিশ্চিত।

মাৎসর্য্য প্রেমাভাবনিবন্ধন। মানবপ্রেম জন্মিলে মাৎসর্য্য আসিয়া মনকে পরশ্রীকাতর করিতে পারে না।

আত্মজ্ঞানোদয়ে মদ-মোহ থাকিতে পারে না। ভগবৎপ্রেম জন্মিলে মানবপ্রেম, জীবে দয়া আপনা হইতেই আসে।

শিক্ষা ব্যতীত সংযম সম্ভবে না, পশুত্ব ঘোচে না। তাই প্রাচীনকালের আচার্য্যগণ সপ্তমবর্ষীয় ব্রাহ্মণবালকের উপনয়নসংস্কার বিধানপূর্ব্বক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন।

উপনয়নকালে বালককে প্রধানতঃ তিনটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইত।

১। ব্রতঞ্চরিষ্যামি, তত্তে প্রব্রবীমি। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমি ব্রত (ব্রহ্মচর্য্য) পালন করিব।

২। তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদহমনৃতাৎ। সেই ব্রহ্মচর্য্যের বলে ঋদ্ধিমান্ হইয়া আমি অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইব।

৩। সত্যমুপৈমি স্বাহা। আমি সত্যলাভ করিব।

পুরাকালে ছাত্রবৃন্দ, সংযমী আচার্য্যগুরুর নিকট শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া সংযমী, চরিত্রবান্ হইতেন।

বর্ত্তমানকালে সমাজের কল্যাণকামী, পরিণামদর্শী, বিজ্ঞ শিক্ষকগণও বোধ হয় ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন—আমরা তোমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, তোমরা প্রত্যেকে এই প্রতিজ্ঞা তিনটী স্বর্ণাক্ষরে হৃদয়গ্রন্থে লিখিয়া রাখ এবং সর্ব্বপ্রযত্নে পালন কর। ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন্! প্রতিজ্ঞা কর—

১। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ করিব।

২। মিথ্যাকে সর্ব্বথা বর্জ্জন করিব।

৩। সত্যের সেবা করিব। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিব।

কেবল এইরূপ প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট নহে। ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থা করা চাই। ছাত্রদিগকে পথ দেখাইয়া, সেই পথে চালাইতে পারিলেই তাহাদের চরিত্রগঠন সহজ হইবে।

কামক্রোধাদিরিপু দমন করিবার সুন্দর সুন্দর উপদেশ ও উপায় শাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভ অতি উত্তম উপায়। সাধুদৃষ্টান্তে রিপুদমন ও চরিত্রগঠন সহজে হয়। ছাত্রের পক্ষে দীর্ঘকাল সৎশিক্ষকের সহবাসই সাধুসঙ্গ।

সংযমী, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শিক্ষাধীন থাকিয়া ছাত্র কৃতার্থ হইতে পারে। সুচরিত্র বিদ্বান্‌গণ নিঃস্বার্থভাবে, পিতৃস্থানায় হইয়া, তরলমতি বালকদিগকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া, মানুষ করিবার ভারগ্রহণ করিলে তাহাদের মহা উপকার হইবে। প্রাচীনকালে, শিক্ষকালয় ও শিষ্যালয় এক, অভিন্ন ছিল। যিনি শিক্ষাগুরু তিনিই দীক্ষাগুরু হইতেন। কিন্তু এখন এরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর কি? সেকালের ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা এ যুগে সময়োচিত হইবে কি?

ব্রহ্মচর্য্য ও বিলাসিতায় অহি-নকুল সম্বন্ধ। এই বিলাসিতার দিনে,

সভ্যতার যুগে, সেকালের ব্রহ্মচর্য্যের কথাটা সভ্যতাভিমানী যুবকদল প্রলাপবাক্য বলিয়া হয়ত উড়াইয়া দিবেন। শিল্প-বিজ্ঞানের প্রসাদে, পৃথিবীময় সুখসৌখিনতার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি, দিন দিন নিত্য-নূতন বিলাস-দ্রব্যের সৃষ্টি ও আমদানি হইতেছে। ঘরে ঘরে বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে। কালের গতি রোধ করিবে কে? কেন আমরা বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া সুখে বঞ্চিত হইব? কেন আমরা শুক্‌ন কাঠ হইতে যাব? ব্রহ্মচর্য্যে লাভ কি? এই প্রশ্নের উত্তর মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রে পাওয়া যায়,—

"ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।"

ব্রহ্মচর্য্যপালনের ফল—বীর্য্যলাভ।

যেহেতু আমরা বিলাসিতায় মজিয়া, অলস অকর্ম্মণ্য হইয়া দিন দিন বল-বীর্য্যহীন হইতেছি, অতএবই আমাদের বিলাসিতা বর্জ্জন ও ব্রহ্মচর্য্যপালন একান্ত আবশ্যক। "Chastity is Life, sensuality is Death," পবিত্রতারক্ষণে ও বীর্য্যধারণে জীবন, ইন্দ্রিয়পরতায় মরণ। বদ্‌মেজাজ ইন্দ্রিয় ও মনের বদ-মরজিপালনই ইন্দ্রিয়পরতা ও বিলাসিতা। ইন্দ্রিয়সেবার ফল দুর্ব্বলতা। সংযমে শক্তির উপচয়, অসংযমে ক্ষয়। দেহ, মন ও মস্তিষ্কের বল কমিতে থাকিলেই শুষ্ককাষ্ঠ হইতে হইবে। পক্ষান্তরে, দেহের রস-বীর্য্যধারণ ও মনের পবিত্রতা-সাধনই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যপালনে সবল-সরস, সতেজ-সজীব বৃক্ষ হইতে পারা যায়।

আচার-ব্যবহার ও আহার-বিহারাদি সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত কতকগুলি সুনিয়ম পালন করিয়া দেহকে সুস্থ, মনকে পবিত্র ও চরিত্রগঠন করা ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য। একার্য্য প্রথম প্রথম ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু একবার অভ্যাস জন্মিলে আর তত কষ্টকর হইবে না।

অভ্যাস, স্বভাবে পরিণত হইলে, ত্যাগ করা সহজ হইবে না। সত্য-কথা বলিবার অভ্যাস পাকিয়া উঠিলে মিথ্যাবলা তাহার পক্ষে বরং কষ্টকরই হইবে, যে পূর্ব্বে সত্যকথা বলিতে জানিত না। অভ্যাসের ফলে নিদ্রালুর পক্ষেও, আয়ুর্ক্ষয়কারী অতিনিদ্রা ও দিবানিদ্রা পরিহার, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ সহজ হইবে। অভ্যাসের ফলে, প্রতিদিন যথা-কালে ভগবানের মধুর-পুণ্য নামকীর্ত্তন করিতে ও শুনিতে পাপীরও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জাগে। যাহারা সয়তানের চেলা, তাহারা হরি-নামে হিরণ্যকশিপুর ন্যায় অবশ্য কাণে আঙ্গুল দিবে। কিন্তু বালকেরা সয়তানের শিষ্য নয়। তাহাদের কোমলপ্রাণে ভক্তিসঞ্চার করা চার্ব্বাক-পন্থীগুরু ভিন্ন আর কে অপকর্ম্ম বলিয়া মনে করিবেন? পুত্রকে হরিভক্ত করিতে চেষ্টা করিলে গুরুর প্রতি হিরণ্যকশিপু ভিন্ন কোন্ পিতা রাগ করিবেন?

অবিবাহিতাবস্থায়, অব্যয়বীর্য্য হইয়া ছাত্রজীবন যাপন করা আবশ্যক। পঠদ্দশায় বিবাহ করিলে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনাই অধিক। ছাত্রজীবনে কেবল আয় করিবে, ব্যয় করিবে না। কেবল শাস্ত্রচিন্তা, 'কামিনী-কাঞ্চন' চিন্তা থাকিবে না। ব্রহ্মচর্য্যই ছাত্রের তপস্যা। জ্ঞানই তাহার ধ্যান। ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহস্থাশ্রম। কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহী হইবার যোগ্যতা লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন। লোকহিতার্থে কেহ কেহ ইচ্ছা করিলে রঘুনাথ শিরোমণি বা ভীষ্মের ন্যায় চিরকুমার থাকিতে পারেন।

কি শিখিব?

শিখিব আমরা ইন্দ্রিয়ের প্রভু হইয়া জগৎপ্রভুর সেবা করিতে। শিখিব আমরা রিপুর দাসত্ব না করিতে।

সাধুসঙ্গ।

'সজ্জনৈঃ সঙ্গতং কুর্য্যাৎ ধর্ম্মায় চ সুখায় চ।'

হিতোপদেশ।

হবে পুণ্য, পাবে সুখ, কর সাধুসঙ্গ।

এ দেশে সাধু-সন্ন্যাসীর অভাব নাই। অভাব নাই বলিয়াই প্রকৃত সাধু বাছিয়া লওয়া বড় মুস্কিল। গৈরিকবসন, রুদ্রাক্ষমালা, কমণ্ডলু, লৌহদণ্ড, ভালে তিলক, গায়ে নামাবলী, অথবা ঈদৃশ কোন বিশেষ ধর্ম্মচিহ্নে চিহ্নিত ব্যক্তিই এদেশে 'সাধু' নামে পরিচিত। সুচরিত্র ব্যক্তি সাধুনামের যোগ্য হইলেও, সংসারী হইলে, লোকে তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া ডাকে না। কিন্তু বাস্তবিক যিনি পূতচরিত্র, ধার্ম্মিক, যিনি সর্ব্বদা সৎপথে বিচরণ করেন, সন্ন্যাসী হউন বা সংসারী হউন, তিনিই সাধু। গৃহীর পক্ষে গৃহীসাধুর সঙ্গ সুলভ, সন্ন্যাসীসাধুর সঙ্গ দুর্লভ। সংসারে থাকিয়া যাঁহারা সুচরিত্র, সত্যপ্রিয়, ন্যায়বান্, তাঁহাদের সহবাস প্রত্যেকেরই বাঞ্ছনীয়, এবং অসতের সংসর্গ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। উন্নতচেতা বলবান্ ব্যক্তির সহবাস, হীনচিত্ত দুর্ব্বলের পক্ষে বিশেষ লাভজনক।

সৎসঙ্গের উপকারিতা ও অসৎসঙ্গের অপকারিতা বহুগ্রন্থাদিতে বর্ণিত আছে এবং ইহা প্রত্যক্ষলব্ধ। কত অসৎলোক সৎসঙ্গের গুণে

উন্নত, আবার কত সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তি অসৎসঙ্গের দোষে পতিত হইয়াছে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সৎসঙ্গ পরশমণিতুল্য, লোহাকে সোনা করে। জগাই-মাধাই দস্যু দুই ভাই, নিতাই-নিমাইর সঙ্গলাভ করিয়া নবজীবনলাভ করিয়াছিল। রামচন্দ্র খাঁর নিয়োগে যে বেশ্যা সাধুহরিদাসের পবিত্রতা নষ্ট করিতে গিয়াছিল, সাধুর পুণ্য আশ্রমের পুণ্যবাতাসে সেই পাপীয়সী কুলটার অসাধু সঙ্কল্প উড়িয়া গেল। সাধুর কৃপায় তাহার কলঙ্কিত জীবন পবিত্র হইয়া গেল। বিষ অমৃতে পরিণত হইল। ক্রমে সেই পাপিষ্ঠা—

"প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি।"

সাধুসঙ্গের এমনই আশ্চর্য্য মহিমা! ফলতঃ,

"সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।"

সাধুরা তীর্থস্বরূপ। তাঁহাদের দর্শনে পুণ্য হয়। আজকাল প্রকৃত-সাধু নিতান্ত সুলভ না হইলেও একান্ত দুর্ল্লভ নহে। সংসারের তপ্তবায়ু মনকে তপ্ত করিয়া তোলে, তাই সময়ে সময়ে তীর্থস্থানে গমন, সাধুদর্শন গৃহীর কর্ত্তব্য। কিন্তু নিখিললোকসমাজ নিতাই-নিমাই বা হরিদাসের ন্যায় ভক্ত প্রেমিকের সঙ্গ পাইয়া পাপ-তাপ দূর করিতে পারিবে, এরূপ আশা করা যায় না।

আমরা সাধারণতঃ অসাধু মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে লইয়া অসাধুসমাজে সর্ব্বদা বাস করি। সাধুপুরুষের ন্যায়, যে স্থান, বস্তু বা গ্রন্থের পুণ্য-মহিমায় সেই অসাধুসমাজ সাধু হয়, তাহা তীর্থভূত, আমাদের সেবনীয়। তাহাও সাধুসঙ্গ। স্বর্গ-কুসুম-সুরভি, অমল-হৃৎ-কমল শিশুর নিকট অনবদ্য আনন্দ-হাসি ও সরল-পবিত্রতা শিখিয়া আমরা গৃহকে তীর্থে পরিণত

করিতে পারি। আবার, সন্তানের পক্ষে সুপিতা-সুমাতা, শিষ্যের পক্ষে সদ্‌গুরু, তীর্থসলিলের ন্যায় পুণ্যশীতল, পাবকের ন্যায় পাবন।

অসৎসঙ্গ সোনাকে লোহা করে। ব্রাহ্মণতনয় গৌতম, ব্যাধের সংসর্গে থাকিয়া পক্ষীহননপটু ব্যাধত্ব প্রাপ্ত হইয়া, হিংসাপরায়ণ কুৎসিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল। সঙ্গদোষে সাধু চোর হয়, যোগী যোগভ্রষ্ট হয়। এমন কি, বাঘের সঙ্গে থাকিয়া মানুষ, বাঘের প্রকৃতি পায়। আমরা শুনিয়াছি—একবার কোন এক পরিবারের একটী দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানকে একটা বাঘিনী হরণ করিয়া লইয়া যায়। বাঘিনী তাহাকে প্রাণে না মারিয়া বনের মধ্যে সন্তানস্নেহে নিজ সন্তানদিগের সহিত লালনপালন করিতে লাগিল, স্তন্যপান করাইয়া বাঁচাইয়া তুলিল। ক্রমে শিশু বাড়িতে লাগিল, ক্রমে হাটিতে শিখিল। বাঘের মতন সে তখন ডাকে, বাঘের মতন হাটে, বাঘের মতন শীকার ধ'রে আম মাংস খায়। সকল রকমেই বাঘের অনুকরণ করিয়া—বাঘের স্বভাব পাইয়া একটী ব্যাঘ্র-শিশু হইল। অনেক দিন পর দৈবাৎ তাহাকে পাইয়া লোকালয়ে আনিয়া গোদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হইল, কিন্তু বহু-যত্নেও বাঁচিল না, কিছু কাল পর মরিয়া গেল।

মানুষের স্বভাবই এইরূপ যে, সে একাকী থাকিতে ভালবাসে না, একাকী থাকিতে পারে না। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই সঙ্গী চায়। একাকী থাকা নির্জ্জন কারাবাসতুল্য ক্লেশপ্রদ। লোক সংখ্যা ও সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসৎলোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি হওয়াই সম্ভবপর। বস্তুতঃ সাধুর সংখ্যা চিরকালই কম। সুতরাং সঙ্গনির্ব্বাচনবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। অভিভাবক, ভাল সঙ্গী বাছিয়া না দিলে, অসৎ-সঙ্গে পড়িয়া বালকের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। সঙ্গনির্ব্বাচন অতি কঠিন কার্য্য। ইহা লোকচরিত্রজ্ঞানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। তরল-

মতি বালকের তাহা নাই। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া সঙ্গী বাছিয়া লইতে হয়, কিন্তু বালকেরা এত কষ্ট স্বীকার করিতে চায় না। তাহারা কে ভাল, কে মন্দ বিচার করে না; সঙ্গী পাইলেই তাহার সঙ্গে মিশে। এবিষয়ে পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার। সন্তানদিগকে যার তার সঙ্গে মিশিতে, খেলিতে ও বেড়াইতে দেওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। অভিভাবকহীন যুবকেরা স্বয়ংই সঙ্গ নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের কর্ত্তব্য যে, যে সকল যুবক সৎ বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন, প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন, কেবল তাহাদের সঙ্গ লাভ করা। অনেক খলপ্রকৃতির লোক ধনীযুবকের বন্ধুত্ব কামনা করিয়া থাকে; বাহিরের মধুর ব্যবহার ও মিষ্টকথায় ভুলিলেই ঠকিতে হইবে।

দুষ্ট মানুষের মিষ্টকথা, ঘনায়ে বসে কাছে।
কথা দিয়ে কথা নেয়, পরাণে বধে শেষে" ॥

খলের ব্যবহার এইরূপই ঘটে। "খলের পীরিত জলের রেখা। নিতান্ত অস্থায়ী, কিছুই নয়। সংসারে 'বিষকুম্ভ-পয়োমুখ' বন্ধুর অভাব নাই! উপরে, মুখে অমৃত থাকুক, কিন্তু ভিতরে বিষ আছে কি অমৃত আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা বুদ্ধিমানের কার্য্য।

অনেক সময় উত্তম সঙ্গী পাওয়া যায় না। উত্তম সঙ্গী না জুটিলে একাকী নির্জ্জনতার মধ্যে থাকা শতগুণে শ্রেয়ঃ। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও অসৎসঙ্গে থাকা কর্ত্তব্য নয়। সাধারণতঃ উত্থান বহু-আয়াস-সাধ্য, পতন অযত্নলভ্য। উত্থান সময়সাপেক্ষ, পতন মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্ভাব্য। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, দেহের সঙ্গে আমাদের মনটাকেও যেন মাটীর কাছে, নীচে টানিয়া রাখিতে চায়। অসৎসঙ্গ পৃথিবীর এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করে। ক্ষণকালের মধ্যে মানুষের অধঃপতন ঘটাইতে পারে। কিন্তু সাধুসঙ্গ—মনের ব্যোমযান; মানুষকে উর্দ্ধে লইয়া যায়।

সৎলোকের সহবাস সুলভ না হইলেও বর্ত্তমানকালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে সদ্‌গ্রন্থের অভাব নাই। সাধুর ন্যায় সদ্‌গ্রন্থ স্বর্গস্বরূপ। অসাধুর ন্যায় অসদ্‌গ্রন্থ নরকসদৃশ। সদ্‌গ্রন্থের ন্যায় চিরহিতকারী, বিশ্বস্ত বান্ধব বিরল। অসদ্‌গ্রন্থ পরম শত্রু। অকৃত্রিম বন্ধুলাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এরূপ সৌভাগ্য জীবনে অনেকেরই হয় না। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিলে সদ্‌গ্রন্থরূপ পরমবন্ধু চিরদিনের জন্য অনায়াসে পাইতে পারি। এই বন্ধু সম্পদে-বিপদে সর্ব্বদাই আমাদের সহায়। শোকে সান্ত্বনা দেয়, দুশ্চিন্তা দূর করিয়া সুচিন্তা জাগায়।

"চিতাচিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তৈব চ গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতম্॥"

চিতা ও চিন্তা এই দুয়ের মধ্যে চিন্তাই অতি ভয়ঙ্কর। চিতা কেবল মৃতকে দগ্ধ করে, চিন্তা তাজা মানুষকে পোড়াইয়া মারে। এ হেন জ্বালাময়ী চিন্তার হাত হইতে সদ্‌গ্রন্থের অনুগ্রহে আমরা নিস্তার পাই। ইহার সাহায্যে আমরা প্রাচীন ও বর্ত্তমানযুগের ঋষিকল্প জ্ঞানিগণের সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। মৃত মহাত্মাদিগের চিন্তা, কার্য্যকলাপ, আশা-উৎসাহ আমাদের জীবনের অন্ধকারময় পথে আলোকবর্ত্তিকাস্বরূপ। তাঁহাদের অতীত চরিত্র আমাদের নিকট বর্ত্তমানবৎ প্রত্যক্ষ হয় এবং বিপদে ধৈর্য্য, সম্পদে ক্ষমা, যশে স্পৃহা, বিদ্যায় অনুরাগ প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণ শিক্ষা দেয়। কাল ও স্থানের দূরবর্ত্তিতায় যে সকল মহানুভব ব্যক্তির সহবাসে আমরা বঞ্চিত, গ্রন্থ আমাদিগকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎকার ও আলাপ-পরিচয় করাইয়া দেয়। কবি সাদির (Southey) ন্যায় যিনি সত্যসত্যই বলিতে পারেন—"My days among the dead are past." পরলোকগত মহাপুরুষদিগের সহবাসে

আমার জীবিতকাল অতিবাহিত হইয়াছে, অথচ সাধুসঙ্গের ফল পায় নাই, তবে নিশ্চয়ই তাহার গ্রন্থ পাঠ বিড়ম্বনার একশেষ।

সঙ্গীনির্ব্বাচনের ন্যায় গ্রন্থনির্ব্বাচন দুরূহ কার্য্য না হইলেও এবিষয়েও পূর্ব্বাহ্নে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে বিশেষ বিপদাশঙ্কা। কুৎসিত পুস্তকের কুরস আস্বাদন করিয়া বালকদিগের কুরুচি জন্মিলে তাহা ত্যাগ করান শেষে কঠিন হইয়া পড়ে। খারাপ পুস্তক পড়িয়া তাহাদের চরিত্রে দোষ জন্মে। জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুজনের এই সম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকিলে তাহাদের অনেক উপকার হইতে পারে। কার্ পক্ষে কোন্ শ্রেণীর পুস্তক উপযোগী, তাহা বয়স্ক যুবকগণ নিজেরাই মনোনীত করেন।

"আপ্-রুচি খানা, পর-রুচি পর্‌না।" পরের রুচি অনুসারে যখন যেমন ফ্যাশন, সেই অনুসারে পোষাক করিতে হয়। কিন্তু খাওয়াটা নিজের রুচিমত হওয়া চাই, তা না হইলে তৃপ্তি হয় না, অসুখও হইতে পারে। অধ্যয়নও আহারবিশেষ, মনের আহার। কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিলেই আমাদের মধ্যে অনেকের পুস্তকে ভয়ানক অরুচি জন্মিয়া থাকে। অরুচি ও কুরুচি উভয়ই অনর্থের মূল। দূর করা আবশ্যক।

কুগ্রন্থের কুফল হলাহলতুল্য। ইহা মানুষকে বিলাসী-বিধর্ম্মী, গুরু-দ্বেষী, সংশয়বাদী নাস্তিক করিতে পারে। সমাজে বিপ্লব ঘটাইতে পারে। একথা কে অস্বীকার করিবেন?

লণ্ডনরহস্য (Mysteries of the Court of London), ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কি লোকের কুরুচিতে ইন্ধন যোগায় নাই? ইটালীর গ্রন্থকার ম্যাকিয়াভেলির (Macchiavelli) গ্রন্থ পড়িয়া কেহই কি কুনীতির আশ্রয় লয় নাই? চার্ব্বাকদর্শন বা তত্তুল্য ইউরোপীয়দর্শন কি কাহারো মনে সংশয়বাদ বা নাস্তিকতা জাগায় নাই? ফরাসীলেখক

রুসোর (Rousseau) গ্রন্থাবলী, বিশ্বপ্লাবী ফরাসী-বিপ্লব ঘটাইতে কি কিছুমাত্র আনুকূল্য করে নাই ?

পক্ষান্তরে সুগ্রন্থের সুফল অমৃতোপম। ইহা মানুষকে মানুষ করে, দেবতা করিয়া তোলে, গুরুভক্ত, ঈশ্বর-প্রেমিক করে, সমাজকে সংস্কৃত, উন্নত করে। এডিসনের (Addison) লেখা পার্লেমেণ্টের বিধিবিধান অপেক্ষাও তদনীন্তন সমাজের অধিক উপকার করিয়াছে। প্রেমিক হাফেজের গ্রন্থ কত লোকের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের সঞ্চার করিয়াছে। গীতা কত কত ধার্ম্মিককে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগ শিক্ষা দিয়াছে, দিতেছে।

সংগ্রন্থের একটা লক্ষণ এই যে,—শতবার পড়িলেও আর একবার পড়িতে ইচ্ছা হয়। প্রত্যেক বারেই নূতন বলিয়া বোধ হয়। যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে যখনই পড়া যায়, তখনই নূতন আনন্দ পাওয়া যায়। সেই পুস্তকই উত্তম, যাহা অজ্ঞাতসারে আমাদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করে, যাহা মনের সুখ জন্মাইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের দিকে, মঙ্গলের দিকে লইয়া যায়। সেই পুস্তকই উত্তম, যাহা আমাদের আভ্যন্তরীণ উন্নতি-বিধান করিয়া ভগবানের কাছে পৌঁছিবার পথ দেখাইয়া দেয়।

প্রত্যেক জাতিরই একটা বিশেষত্ব, বিশেষ চরিত্র আছে। ইহাই একজাতিকে অপর জাতি হইতে পৃথক্ করে। ইহার অস্তিত্বে, জাতির অস্তিত্ব, বিলোপে জাতির বিলোপ বা বিলয়। সুতরাং ইহা রক্ষা করা প্রত্যেক জাতির কর্ত্তব্য। হিন্দুরও অকর্ত্তব্য নহে। জাতীয় গ্রন্থাবলী এই বিশেষত্বটাকে বজায় রাখিবার জন্য সমাজকে আনুকূল্য করে। যে গ্রন্থ সমগ্র সমাজ-হৃদয়কে স্পর্শ করে, যাহার প্রভাবে সকল লোকের হৃদয়-তন্ত্রী একসুরে বাজিয়া ওঠে, যাহা সমাজে শক্তি সঞ্চার করে, তাহা মহাগ্রন্থ।

এদেশে নিরক্ষর লোক বহুতর। আগে কথকতাপ্রভৃতি উপায়ে

তাহারা রামায়ণাদি মহাগ্রন্থ শুনিয়া শুনিয়া জাতীয় ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সুযোগ পাইত। এখন সেই সুবিধা পায় না। শিক্ষিতসম্প্রদায়ও এ বিষয়ে উদাসীন। জাতীয় মহাগ্রন্থ আমাদের হৃদয়-শোণিত, অত্যাজ্য। সুতরাং ইহা আমরা শুনিব শুনাইব, পড়িব পড়াইব। আবার, নানা ভাষায় নানা শ্রেণীর নানাগ্রন্থ রাশীকৃত রচিয়াছে। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য, জীবনবৃত্ত ও ইতিহাস সাধারণ পাঠকের অধ্যয়নযোগ্য। উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, দারোগা প্রভৃতি বিশেষজ্ঞেরও অপাঠ্য নহে।

প্রাচীন ভারতে জীবন-চরিতের বিশেষ অভাব ছিল, সুখের বিষয় এখন সে অভাব পূর্ণ হইতেছে। যে দেশে মহৎ ও সাধুলোকের সংখ্যা অধিক এবং জীবনবৃত্তের সংখ্যাও তত্তুল্য, সেই দেশ ধন্য। পুণ্য জীবন-চরিতের সংখ্যা যতই অধিক এবং জন সমাজে যত অধিক প্রচলিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। ইহাতে গুণীর সমাদর করা হয় এবং মহৎ চরিত্রের অনুকরণে নিজ নিজ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়া লোকসকল মহত্ত্বলাভ করিতে সমর্থ হয়।

মহাপুরুষের ন্যায় মহাগ্রন্থ অমর। ইহা প্রাচীন হইয়াও চিরনবীন। ইহাতে যে সকল মহাসত্য নিহিত থাকে, তাহা চিরশ্যামল, চিরপবিত্র। প্রাচীন হইয়াও প্রাচীন সমাজ-শরীরে নবপ্রাণ সঞ্চার করে। যে জাতির একখানিমাত্র মহাগ্রন্থ আছে, সে জাতি ধন্য। হিন্দুজাতি এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী। হিন্দুর ঋগ্বেদ আছে, রামায়ণ আছে, মহাভারত আছে। এইরূপ তিনখানি মহাগ্রন্থ অন্য কোন জাতিরই নাই। এই তিনের প্রত্যেক খানিই ইতিহাস, প্রত্যেক খানিই কাব্য, প্রত্যেক খানিই ধর্ম্মগ্রন্থ। ঐতিহাসিকের নিকট এই তিনই অতি আদরের বস্তু। কাব্যরসিক এই তিন গ্রন্থ পাঠে বিমল কাব্যামোদ ভোগ করিতে পারেন। এবং ধর্ম্মপিপাসু অমূল্য ধর্ম্মতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া কৃতকৃত্য

হইতে পারেন। এ হেন মহাগ্রন্থ আমাদের জীবনের প্রিয় সহচর হইলেই সৌভাগ্য। অন্যথা দুর্ভাগ্য। পরিতাপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ বাঙালীরই বিদ্যালয় ত্যাগের পর গ্রন্থের সহিত চির-বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। স্বাভাবিক আলস্য ও দুর্ব্বলতা ব্যতীত ইহার আরো কয়েকটী কারণ অনুমান করা যায়।

কোন দেশেরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একথা বলে না যে, আমরা ছাত্র-দিগকে সম্পূর্ণ বিদ্বান্ করিয়া দিতেছি, বরং ইহাই বলে যে, উহাদিগের জ্ঞানার্জ্জনশক্তি ও প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিতেছি মাত্র। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হই-লেই বিদ্যালয় কৃতার্থ। কিন্তু কোন কোন যুবক পাশ বা উপাধি পাইয়াই মনে করেন, আমরা বিদ্বান্ হইয়াছি। কত অসংখ্য লোকের উপাধি নাই, আমরা নিশ্চয়ই তাহাদের উপরে। আমরা তাহাদের চেয়ে বহুবিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছি। এই ভাবের সহিত প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে অবিনয় দেখা দেয়। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্"। বিদ্যা জন্মিলেই যে বিনয় আপনা হইতেই আসে, তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং বিদ্যা-দদাত্যবিনয়ম্। আজকাল বিদ্যায় অবিনয় জন্মাইয়া দেয়। শতেক নিরু-পাধি ব্যক্তির মধ্যে একজন উপাধিবিশিষ্ট লোক বিচরণ করিতে থাকিলে, তাহার মনে ··টা গর্ব্ব আসা অস্বাভাবিক নহে। তিনি তখন, "হংসমধ্যে বকো যথা", হংসসকলের মধ্যে বক না হইয়া, বকমধ্যে যথা হংসঃ, বকসকলের মধ্যে হংস, এরূপ বিবেচনা করেন। ধনের ন্যায় বিদ্যা অসংযমীর মনে মদ জন্মায়। অবিনয় ও বিদ্যামদ বিদ্যামোদে বিঘ্ন ঘটায়।

কেহ কেহ কিছু ইংরাজি শিখিয়া, দু চারি খানি ইংরাজি বই পড়িয়া, মনে করেন, বঙ্গভাষায় তাহাদের পড়িবার কিছুই নাই, সুতরাং বাঙ্গলা পুস্তক স্পর্শ করেন না। কিন্তু তাহারা জানেন যে, কোন সভ্যজাতিই

মাতৃভাষার অনাদর করেন না। কোন সমাজই মাতৃভাষায় উপেক্ষা করিয়া সভ্য হয় নাই।

চাকরি লাভই পাঠশালায় প্রবেশের মুখ্য উদ্দেশ্য। উপাধি লইয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইলে, নিরুপাধি উমেদারের অপেক্ষা যখন ভাল চাকরি জোটে, তখন তাহার মনে একটা আত্মপ্রসাদ জন্মে এবং মনে হয়, বিদ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্য এতদিনে সুসিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এখন আর পুস্তকের সঙ্গে বন্ধত্ব রাখা নিষ্প্রয়োজন।

যিনি যতটা পাশ বা উপাধি পাইয়াছেন, তিনিই সেই পরিমাণে বিদ্যা-পারদর্শী হইয়াছেন, এরূপ ধারণা নিজের ও সমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিলেই মঙ্গল।

জ্ঞানের সহিত বিনয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ। জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ একথার প্রমাণ। কবিকুল-তিলক কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিম্বদন্তী বলে,—কালিদাস বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিরেট লোক ছিলেন, কেবল সরস্বতীর বরে হঠাৎ কবি হইয়াছিলেন! কিন্তু আসল কথা এই যে, তিনি অশেষশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতকবি। তাঁহাতে অসামান্য কবিপ্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছিল।

ইংলণ্ডীয় সমাজে তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ মনীষী নিউটনের বিনয়ের কথা, গ্রন্থে, গুরুশিষ্যমুখে অনেক শুনা যায়। নিউটন সমগ্র জীবনের অসাধারণ জ্ঞানরাশি লইয়া মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "অপার জ্ঞানসমুদ্র পুরোভাগে বর্ত্তমান, আমি তীরে থাকিয়া কয়েকটী বালুকা সংগ্রহ করিয়াছিমাত্র।"

গ্রীশদেশের ঋষিতুল্য মনস্বী সক্রেটিস্ বিনয়ের অবতার ছিলেন। এক

দিন ডেলফির দেবমন্দিরে দৈববাণী হইল যে, সক্রেটিস্ গ্রীশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী। তাঁহার শিষ্যগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে এই সংবাদ দিলেন। দেবতা ও দৈববাণীতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ কেমন করিয়া সম্ভবে? আমি যে অল্পজ্ঞ, আমি কি জানি? অনেক পণ্ডিতই ত আমাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী। দৈববাণী পরীক্ষার জন্য তিনি এথেন্সের বড় বড় পণ্ডিতদিগের নিকট যাইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। আলাপ করিয়া বুঝিলেন, ইঁহারা কেহই নিজের মূর্খতা বোঝেন না। সক্রেটিস্ কিন্তু নিজের অজ্ঞতা বিলক্ষণ বুঝিতেন। এই হিসাবে তিনি দৈববাণী অভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

ক্ষমতা পাইলে অনেক যুবক উদ্ধত, অবিনয়ী হয়। কিন্তু প্রভুত্ব, ধন, মান বা জ্ঞান মহাত্মাদিগের স্বাভাবিক বিনয়কে শতগুণে বর্দ্ধিত করে।

জাপানের নৌ-সেনাপতি আডমিরাল টোগো যিনি গত রুশজাপ যুদ্ধে অসামান্য রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, তিনি অতি মধুরভাষী, বিনয়ের আধার।

বস্তুতঃ যিনিই জ্ঞানসমুদ্রে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই ইহার বিশালতা ও গভীরতা অনুভব করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। তখন তাঁহার মনে হয়, আমি কি জানি? এই বিশাল বিশ্ব সমুদ্রের একটী তরঙ্গ, একটা বুদ্‌বুদের জ্ঞানও ত আমার নাই। আবার মনীষী-দিগের রচিত গ্রন্থনিচয়ও একথারই পোষকতা করে। একখানি গ্রন্থ পড়িলেই মনে হয় কত পড়িবার ও শিখিবার আছে, আমি কি শিখি-য়াছি, কি জানি? কত অসংখ্য পুস্তক অপঠিত রহিয়াছে, যাহা না পড়িলে বুঝি মূর্খত্বই ঘোচে না। শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞান-সমুদ্র অনন্ত, সান্ত মানবের সাধ্য কি তাহার অন্ত পায়? ভগবদ্‌বিরচিত বিশ্বগ্রন্থ ছাড়িয়া দিয়া, কেবল মনুষ্যপ্রণীত গ্রন্থরাশির অধ্যয়নে সমগ্র সুদীর্ঘ জীবন যাপন

করিলেও সেই গ্রন্থরাশির অতি অল্পাংশমাত্রই শিক্ষা করা যাইতে পারে। স্কুল কলেজের নির্দ্দিষ্ট কয়েকখানি পুস্তকের অংশবিশেষ, পাঁচ সাত বৎসর পড়িয়া কোন মেধাবী যুবকও পাণ্ডিত্যলাভে সমর্থ নহে। একথা মনে থাকিলে কেহই জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইতে পারে না।

পড়া ও পরীক্ষার চাপে বাল্যকালেই অনেকের মানসিক বৃত্তিগুলি সতেজ না হইয়া নিস্তেজ, পুষ্ট না হইয়া পিষ্ট হইতে থাকে। অবশেষে তাহারা যৌবনকালে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া অবসন্ন, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কালযাপন করে। পুঁথির খবর লইবার না থাকে রুচি, না থাকে অবসর। রুচি থাকিলেও কেহ কেহ অর্থের অভাবে গ্রন্থের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া থাকেন। তাহাদের "অন্নচিন্তা চমৎকারা।" তাহারা অন্নচিন্তায় চারিদিক্ অন্ধকার দেখে।

কোন বস্তু বা বিষয়ের মধুর স্বাদ পাইলে, লোকে তাহা সহজে ছাড়িতে চায় না। গ্রন্থাধ্যয়নের একটা রস না পাইলে শিক্ষার্থীদিগের উহাতে আন্তরিক বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণা জন্মে। কেবল প্রয়োজনের খাতিরে বিদ্যালয়ে থাকাকালীন উহারা নিতান্ত বাধ্য হইয়া পুস্তকগুলির কিছু খাতির করিয়া থাকে। আপাততঃ কার্য্যসিদ্ধি হইলে আর খাতির করিবে কেন? উহারা তখন 'খাতির নাদারৎ'। বেকন (Bacon) বলিয়াছেন—"To spend too much time in studies is sloth" ইহারাও বুঝি সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন,—অধ্যয়নে অধিক সময় ক্ষেপন করা অন্যায়, ইহাতে অলসতা বৃদ্ধি পায়।

গ্রন্থ অধ্যয়নের অন্যতম ফল, স্বাধীনচিন্তার উদ্বোধন। পরের মুখে অন্ন চাখিলে কোন ফল নাই। পরের সুচিন্তা, পরের সদ্ভাবগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিলে লাভ আছে। গ্রন্থের সাহায্যে নিজের চিন্তাশক্তির উন্মেষ ও হৃদয়স্থ ভাবগুলিকে নির্ম্মল-উজ্জ্বল

করিতে পারিলেই গ্রন্থাধ্যয়ন সার্থক। কিন্তু অনেকেই স্বাধীনচিন্তায় বঞ্চিত। আমরা সকল বিষয়েই অল্পে তুষ্ট। কিন্তু "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"। অল্পজলের সফরীমৎস্য নিশ্চয়ই অনুপাদেয়, শ্লেষ্মাকারক। পক্ষান্তরে, অগাধজলের রোহিতমৎস্যের মস্তক কেমন উপাদেয় ও উপকারক। বাস্তবিক সদ্‌বিদ্বান্ সমাজের পরম হিতকারী। অল্পবিদ্যা তেমনি অপকারী। 'বিদ্যা কামদুঘা ধেনুঃ''। বিদ্যা কামধেনু। ইহার নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার নিকট না চাই ধর্ম্ম, না চাই চরিত্র, না চাই মোক্ষ। চাই কিঞ্চিৎ অর্থ। ইহাতেই আমরা হৃষ্ট।

বাঙালীর চরণ আছে, চলন নাই; নয়ন আছে দর্শন নাই; মস্তিষ্ক আছে, আবিষ্কার নাই। বাঙালী ছাত্র প্রতীচ্য সভ্যজাতির সহিত প্রতিযোগী পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া মস্তিষ্ক ও অধ্যয়নক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আর তুল্যযোগিতা রক্ষা করিতে পারেন না। ইদানীং যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার কোন্‌টীতে বাঙালীর কৃতিত্ব? দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে কিছুতেই নয়। অবশ্য শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র কৃতিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বাঙালীর গৌরব, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক কয়জন?

পাদচারণে যেমন পদশক্তি বাড়ে, সেইরূপ নিজের চক্ষে বস্তু পর্য্যবেক্ষণে ও পরীক্ষণে দর্শন ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি পায়। পরকীয়চিন্তাপ্রসূত গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ এ বিষয়ে সহায়মাত্র।

কেহ কেহ বলেন,—মুমূর্ষুদশায় উপনীত স্থবিরের নিকট আমরা যেমন বড় একটা প্রত্যাশা করিতে পারি না, সেইরূপ স্থিতিশীল প্রাচীনসম্প্রদায়ের নিকট আমাদের কোন আশা নাই। তাঁহারা প্রাচীনতা লইয়া বিব্রত।

তাঁহারা, "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী", শাস্ত্রের জ্ঞান অপেক্ষাও আবৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া আবৃত্তিতেই সন্তুষ্ট। তত্ত্বানুসন্ধানে নিশ্চেষ্ট। নব্যসম্প্রদায়ের উপরই সমাজের আশা ভরসা। কিন্তু ইহারাও যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কেবল পাঠ্যতালিকা-নির্দ্দিষ্ট পুস্তক কয়খানির সহিত সংস্রব রাখিয়া, 'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী', এই ভাবই প্রদর্শন করেন, কেবল আবৃত্তিকেই সার বলিয়া বোঝেন, তখন কোন্ সহৃদয় সামাজিকের মনে আঘাত না লাগে? অবশ্য অর্থ বুঝিয়া, মর্ম্মজ্ঞ হইয়া আবৃত্তি করা যে উত্তম, তাহা কে অস্বীকার করিবে? শঙ্করাচার্য্য যেমন সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, তেমনি অর্থগ্রহণেও অলৌকিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন! ইহা অতীব প্রশংসার কথা।

বিনা দোষে বন্ধুত্যাগ যেমন বন্ধুর অকর্ত্তব্য, গ্রন্থত্যাগও তেমনি নির্ব্বোধের কর্ম্ম। 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ' বন্ধুবিয়োগ বন্ধুর অসহ্য। গ্রন্থকে যদি আমরা যথার্থই বন্ধু বলিয়া মনে করি, তবে তাহাকে নিজে ইচ্ছা করিয়া কোন্ প্রাণে বিদায় দিতে পারি? যে বন্ধু আমাদের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছে, এবং সর্ব্বদাই করিতে প্রস্তুত, তাহার অনাদর করা কৃতঘ্নতা। যে গ্রন্থ আমার অন্ন সংস্থানের উপায় করিয়া দিয়াছে, যার প্রসাদে আমি চাকরি পাইয়া টাকার মুখ দেখিতে পাইতেছি, সুখের দিন আসিতেই যদি সেই উপকারী বন্ধুকে একেবারে ভুলিয়া যাই, তবে সে রাগ করিয়া বলিতে পারে—'যার প্রসাদে রামের মা, তারে তুমি চিন্‌লে না'। তুমি অকৃতজ্ঞ, আর তোমার উপকার করিব না।

গ্রন্থের সহিত চিরকাল বন্ধুত্ব রক্ষা করা বিজ্ঞের কার্য্য। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই নিজের একটী পুস্তকাগার থাকা আবশ্যক। গ্রন্থহীন গৃহ আর আত্মাশূন্য দেহ উভয়ই তুল্য। সদ্‌গ্রন্থরাশি মানসিক ও আধ্যাত্মিক

সুখাদ্যের ভাণ্ডার। ইহারা মনের ও আত্মার খাদ্য যোগায়। শরীর-পোষণের জন্য অন্নজলাদি ভৌতিক দ্রব্যের ন্যায়, মন ও আত্মার পুষ্টির জন্য খাদ্যবিশেষের একান্ত প্রয়োজন। আমরা অন্নগতপ্রাণ। বিনা অন্নে প্রাণ বাঁচে না। ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ অন্নই প্রাণদ। এই ত্রিবিধ অন্নের জন্য অর্থব্যয় অপব্যয় নহে, সদ্ব্যয়। মাসিক আয়ের অনুপাত অনুসারে অন্নবস্ত্রাদির সঙ্গে সঙ্গে মাসে মাসে পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা করা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য। যখন যখন আমাদের পড়িবার সখ হয়, তখনই হয়ত পরের নিকট হইতে পুস্তক আনিয়া সখ মিটাই। কিন্তু পরের পোষাক বা পরের পুস্তক ধার করিয়া কেবল ঠেকা কাজ চালাইতে পারা যায়, সর্ব্বদার কাজ চলে না। পুস্তকই হউক, আর পোষাকই হউক, ধার করা ভদ্রলোকের পক্ষে লজ্জার কথাও বটে। অতি বড় পুস্তকালয় (Library) করিতে না পারিলেও অতি উত্তম কতিপয় বাছা বাছা পুস্তক কিনিয়া নিজ সম্পত্তি করিয়া রাখা এবং সেই সম্পত্তি ভোগ করা উচিত। কেবল আলমিরার শোভার্থ পুস্তক রাখিলে চলিবে না। ভোগ করা চাই। আড়ম্বরপ্রিয় অলস ধনীরা কেবল 'নামকা ওয়াস্তে,' নামের জন্য লাইব্রেরি সাজাইতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানার্থীর পক্ষে এরূপ করা শোভা পায় না।

চিরজীবন অধ্যয়নশীল হইতে হইবে বটে, কিন্তু গ্রন্থকীট হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। অমিতভোজনে উদরের, অতি অধ্যয়নে মস্তিষ্কের অজীর্ণ-রোগ জন্মে! সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙালীর মধ্যে গ্রন্থকীটের সংখ্যা স্বল্পমাত্র। গ্রন্থকীটত্ব স্বল্পকালস্থায়ী। যতদিন বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থা ততদিনমাত্র। ছাত্রদিগের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষায় উদাসীন থাকিয়া বা স্বাস্থ্যনাশ করিয়া পরীক্ষাপাশের জন্য 'ছাত্রানা মধ্যয়নং তপঃ,' অধ্যয়নই ছাত্রদিগের তপস্যা, এই বাক্যপালন করিতে যত্নশীল।

কিন্তু এইরূপ অধ্যয়নকে তপস্যা বলা যায় না। অধ্যয়ন অর্থে মন ও মস্তিষ্কের শক্তি বর্দ্ধন, শক্তির বিলোপসাধন নহে।

অপরাপর কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করিয়া সারাদিন কেবল পুস্তক লইয়া থাকা অন্যায় বটে, কিন্তু সদ্‌গ্রন্থ পাঠে দিবসে অন্ততঃ দুইঘণ্টাকাল কর্ত্তন করা সময়ের অপব্যবহার নহে। গৃহে রুদ্ধবায়ুর ন্যায় সংসারে আবদ্ধ মন দূষিত হইতে থাকে। আমরা যে সংসার-ঘর বাঁধিয়াছি, যার চারিদিকে শক্ত বেড়া দিয়া রাখিয়াছি, সদ্‌গ্রন্থ সেই ঘরের জানালা-কবাট খুলিয়া দেয়। তৈলতণ্ডুলচিন্তাকুল, বদ্ধ আবিল মন তখন মুক্তগগনে বিচরণ করিয়া শুদ্ধ হয়, স্বস্তি পায়।

প্রতিদিন ধনার্জ্জন, প্রতিদিন পুণ্যসঞ্চয়ন; প্রতিদিন জ্ঞানার্জ্জন, প্রতিদিন বিতরণ গৃহীর কর্ত্তব্য। প্রতিদিন ক্ষুধা জন্মে, প্রতিদিনই খাইতে হয়। ক্ষুধা না জন্মিলে, শরীর-যন্ত্রে গোলযোগ ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে। সেইরূপ প্রতিদিন মনের ও আত্মার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া এবং প্রতিদিন ক্ষুধার নিবৃত্তি করা আবশ্যক। ক্ষুধা না জন্মিলে উহারা প্রকৃতিস্থ নাই, বুঝিতে হইবে।

প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে, উপনিষৎ, গীতা বা তদ্রূপ অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ শুচি-শান্ত-মনে, ভক্তিভাবে পাঠ করা গৃহীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ভগবৎ-কৃপায় যাঁহার এমন শুভমুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন তিনি ভগবানের মঙ্গলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুলকিত, পবিত্র হন, তখন আর তাঁহার গ্রন্থের প্রয়োজন থাকে না। দিবালোকে দীপালোক নিরর্থক।

কি লক্ষ্য মহান্? ভূমা ভগবান্। তীর্থের তীর্থ, সাধুর সাধু, বিশ্ববন্ধু ভগবানের সঙ্গলাভ করাই মানবজীবনের মহান্ লক্ষ্য। সেই মহাসাধুর সঙ্গলাভ করিতে পারিলেই গ্রন্থপাঠ সম্পূর্ণ সার্থক। জীবন সার্থক।

কি শিখিব ?

শিখিব আমরা—উত্তমপুস্তক পড়িয়া, উত্তমপুরুষের সঙ্গে থাকিয়া, পুরুষোত্তমের সঙ্গলাভ করিতে।

ইচ্ছা।

---✲---

"তৎ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়।"

"তৎ তেজঃ অসৃজত"। শ্রুতি।

"And God said—

"Let there be light, and there was light."

(Bible.)

নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন,—আমি বহু হইব, জগৎ গড়িব। অমনি আকাশ-আলোক-জল জন্মিল, জগৎ রচিত হইল। কার্য্য (effect)—জগৎ, কারণ(cause)—ভগবানের কামনা। আমরা তাঁহারই ইচ্ছায় ইচ্ছা পাইয়াছি। আমাদেরও কৃত কার্য্যের কারণ আমাদের ইচ্ছা। ইচ্ছা ব্যতীত কার্য্য হয় না, জগৎ রক্ষা হয় না। তাই বুঝি ভগবান্ মানবকেও ইচ্ছা দিয়াছেন। এই ইচ্ছা লইয়া মানব কর্ম্মে ব্যাপৃত, কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া, উন্নত, সভ্য ও সুখী। ইচ্ছা বর্ষাকালীন নদী-স্রোতের ন্যায় বেগবতী না হইলে, মহৎকার্য্য সম্পাদন হয় না। কুইচ্ছা পরিহারপূর্ব্বক সুইচ্ছা জাগাইয়া তাহাকে বড় করিতে পারিলেই মহৎ-

কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মরজগতে মরদেহ লইয়া অমরত্বলাভ করিব, এইরূপ একটা জীবনব্যাপিনী মহতী ইচ্ছা জাগিলে লোকে মহত্ত্ব ও অমরত্ব লাভের অধিকারী হইয়া থাকে।

বাষ্প যেমন বাষ্পীয়যানে, ইচ্ছাও সেইরূপ জড়দেহে গতি দান করে। ইচ্ছাই কর্ম্মের প্রসূতি। আমাদের ইচ্ছা ক্ষুদ্র, খণ্ডীকৃত, অল্পেই লূতাতন্তুর ন্যায় ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাতে বেগ নাই, বল নাই। লূতা-তন্তুর ন্যায় ক্ষীণ ও ক্ষণভঙ্গুর ইচ্ছা লইয়া কাজের মতন কাজ কিছুই করা যায় না। ক্ষুদ্র, ক্ষীণ বাসনার ফলে কেবল পশুপক্ষ্যাদির ন্যায় পান-ভোজনে লোক নিযুক্ত থাকে। ইহাতে মনুষ্যজীবন সফলতালাভ করিতে পারে না। সাধু উন্নত ইচ্ছাই মানুষের বিশেষত্ব ও বিশেষ স্বত্ব।

ইচ্ছার শক্তি ও প্রভাব অসীম। যেখানে ইহার বেগবল নাই, সেখানে মহৎ কর্ম্মোদ্যম নাই, অধ্যবসায় নাই; সেখানে আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা, কর্ত্তব্যের অনাদর, উপেক্ষা।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে চাণক্যপণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন। জীবনে তাঁহার সর্ব্বপ্রধানকার্য্য—নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন। নন্দরাজকর্ত্তৃক নিজকে অপমানিত মনে করিয়া তিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন,—যে উপায়েই হউক, এ অপমানের প্রতিশোধ লইতেই হইবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অন্তর প্রতিহিংসানলে দিবনিশি জ্বলিতেছিল। প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, এই কথাই কেবল তাঁহার মনে অনুদিন জাগিতে লাগিল। তিনি উক্ত রাজকুলের বিলোপ করিবার দুর্জ্জয় বাসনা লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই তাঁহার কামনা-সাধনা, ইহাই তাঁহার জপতপ, মন্ত্রতন্ত্র। অবশেষে কার্য্যসিদ্ধি। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশ ধ্বংস করিয়া সেই স্থলে নূতন রাজবংশের পত্তন করিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। তখন

কৃতকার্য্য চাণক্য বোধ হয় সগর্ব্বে সানন্দে মনে মনে বলিয়াছিলেন, জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। ইচ্ছার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

অবশ্য এ হেন পরাপকারিণী ইচ্ছা আদৌ প্রশংসনীয় নহে। কিন্তু ইচ্ছার কত শক্তি তাহা প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য।

ফ্রান্সদেশের অক্লান্তকর্ম্মা বার্ণার্ড পেলিসি সামান্য কাচব্যবসায়ীর পুত্র। অর্থাভাবপ্রযুক্ত তিনি বাল্যকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি অর্থের জন্য বিদেশে নানাস্থানে প্রায় দশবৎসরকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে বিবাহ করিয়া সামান্য ব্যবসা অবলম্বনে কোন প্রকারে দিন যাপন করিতেছিলেন। একদা দৈবাৎ একটী এনামেলের বাসন দেখিয়া, তাঁহার মনে ঐ প্রকার বাসন প্রস্তুত করিবার বাসনা জাগিল। ইটালীতে বহু কালপূর্ব্বে এনামেলের বাসন তৈয়ার হইত। কিন্তু কালে তাহা লুপ্ত হয়। কিপ্রকারে তৈয়ার করিতে হয়, কেহই জানে না। তিনি নিজেই ভাবিয়া চিন্তিয়া একরকম মসলা প্রস্তুত করিলেন এবং মাটীর পাত্রে তাহা লেপন করিয়া আগুনে জ্বাল দিয়া পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু চেষ্টায় কোন ফল হইল না। এখন ভিন্ন প্রকারের মসলা প্রস্তুত করিয়া আবার পরীক্ষা করিলেন। এবারও চেষ্টা নিষ্ফল। বার বার চেষ্টা, বার বার নিষ্ফলতা। কিন্তু পেলিসি ভগ্নোদ্যম হইলেন না। এনামেল পরীক্ষায় বিরত হইলেন না। এনামেলই তাঁহার জ্ঞান-ধ্যান। নিজ ব্যবসায়ের কাজ একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। অর্থ উপার্জ্জনে আর তাঁহার মন নাই। পরিবারে দারিদ্র্যের উপর দারিদ্র্য উপস্থিত। স্ত্রী পুত্রের দুঃখ দুর্গতিতে, কাতর বিনয়ানুনয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি টাকা ব্যয় করিয়া কেবল এক মসলার পরিবর্ত্তে অন্য মসলা প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করেন! কতবার জ্বাল দিলেন, কত কাষ্ঠ জ্বালাইয়া ভস্ম করি-

লেন। কিছুতেই মসলা গলে না। স্ত্রীপুত্রের কাতর ক্রন্দনেও তাঁহার মন গলে না। প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করিয়া আনিলেন। তাহারও অনেকটা এনামেলের পরীক্ষায় ব্যয় করিলেন। এইরূপে অতি কষ্টে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে ভয়ানক অর্থকৃচ্ছ উপস্থিত হইল। এবার পেলিসি একেবারেই রিক্তহস্ত হইয়া পড়িলেন। মসলার উপকরণ, কাষ্ঠ ও মৃৎপাত্র খরিদ করিবার টাকা নাই। কিন্তু পেলিসি দমিবার লোক ছিলেন না। নিজেই বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিতেন। নিজেই মাটীর পাত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেন। টাকা নাই, পেলিসিরও চেষ্টার বিরাম নাই। আবার দ্বিগুণ উৎসাহে একদিন, দুইদিন করিয়া ছয়দিন ছয়রাত্রি অবিরত এনামেলের মসলা জ্বাল হইল তথাপি তাহা গলে না। যাহা কিছু কাষ্ঠ ছিল, সব ফুরাইয়া গেল। আর কিছুকাল জ্বাল হইলেই এনামেল হইবে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পেলিসি ঘরের যত কাঠের আসবাব আনিয়া চুল্লীমুখে দিতে লাগিলেন। তখন তাহার স্ত্রীপুত্র ঘরের বাহির হইয়া ছুটিয়া আসিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল, "হায়! হায়! পেলিসি পাগল হইয়াছে, পেলিসি পাগল হইয়াছে।" অবশেষে ভগবানের ইচ্ছায় পেলিসির সুদিন আসিল। তিনি কৃতকার্য্য হইয়া মনের আনন্দে এনামেল তৈয়ার করিতে লাগিলেন। এই বাসন-বিক্রয়লব্ধ অর্থে অর্থবান্ হইয়া দেশমান্য হইলেন। পেলিসির সিদ্ধির মূলে একান্ত ইচ্ছা বা মত্ততা। অদ্যাপি পৃথিবীর নানাদেশে ঘরে ঘরে এনামেলের বাসন নীরবে ইচ্ছার জয় ঘোষণা করিতেছে।

বিদ্যাসাগরের জীবন জয়শ্রীমণ্ডিত। তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রবল-ইচ্ছা, সুতরাং সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়। পাঠদশায় তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাই তিনি সকল

পরীক্ষায় সকলের উপরে থাকিতেন। ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যে নানা-প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়াও প্রথমস্থান অধিকার করিতেন। কেহ তাঁহার উপরে থাকিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। বাল্য-কালে যে ইচ্ছা, উত্তরকালেও সেই ইচ্ছাই তাঁহাকে সামাজিকজীবনে বাঙালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল। পরোপকারই তাঁহার পবিত্রজীবনের মহাব্রত। উপচিকীর্ষা তাঁহার স্বভাব। "তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।" বিধাতা বুঝি তাঁহাকে ক্ষিতি-অপ্‌-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চভূতের ষোল আনা প্রকৃতি দিয়া গড়িয়াছিলেন। বস্তুত: এই বলবতী উপচিকীর্ষাই তদীয় সমুদয় কর্ম্মে বল ও সৌষ্ঠব প্রদান করিয়াছিল। মনের বলে, ইচ্ছার বলে, শরীরে প্রচুর বল আসে। তিনি তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য ৩০ ক্রোশ পথ হাটিয়া গিয়াছিলেন ও তৎপরদিবস কলিকাতায় অক্লেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার দেহে এত সামর্থ্য দিল কে? বর্ষাকালীন খরস্রোতা দামোদর নদী সন্তরণে পার হইবার শক্তি কে দিয়াছিল? তাঁহার অদ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ মেট্রপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে কি বর্ত্তমান? বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকাতরে স্বোপার্জ্জিত অর্থরাশি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় বর্ষণ করিয়া-ছিলেন। তাহার মূল কোথায়? সর্ব্বত্রই দেখা যায়, পরোপকারের বলবতী অব্যাহত ইচ্ছা বর্ত্তমান। এই ইচ্ছা-বেগের নিকট নদীস্রোতোবেগ পরাজিত। বিদ্যাসাগরের চাকরি ত্যাগ প্রবলইচ্ছার প্রকৃষ্ট ফল। চাকরি ছাড়িলে কিসে অন্ন সংস্থান হইবে, সে বিষয়ে ধনদরিদ্র ব্রাহ্মণতনয়ের দৃক্‌পাত নাই। আর চাকরি করিব না বলিয়া যে ইচ্ছার উদয় হইল, তাহা আর কিছুতেই টলিল না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার ন্যায় অচল অটল। সেই জন্যই তিনি সংসারক্ষেত্রে সিদ্ধপুরুষ।

গ্রীশদেশের মনস্বী ডিমস্থিনিস্ তোত্‌লা হইয়াও অসামান্য বাগ্মিতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, কেন? উত্তর—তাঁহার অদম্য ইচ্ছা। তিনি প্রথমবারের বক্তৃতায় অকৃতকার্য্য, উপহসিত হইয়া শ্রেষ্ঠ বক্তা হইবার দুর্জ্জয় বাসনা মনে মনে পোষণ করিয়া নির্জ্জনে সাধনা করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ সাধনার পর তাঁহার রসনায় বাগেদবীর অধিষ্ঠান হইল। তিনি বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বলিয়া এথেন্সে, গ্রীসে, সমগ্র সভ্যসমাজে অদ্যাপি সম্মানিত। ইচ্ছার বলে প্রকৃতি পরাজিত, স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়বৈকল্য পরাহত।

ইংলণ্ডের জনহিতৈষী মহামনা জন হাউয়ার্ড জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, কয়েদীদিগের দুঃখদুর্গতি দূর করিবার বলবতী বাসনা লইয়া।

রুষিয়ার সম্রাট্ মহাত্মা পিটার (Peter the Great) রুষজাতির প্রতিষ্ঠা অথবা জাতীয় জীবনে নবজীবন সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, প্রকৃত উন্নতির পথে প্রকৃতিপুঞ্জকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা লইয়া স্বরাজ্যমধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতা বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে রাজা হইয়া নিজে দূরদেশে জাহাজ নির্ম্মাণকার্য্য শিখিতে গিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিয়া এত কায়িক ক্লেশ সহিয়াছিলেন, এত সামান্য, ক্ষুদ্র কর্ম্মে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই তিনি বড় হইয়াছেন, অমর হইয়াছেন।

বাবরের মৃত্যু একটী আশ্চর্য্য ঘটনা। হুমায়ুন যখন অত্যন্ত কঠিন-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, যখন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না, তখন বাবর প্রিয়পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পুত্রের আরোগ্য-ভাবনা তাঁহার মনকে ষোল আনা দখল করিয়া বসিল। তিনি তন্ময়চিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—প্রভো! আমার প্রাণ নিয়' ত্রর প্রাণ রক্ষা কর, পুত্রকে বাঁচাইয়া দাও।

ইহার পর হইতেই বাবর দিন দিন রুগ্ন-দুর্ব্বল, হুমায়ুন সুস্থ-সবল হইতে লাগিলেন। অবশেষে বাবর অমরধামে চলিয়া গেলেন, হুমায়ুন বাঁচিয়া উঠিলেন। ইহার রহস্য কি? রহস্য—ইচ্ছাশক্তি (Will-force).

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। যে, যে রকম ভাবনা করে, তার সেই রকম সিদ্ধিলাভ হয়।

সরল আন্তরিক প্রার্থনা ভগবানের নিকট গিয়া পঁহুছে, ভক্তের এই কথা যে সত্য, তার প্রমাণ এই ঘটনায় আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই।

ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুতেও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না কি?

যে সকল মহামনা মানব ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যে সকল উন্নত পুরুষ মনুষ্যসমাজে বিচরণ করিয়া কৃতকৃত্য ও যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উন্নত ও মঙ্গলইচ্ছা আজীবন পোষণ করিতেন। তদীয় কর্ম্মপরম্পরা ইচ্ছার মহিমা ঘোষণা করিয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

মনুষ্যমাত্রই স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে ঈদৃশ যে কোন মহাশয় ব্যক্তির আদর্শে তদীয় সদিচ্ছার অনুকরণে সুদীর্ঘ-সবল ইচ্ছা লইয়া উন্নত হইতে পারে। পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণআদর্শ হইলেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ আদর্শ ধরিতে পারে, এরূপ লোক জগতে বিরল। সাধারণ মানুষের আদর্শ —মানুষ। আমাদের মধ্যে আদর্শ-চরিত্রের নিতান্ত অভাব নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের অনুকরণ করিতে আমরা শিখি নাই। বিদ্যাসাগরকে কয়জন বাঙালী আদর্শ ধরিতে পারিয়াছেন?

সতী ভার্য্যার ন্যায় সদিচ্ছা আমাদের পরম হিতকারিণী। 'সতীনারীর পতি পর্ব্বতের চূড়া'। সতী, পতিকে অতি উচ্চ আসন দিয়া থাকেন। পতি দরিদ্র, অবিদ্বান্ যেরূপই হউন না কেন, অন্যে তাহাকে যেরূপই

মনে করুন না কেন, সতীর কাছে তিনি দেবতা। সেইরূপ যিনি সতী-ইচ্ছার কর্ত্তা অর্থাৎ সর্ব্বদাই সৎ-ইচ্ছা পোষণ করেন, সেই ইচ্ছার মহিমায় তিনি নিশ্চয়ই উচ্চ আসনে সমাসীন থাকেন।

জাতিগত ও ব্যক্তিগত উন্নতির মূলে ইচ্ছার উন্নতি। ইচ্ছাকে দীর্ঘায়ত না করিলে আমরা খর্ব্ব হইয়াই থাকিব। ইহাকে বড় করিতে না পারিলে আমরা বড় হইতে পারিব না। চরিত্রকে গড়িয়া তোলা, জীবনকে পতিত-মর্দ্দিন বা উন্নতউজ্জ্বল করা, জ্ঞানী বা মূর্খ, মনুষ্য বা পশু, বদ্ধ বা মুক্ত হওয়া, আমাদের ইচ্ছাধীন। সুখ দুঃখ আমাদের চেষ্টাধীন। কিন্তু একথা কি সত্য? সুখ সকলেই চায়, কেহ দুঃখ চায় না, তবে কাহারো সুখ, কাহারো দুঃখ হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, সুখ চাহিয়া দুঃখ পায় যাহারা, তাহারা মুখে মুখে সুখ চায়, প্রাণের সহিত চায় না, তাহাদের ইচ্ছায় প্রাণ নাই। প্রাণহীন, মৃত ইচ্ছা কর্ম্ম জন্মাইতে পারে না, কর্ম্মাভাবে সুখাভাব, দুঃখ। জাতমাত্র মৃতসন্তানবৎ জাতমাত্র অপগত ইচ্ছা নিষ্ফল, দুঃখদায়ক।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন মানুষের সুখদুঃখ দৈবাধীন বা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। 'ইচল বলিয়ে অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে'। 'Man proposes God disposes.' মানুষ ভাবে একরকম, হয় অন্যরকম, একে আর হয়। বাস্তবিক ইহা ভগবানের পরীক্ষা। সংসারে বার বার এইরূপ পরীক্ষা হইয়া থাকে। প্রথম বারের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়াতে যদি ইচ্ছা চলিয়া যায়, তবে তাহা কোন ফল প্রসব করিতে পারে না। অবিচ্ছিন্ন ইচ্ছা লইয়া সকল কঠোর পরীক্ষায় অচলবৎ অটল থাকিলে, ভগবান্ অবশেষে মানুষের সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তখন তিনি ও জগৎ সেই ইচ্ছার জয়দর্শনে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া থাকেন। অবশ্য আমরা দেখিতে পাই যে, 'হাতীরও পিছলে পাও, সুজনেরও ডোবে

নাও'। দৈবাং হাতী পা পিছলিয়া পড়িয়া যাইতে পারে, তা বলিয়া কি হাতী আর উঠিয়া চলিবে না? সুজনেরও নৌকা ডুবিতে পারে, আরব্ধ কর্ম্ম একবার পণ্ড হইতে পারে, তা হইলেই কি আর তিনি মহৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন না, আর কি তিনি নৌকা চালান দিবেন না? শিশু শত আছাড়-আঘাত পাইয়া হাটিতে শিখে। সংসারভূমে হাটিতে গেলেই আছাড়-আঘাত অনিবার্য্য।

একমাত্র চন্দ্র গগনে উদিত হইয়া নৈশ অন্ধকার দূর করে, শত শত তারা তাহা পারে না। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছা লইয়া মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না, একটীমাত্র গগনস্পর্শী ইচ্ছার বলে তাহা পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছা আমাদিগকে ক্ষুদ্রতাজালে আবদ্ধ রাখে।

আমরা ইচ্ছার অভাবে অক্ষম, নিরুপায়। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়। "Where there is will, there is way"। একথা আবালবৃদ্ধ ইংরেজিজ্ঞ সকলেই জানে, কিন্তু বলবতী স্থায়ী ইচ্ছাই আমাদের জন্মে না। আমাদের ইচ্ছা পারদের ন্যায় চঞ্চল; জলবুদ্‌দের ন্যায় উঠে আর লয় পায়।

ক্ষুদ্র ইচ্ছা, শক্তি জন্মাইতে পারে না। আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্বের অত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হয়। ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করা একটা প্রধান কর্ম্ম। ইহা জাগিলে ব্যক্তিত্ব আপনিই ফুটিয়া উঠিবে।

'অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি'। শতবার ধৌত করিলেও অঙ্গারের কালিমা দূর হয় না। কু অভ্যাস একবার দৃঢ়মূল হইলে, শত চেষ্টায়ও তাহা দূর করা সুকঠিন হয়; সুতরাং শৈশবকালে বালক বালিকার মনে সৎ ও মহৎ ইচ্ছার বীজ পুষ্ট ও অঙ্কুরিত করা জনক-জননীর অবশ্যকর্ত্তব্য। উহাদিগের ইচ্ছাবৃত্তিকে সংযমিত রাখিতে হইবে, কিন্তু ইচ্ছার উচ্ছেদ করিতে হইবে না। প্রত্যুত

যাহাতে মহৎ ও সুইচ্ছা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার সদুপায় বিধান করা আবশ্যক। এ দেশে সচরাচর লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়, 'কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধিঃ।' কর্ম্মেই বুদ্ধিকে চালায়, পূর্ব্বজন্মে যেরূপ কর্ম্ম করা হইয়াছে, তদনুসারেই এ জন্মে লোকের বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। যাহারা পূর্ব্বজন্ম মানেন না, তাঁহাদের একথায় আপত্তি আছে; কিন্তু ইচ্ছানুসারি কর্ম্ম, 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

যদি ইচ্ছাকে বরণ করিতে হয়, তবে বড় ইচ্ছাকেই বরণ করিব। ছোট ইচ্ছাকে কেন? যদি জন্তু শিকার করিতেই হয়, তবে হাতী শিকারই করিব। এ কার্য্যে যথেষ্ট পৌরুষ ও লাভ আছে। শত শত মাছি শিকারে কি ফল? মাছি মারিলে হাত কেবল কালই হয়। এই পৃথিবীতে অনেক জ্ঞান ও সুখের ভাণ্ডার রহিয়াছে, তাহা অধিকার করিতে চেষ্টা করিব। অল্পজ্ঞানে, অল্পসুখে কেন সন্তুষ্ট থাকিব?

ইচ্ছা বড় হইতে হইতে এতই বড় হইতে পারে যে, তখন আর এই জড়া পৃথিবী ইহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে ইহার স্থান হয় না; তখন সে অনন্ত চিন্ময়রাজ্যে ছুটিয়া যায়। তখন পার্থিব রসে আর তাহার তৃপ্তি হয় না, অমৃতের অনুসন্ধানে ধায়।

অতৃপ্ত বাসনা লইয়া ঊর্দ্ধে অনন্তের পানে চাহিয়া যখন আমরা অনুভব করিতে পারিব—'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। বড়তেই সুখ, অল্পে সুখ নাই, মহত্ত্বেই সুখ, ক্ষুদ্রতায় সুখ নাই। যখন বুঝিব, ভূমা ভগবান্ অনন্ত-সুখের উৎস, যখন আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ সেই প্রাণের প্রাণ, পূর্ণ মহান্‌কে সত্যসত্যই চাহিবে, তখন আমরা তাঁহারই কৃপায় অমৃতের অধিকারী হইব।

ইচ্ছাময় নারায়ণ আমাদিগকে ইচ্ছা দিয়াছেন এবং সেই ইচ্ছা তিনিই

পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমাদের ইচ্ছা বড় হউক, আমরা বড় হই. ইহা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

কি শিখিব ?

শিখিব আমরা ইচ্ছাশক্তিকে জাগাইতে। শিখিব আমরা নারায়ণের ইচ্ছায় আমাদের ইচ্ছা মিলাইতে।

সত্য।

'সত্যং পরং ধীমহি'। (ভাগবত)

শক্তিং পরাং ধীমহি।

সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে ধ্যান করি।

শক্তিরূপিণী বিশ্বজননীকে ধ্যান করি।

কা'ল যেখানে ভীষণ-শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী ছিল, আজ সেখানে মনোহর উদ্যানশোভিত বহুজনসমাকীর্ণ হর্ম্ম্যময় মহানগরী বিরাজমান। পরশ্ব হয়ত সেই সুন্দরী মহাপুরীই মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। ধনীর গর্ব্বিত সৌধচূড়া আঁখির পলকে ভূমিসাৎ, দরিদ্রের পর্ণকুটীর অগ্নিদাহে ভস্মসাৎ হইতে দেখা যায়। তুঙ্গ অভ্রভেদী শৈলশিখর কালে সাগরগর্ভে লয় পায়। কদলী, ধান্য, সরিষা প্রভৃতি উদ্ভিদসকল পক্ক ফল শস্য প্রদান করিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়। আজ যে শিশুর জন্মে গৃহ উৎসবময়, কা'ল তাহার মৃত্যুতে শ্মশানতুল্য নিরানন্দ! আজ পিতামাতা ভ্রাতা বনিতা প্রভৃতি পরিজন লইয়া সোণার সংসারে কত আনন্দোচ্ছ্বাস, কা'ল

সেখানে প্রিয়জনবিরহে হাহাকার দীর্ঘশ্বাস! চন্দ্র-সূর্য্য, জলস্থল, তরুলতা, জড়জীব সকলেই দিন-দিন, পলে-পলে অনিবার্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

জগতের প্রতি পদার্থেই অস্তি-নাস্তি, আছে-নাই এই দুই ভাব, সত্য-অসত্য এই বিরুদ্ধভাবদ্বয় বর্ত্তমান। কোন পদার্থই একান্ত সত্য নহে। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থেরই দুইটা দিক্। একটা সত্যের দিক্, আর একটা অসত্যের দিক্। এক হিসাবে সত্য, আর এক হিসাবে অসত্য। আজ যাহা দেখিতেছি, উপভোগ করিতেছি, দুদিন পরে আর তাহা নাই। প্রত্যক্ষ ও ভোগকালে সত্য। অপ্রত্যক্ষ ও বিলোপকালে অসত্য। যদিও বৈজ্ঞানিকের মতে বস্তুর অত্যন্ত ধ্বংস নাই, কেবল রূপান্তর আছে, তথাপি বর্ত্তমান দৃষ্টবস্তুর অভাবে আমরা অত্যন্ত-অভাব অনুভব করি। বৃক্ষকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর, কাষ্ঠ কর, পুড়িয়া ছাই কর, কিন্তু উহার পরমাণুর ধ্বংস নাই। পরমাণুরূপে উহা জগতে থাকিয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকের এ হেন সিদ্ধান্ত সত্য হউক, কিন্তু বৃক্ষ নাই যে নাই-ই। আমরা বৃক্ষের ফলভোগে বঞ্চিত হইবই হইব।

জগতের প্রত্যেক পদার্থই ত সৎ-অসৎ, সত্য-অসত্য। কিন্তু এমন কি কোন বস্তু নাই, যাহা সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তনশীল, একাকার ও চির-সত্য? মানবের মনে এই প্রকার প্রশ্নের উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে। বহু-পূর্ব্বে ভারতের ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ আকুল প্রাণে এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন,—একমাত্র নিত্যসত্য পদার্থ আছেন, যিনি বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারণ। যিনি জাগতিক সকল পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট, জগৎ ছাড়িয়াও যাঁহার সত্তা রহিয়াছে। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, স্বপ্রকাশ, জীবের জ্ঞান-বুদ্ধি-দাতা।

তবেই সত্য দুই প্রকার, এক চিরন্তন সত্য; অপর সত্যও বটে

অসত্যও বটে। শেষোক্ত সত্য সাময়িক, ক্ষণিক। শাস্ত্রের ভাষায় ইহারই নাম ব্যবহারিক সত্য।

অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের মতে—

"ব্রহ্ম সত্যং, জগৎ মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্।"

ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

যাহা নিত্যকাল একই ভাবে, অপরিবর্ত্তনীয়রূপে বর্ত্তমান আছে, তাহা সত্য। এই সংজ্ঞা অনুসারে ধরিতে গেলে, এমন কোন পদার্থ জগতে নাই, যাহা সত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সুতরাং জগৎ মিথ্যা! প্রকৃত সত্য পদার্থ একটীমাত্র, তাহার নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতেই জগৎ, সত্তা লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় সত্য নহে। যেমন সমুদ্র ও তরঙ্গ, ফেণ, বুদ্বুদ প্রভৃতি বিবর্ত্ত। জাগতিক পদার্থসকল পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসশীল। যাহার ভাবান্তর বা পরিবর্ত্তন হয়, তাহা অসত্য। সুতরাং জগৎ মিথ্যা, কিন্তু আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক নহে।

সংসার-দশায় অর্থাৎ যতক্ষণ এই দেহে আমি আছি ও আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু আছে, ততক্ষণ বস্তুর সত্তা আছে। কিন্তু আছে কতক্ষণ? অনন্তকালের তুলনায় সহস্র লক্ষ বৎসরও অতি সামান্য, নগণ্য। সুতরাং পরমার্থদৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা একথা বলা যাইতে পারে। এই পৃথিবীতে আসিয়া আমি নদী-পর্ব্বত, হাতী-ঘোড়া প্রভৃতি যে সকল বস্তু দেখিতেছি, শঙ্কর একথা বলেন নাই যে, না উহা নদী নয়, তুমি হাতী বা ঘোড়া দেখ নাই। তিনি এই মাত্র বলিয়াছেন যে, ইহারা ক্ষণিক সত্য, মিথ্যার নামান্তর বই আর কিছুই নহে।

জীব ও ব্রহ্মে অত্যন্ত প্রভেদ। জীব ক্ষুদ্র, সান্ত, অল্পশক্তি, অল্পজ্ঞ। ব্রহ্ম ভূমা, অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্। এ অবস্থায় উভয়ের অভেদ-কল্পনা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? এরূপ অভেদ-কল্পনা ভক্তের

প্রাণে বড় বাজে। ভক্ত দ্বৈতভাব লইয়া ভগবানকে ভজনা করেন। কিন্তু জ্ঞানবাদিগণের ধারণা এই যে, চৈতন্য পদার্থ এক ভিন্ন দুই নাই। ব্রহ্ম-চৈতন্য ও জীব-চৈতন্য স্বরূপতঃ এক। যেমন প্রকাণ্ড জ্বলদগ্নিকুণ্ড আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উভয়েই এক তেজ-পদার্থ। জড়দেহাবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যে আর নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যে, চৈতন্যস্বরূপে কোন ভেদ নাই। জীব কেবল জড়ের সহিত সম্পৃক্ত থাকায়, পরিমিত-ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। অথবা গৃহস্থিত আকাশ জীবের তুলনা, মুক্ত-অনন্ত আকাশ ব্রহ্মের তুলনা। দুই আকাশই স্বরূপতঃ এক।

একটীমাত্র সার সত্যে ঋষিগণ কি প্রকারে উপনীত হইলেন? এ বিষয়ে কার্য্যকারণবাদই দার্শনিকের প্রধান যুক্তি। কার্য্য (Effect) থাকিলেই তাহার কারণ (cause) থাকিবে। জগতের প্রতি পদার্থ জাত, উৎপত্তিশীল। সুতরাং প্রত্যেকেরই কারণ আছে। কার্য্য ধ্বংস হইয়া কারণে লয় পায়। এক কারণ হইতে নানা কার্য্য হইতে পারে। মাটীর কলস, ঘট, হাঁড়ি, পুতুল এ সকলই কার্য্য, মৃত্তিকা কারণ। মৃত্তিকাই সত্য, এই কার্য্যগুলি ভাঙিয়া গেলেও মৃত্তিকারূপে বর্ত্তমান থাকিবে। আবার, মৃত্তিকারও কারণ আছে। এই প্রকারে কারণের পর কারণ, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে শেষ-কারণে উপনীত হওয়া যায়; যাহার আর কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কার্য্য মিথ্যা, কারণ সত্য, এই সিদ্ধান্ত অনুসারে চরম কারণই একমাত্র সত্য, আর যাবতীয় কারণই চরমকারণের কার্য্য, সুতরাং মিথ্যা। সেই চরমকারণ—চিন্ময়ী শক্তি বা ব্রহ্ম।

প্রাচীন আর্য্যসমাজ এই পরমসত্যকে সারাৎসার বলিয়া এবং সংসারটাকে অনিত্য বলিয়া বুঝিতেন ও ভাবিতেন। এই ভাব প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার একটী বিশেষত্ব। আধুনিক প্রতীচ্য সভ্যতার বিশেষত্ব, জড়ে

অতিমাত্র আসক্তি, ইহার ফলে জড়বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি এবং সাংসারিক সুখভোগে একান্ত অনুরক্তি। হিন্দু সমাজের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে দুই দিক্ রক্ষা করিয়া অর্থাৎ পরমসত্যে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিয়া সাংসারিক উন্নতি বিষয়ে অভিনিবেশ স্থাপন করিতে পারিলেই হিন্দুর বিশেষত্ব কথঞ্চিৎ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। পর-সত্যে স্থির লক্ষ্য রাখিতে না পারিলে, পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণবলে আমাদিগকে সর্ব্বদা নীচে টানিয়া রাখিবে। পৃথিবীর ধূলি-মাটিতে কেবলই গড়াগড়ি ও হামাগুড়ি দিতে থাকিলে আমরা স্বর্গসুখে বঞ্চিত হইব।

বৈজ্ঞানিক পরমার্থদৃষ্টিতে না হউক, লৌকিকদৃষ্টিতে সত্যনিষ্ঠ। লৌকিক বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান, গুণাগুণ পরীক্ষা ও বিচার বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। মিথ্যা বা অবস্তু লইয়া তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। পার্থিব সত্যই তাঁহার অবলম্বন। এই জন্যই বিজ্ঞানের জয়জয়কার। আমাদের মধ্যে প্রাচীন যুগের দার্শনিকতা নাই, বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা নাই। আমরা কি লইয়া আছি? না পরমসত্য, না লৌকিকসত্য; কোন সত্যই আমাদের উপাস্য নহে। সত্যের প্রতি আমাদের প্রাণের টান নাই। আমরা কেবল নকলেই সন্তুষ্ট। আহারে-বিহারে, আচারে-উপচারে, ভাবে-অভাবে, বেশ-ভূষায়, আচরণে-বচনে, গানে-জ্ঞানে সর্ব্বত্র নকল। আমাদের জীবন সকল বিষয়েই যেন নকলনবিশের জীবন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যিনি সত্যনিষ্ঠ, তিনি কখনই নকল-মেকিতে তুষ্ট থাকিতে পারেন না। কার্য্যে ও ভাবে সকল বিষয়ে সকল অবস্থায় সত্যই তাঁহার অবলম্বন। ধর্ম্মে ভাণ-ভণ্ডামি তাঁহার অসহ্য। আজকাল ধর্ম্ম ত 'সাত নকলে আসল খাস্ত'। একথায় নকল ধার্ম্মিকের ক্রোধ জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক ধর্ম্মের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মর্ম্মাহত। আমরা দিন দিন যেমন বামনাকৃতি হইতেছি, ধর্ম্মকেও তেমনি বামন-বিকল করিয়া তুলি-

য়াছি। ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইলেও ধর্ম্মকলহ আছে, ধর্ম্মবণিক্ অনেক আছেন। ইহারা অধর্ম্মের দোকান সাজাইয়া, ধর্ম্মের নাম দিয়া, অধর্ম্ম বিক্রী করিতেছেন! গ্রাহকসংখ্যাও অল্প নহে। ইহা দ্বারা ধর্ম্মবণিক্‌গণ বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছেন। হায়! সত্যের মর্য্যাদা ধর্ম্মকর্ম্মেও রক্ষিত হইতেছে না!

আমি পণ্ডিত হইয়া উপদেশ দিতেছি,—'নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মঃ'। যে মুখে যে মুহূর্ত্তে বলি সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, সে মুখে, পরমুহূর্ত্তে মিথ্যা বলিয়া রসনাকে কলঙ্কিত করিতে লজ্জা বোধ করি না। উপদেশ দিয়া থাকি,—'অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে'। সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ আর সত্য তৌল করিলে সত্যের ভারই অধিক হইবে। 'সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী' সংসারটা সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সত্যের অভাবে সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না, ধ্বংসের মুখে প্রবেশ করে। মিথ্যাকে লইয়া কোন জাতিই উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। 'অধর্ম্মের পত্নী মিথ্যা' একথা কল্কিপুরাণে আছে। অনৃতের সেবা করিলে অধর্ম্ম হয়। অধর্ম্মের ফল দুঃখ ও পরাজয়। এজগতে সত্যেরই জয়, সত্যের উপরই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যাপরায়ণ ধার্ম্মিক আর কাঁটালের আমসত্ত একই কথা। সত্যের জন্য প্রাণ দিতে ধার্ম্মিক ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রস্তুত। ইত্যাদি ভূরি ভূরি মূল্যবান্ উপদেশ পাইয়া থাকি ও দিয়া থাকি।

আবার, পাশ্চাত্য কবির কাব্য পড়িয়া বলি—

'Truth is the highest thing that man may keep.'

(*Chaucer*)

মানুষের পক্ষে সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ জিনিষ। আর কিছু রক্ষা করিতে না পারিলেও একমাত্র সত্যরক্ষা করিলেই মানুষ, মানুষ বলিয়া পরিচিত হয়। সত্যই চরিত্রের প্রধান উপাদান। কিন্তু বক্তা বা শ্রোতা

আমরা কেহই যদি সত্যের মহিমা উপলব্ধি করিতে ও কার্য্যতঃ প্রদর্শন করিতে না পারি, তবে বক্তৃতা বন্ধ্যাস্ত্রীর ন্যায় নিষ্প্রসবা।

কোন সংস্কৃত কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

'ধর্ম্মঃ প্রব্রজিতস্তপঃ প্রচলিতং সত্যঞ্চ দূরং গতম্।'

'ধর্ম্ম প্রস্থান করিয়াছে, তপস্যার লোপ হইয়াছে, সত্য দূরে চলিয়া গিয়াছে।' এখন ধর্ম্ম নাই, তপ নাই, সত্য নাই। কিন্তু এ সকল আমাদের একদিন ছিল। সত্যের জন্য প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া রাজা দশরথ নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ পিতামাতা, রাজ্য সুখ ঐশ্বর্য্য অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। সত্যপ্রিয়তার এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রাচীন কাব্য-ইতিহাসে পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্য্যসমাজ সত্যকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া গ্রহণ ও পালন করিতেন। কিন্তু আমরা এখন নানা বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিয়া সত্যভ্রষ্ট হইয়াছি।

লোকে মিথ্যা বলে কেন? শিশু সত্যকে ভালবাসে, সরল সত্যে তাহার উলঙ্গ প্রাণ নাচিয়া উঠে। ফলাফল, হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া শিশু সত্যকথাই বলিয়া থাকে। কিন্তু বড় হইলে মিথ্যাবাদী হয় কেন? ইহার উত্তর—শিক্ষার দোষেই এরূপ হইয়া থাকে। পিতামাতা সন্তানকে যদি মিথ্যার সমুচিত শাসন, ও সত্যের যথোচিত পুরস্কার না করেন, তবে সন্তান মিথ্যায় অভ্যস্ত হইতে থাকে। বালক অন্যায় করিয়া তাহা স্বীকার করিলে যদি শাস্তি পায়, ও মিথ্যা বলিয়া যদি অব্যাহতি পায়, তবে সে মিথ্যা বলিবে। বালকদিগের মনে মিথ্যার প্রতি বিদ্বেষ ও সত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মান একান্ত কর্ত্তব্য। অভিভাবকেরা যদি সত্যের আদর না করিয়া উদাসীন থাকেন, সত্যকথা বলার দরুণ যদি বালক দণ্ডিত হয়, তবে কেন সে সত্য বলিবে? বালক যত বড় হইতে থাকে,

ততই চতুর্দ্দিকের মিথ্যা ব্যবহার দেখিয়া, মিথ্যার পুরস্কার বা দণ্ডাভাব দেখিয়া, সত্যের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করে। সে দেখে, মুখে উপদেশ এক রকম, কার্য্য আর এক রকম, পুস্তকের নীতিবাক্য পুস্তকে ও মুখেই থাকে। তারপর সংসারে প্রবেশ করিয়াও কুটিল মিথ্যাচার দেখে।

সেইরূপ, সমাজ যদি মিথ্যার তীব্র তিরস্কার, সত্যের সমুচিত পুরস্কার না করে, তবে সাধারণ লোকের মনের গতি মিথ্যার দিকেই হইবে, আশ্চর্য্য নয়। যে সমাজ যত দুর্ব্বল, সমাজ-বন্ধন যত শিথিল, সে সমাজে সত্যানুরাগ তত ক্ষীণ। যাবতীয় জঘন্য পাপের মধ্যে মিথ্যাকথন জঘন্যতম। কিন্তু কোন দিন কিছু চুরি বা অন্য পাপ করেন নাই, এমন লোক অনেক থাকিতে পারেন, অথচ জীবনে একটী মিথ্যাকথাও বলেন নাই, এরূপ লোকের সংখ্যা বোধ হয় অতি অল্প। শাস্তির ভয়ে যে ব্যক্তি সত্যকথা বলিতে বিরত থাকে, সে নিশ্চয়ই ভীরু, কাপুরুষ। স্বার্থের খাতিরে যে মিথ্যা কপট ব্যবহার করে, তাহার চিত্ত দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র। মানসিক ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা মিথ্যাভাষণের অন্যতম কারণ। পক্ষান্তরে, সত্যপালনে চিত্তের দৃঢ়তা ও সবলতা প্রকাশ পায়। ইহাতে যে পুরুষত্বের আবশ্যক, তাহার অভাব হইলে সমাজমধ্যে মিথ্যা প্রশ্রয় পাইয়া থাকে।

'মরদ্‌কা বাত্‌, হাতীকা দাঁত্‌'। হাতীর দাত ও পুরুষের বাক্য উভয়ই তুল্য। দাঁত একবার বাহির হইলে, হাতী আর তাহা ফিরাইয়া ভিতরে নিতে পারে না। যিনি মরদ্‌ অর্থাৎ পুরুষ, তাঁহার মুখ হইতে একবার যে কথাটা বাহির হয়, তাহার অন্যথা তিনি করিতে পারেন না। তাঁহার যেই কথা, সেই কাজ। কার্য্যে পরিণত হইলেই বাক্য হস্তীদন্তের ন্যায় শুভ্র-শোভন, মূল্যবান্‌! হাতীর সহিত পুরুষের তুলনা। হাতীর গায়ে যত বল, মানুষের মনে সেই বল থাকিলে, তাঁহার সকল কথাই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে।

পুরাকালে কার্থেজ ও রোমবাসীদের মধ্যে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছিল। একযুদ্ধে কার্থেজসৈন্য একদল রোমসৈন্যকে পরাজিত করিয়া সেনাপতি রেগুলাসকে (Regulus) বন্দী করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য অনেক যুদ্ধেই কার্থেজীয়গণ পরাভূত হইতে থাকে। ইহাতে তাহারা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া রোমে দূত প্রেরণ করে। এবিষয়ে অনেকটা আনুকূল্য হইবে আশা করিয়া, সেই সঙ্গে রেগুলাসকেও পাঠায়। তাঁহাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল যে, যদি সন্ধি না হয়, তবে তিনি কার্থেজে ফিরিয়া যাইবেন। দূত সহ রেগুলাস রোমে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সিনেট সভার নিকট নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে অনুমতি পাইয়া বলিলেন—'কার্থেজ নানা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হীনবল হইয়াছে, এ অবস্থায় সন্ধি করিলে রোমের বিশেষ ক্ষতি। সন্ধি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।' সুতরাং সন্ধি হইল না। বাড়ী-ঘর, স্ত্রী-পুত্র, সকলের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া রেগুলাস কার্থেজে বন্দীভাবে ফিরিয়া গেলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি দেশে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলেন না। তিনি অনুরোধ করিলে সন্ধি হইত, নিজেও মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু সমাজের বিরাট স্বার্থের নিকট নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ অতি তুচ্ছ মনে করিয়া যুদ্ধ চালাইতে স্বদেশবাসিদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি শত্রুহস্তে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন। ধন্য রেগুলাস! ধন্য তাঁহার স্বদেশপ্রেম! ধন্য তাঁহার সত্যনিষ্ঠা!

অতি সামান্য বিষয়েও অঙ্গীকার করিলে মহাত্মারা তাহা পালন করিতে বিস্মৃত হন না।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি কোন এক সামরিকবিদ্যালয়ে পড়িতেন। সেইখানে একটী স্ত্রীলোক ফল বেচিত। তাহার নিকট হইতে নেপোলিয়ন

প্রায়ই ফল কিনিয়া খাইতেন। কখন কখন ধার থাকিত। তিনি স্কুল ছাড়িবার সময় এই স্ত্রীলোকটির সমস্ত পাওনা শোধ দিতে না পারিয়া তাহাকে বলিলেন—কয়েক আনা পাওনা রহিল, যখন পারি দিব।

অনেক বৎসর পর একদিন নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট্ হইয়া সেই স্কুল পরিদর্শন করিতে গেলেন। ফলওয়ালীর পাওনার কথা তাঁহার মনে আছে। তিনি সন্ধ্যার পর নিজে ফলওয়ালীর বাড়ী যাইয়া আগের মতন নূতন ফল চাহিয়া খাইলেন এবং প্রচুর অর্থ দিয়া বৃদ্ধাকে পরিতুষ্ট করিলেন।

যাহারা অলস অকর্ম্মা, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে, তাহাদের মুখটা খুব চলে। তাহারা মুখে মুখে হাতী মারে, বাঘ মারে, কেল্লা ফতে করে। তাহাদের কথায় কেহ বিশ্বাস করে না, তাহারা গুলিখোরের আড্ডায় স্থান পাইবার যোগ্য। কিন্তু যাঁহারা কাজের লোক, তাঁহারা বাকাবীর নহেন। সর্ব্বদাই কর্ম্মে ব্যস্ত, বেশী কথা বলিবার অবসর পান না; সুতরাং মিথ্যা বলিবার সুযোগ তাহাদের অল্পই ঘটে।

ক্ষুদ্রমনা বিষয়ীলোক ক্ষুদ্র দোকানদারী বুদ্ধি লইয়া কেবল ঐহিক লাভ-ক্ষতি গণনা করে। ধর্ম্ম চুলোয় যাক্, লোকের বিশ্বাস যায় যাক্, দুইটা মিথ্যা বলিয়া যদি দুইটা পয়সা পাওয়া যায়, তাহাই লাভ। কিন্তু আশু-লাভ হইলেও পরিণামে যে কি ক্ষতি সে কথা ভাবেনা। বিশ্বাস করে না যে, সত্যই শক্তি, সত্যই মঙ্গল, সত্যই সুন্দর। লোক-ব্যবহারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে "Honesty is the best policy" সততাই সর্ব্বোত্তম নীতি, একথা কৃষ্ণপান্তী ও রামদুলাল সরকার কার্য্যদ্বারা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই ইংরাজি বাক্যটী বোধ হয় তাঁহারা জানিতেন না।

রাণাঘাটের তিলীবংশীয় কৃষ্ণপান্তি প্রথম অবস্থায় অতি দরিদ্র ছিলেন।

লেখাপড়া শিখেন নাই। মাথায় মোট বহিয়া পান বেচিয়া কষ্টে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু সততার গুণে, ব্যবসায়ে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া বঙ্গদেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ ধনী হইয়া অনেক জমীদারী ক্রয় করেন। তিনি একমুখে দুইকথা বলিতে জানিতেন না। ছোট বড় ভদ্রাভদ্র সকলেই তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিত। কথিত আছে, একবার তিনি কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন, এমন সময় পথে কয়েকজন ডাকাইত তাঁহাকে আক্রমণ করে। ডাকাইতেরা নৌকাতে টাকা পয়সা না পাওয়াতে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। কৃষ্ণপান্তী তাহাদিগকে বলিলেন—আমার গদিতে গেলে তোমাদিগকে অনেক টাকা দিব। তোমরা আমার গদিতে যাইও। ডাকাইতেরা তখন তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল এবং এক দিন তাঁহার গদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। বিশ্বাস বড় জিনিষ।

'বাংলার রথচাইল্ড' (Rothschild) রামদুলাল সরকারও বাল্যকালে অতি দীন দরিদ্র ছিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ৺ মদনমোহন দত্তের বাড়িতে প্রতিপালিত হইয়া ৫৲ পাঁচ টাকা বেতনে তাঁহার অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। শেষে আরও ৫৲ পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়। একদিন মদনমোহন চৌদ্দহাজার টাকা দিয়া একটী নীলাম ডাকিবার জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। রামদুলাল নীলাম স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ডাক হইয়া গিয়াছে। তারপর গঙ্গায় জলমগ্ন একখানি জাহাজ চৌদ্দহাজার টাকায় নীলাম ডাকিয়া লইলেন এবং একলক্ষ চৌদ্দহাজার টাকায় বেচিলেন। তিনি ঐ টাকা লইয়া প্রভুর নিকট আসিলেন এবং সকল কথা সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়া সমস্ত টাকা প্রভুকে দিলেন। সামান্য বেতনভোগী ভৃত্যের সততা ও নির্লোভ ব্যবহার দেখিয়া মদনমোহন বিস্মিত হইলেন। তিনি

নিজের চৌদ্দহাজার টাকা গণিয়া রাখিয়া বাকি এক লক্ষ টাকা রাম-দুলালকে দিয়া বলিলেন—'এই টাকা তোমার প্রাপ্য। তোমার সততার পুরস্কার'। ধন্য মনিব, ধন্য চাকর।

এখন হইতে রামদুলাল স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সততার ফলে ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি কয়েক খানি জাহাজ কিনিলেন ও আমেরিকার সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে তাঁহার বিস্তর লাভ হইতে লাগিল। তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া অসংখ্য দান করিয়া এক কোটীর অধিক টাকার সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকে গমন করেন।

সাধু শব্দের এক অর্থ বণিক বা সদাগর। পূর্ব্বে বণিকদিগের নামের সঙ্গে সাধু শব্দ যোজিত হইত। আজকাল আমরা ব্যবসায়ী-দিগকে যদি তদীয় কার্য্য দ্বারা সাধু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, তবে সমা-জের প্রভূত উপকার হইবে। আগে বিনা খতে, বিনা সাক্ষীতে, নিরক্ষর নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকেও অনেক সময় টাকা ধার দেওয়া হইত। ইহারাও কথামত সুদ সহ যথাসময়ে টাকা শোধ দিত। মুখের কথায় হাজার হাজার টাকার কাজ হইত, কারবার চলিত। প্রায় কেহই বিশ্বাস বা সত্য ভঙ্গ করিত না। কিন্তু 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'। সেই দিন আমাদের চলিয়া গিয়াছে। এখন আর কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতে চায় না। আমরা নিজকেই নিজে বিশ্বাস করিতে পারি না। কেন এমন হইল?

ভগবানের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস, ধর্ম্মভয় চলিয়া গেলে বা কমিতে থাকিলে সমাজ লৌকিক সত্যে অবহেলা করিয়া অধোগামী হয়। অবিশ্বাসের ফলে, ভাণ-ভণ্ডামি, ছল-চাতুরি প্রভৃতি মিথ্যার যত প্রকার ভেদ আছে, সব গুলি একত্রে আসিয়া সমাজকে কলঙ্কিত করে। মিথ্যাবলা

ত মুখের দুই চারিটা কথা বই আর কিছুই নয়? এইজন্য আর কয়টা লোক শাস্তি পায়! বস্তুতঃ চুরি প্রভৃতি অপরাধে অপরাধী যেমন প্রায়ই রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া শাস্তি পায়, মিথ্যাবাদীর নামে বিচারালয়ে সেইরূপ নালিশও হয় না, দণ্ডও হয় না, সুতরাং অবিশ্বাসী হীনচিত্ত ব্যক্তি মিথ্যা বলিতে সাহস পায় এবং স্বার্থ-হানির ভয়ে সত্য বলিতে ভীত হয়। এখানকার বিচারালয়ে শাস্তি না পাইলেও যিনি বিশ্বতশ্চক্ষু, বিশ্বতঃশ্রোত্র, যিনি সব দেখেন, সব শোনেন, সব জানেন, সেই রাজরাজেশ্বরের বিচারালয়ে একদিন পাপের বিচার হইবে। এইরূপ সরল বিশ্বাস যাহার আছে, সে কি মিথ্যা বলিতে পারে?

সত্যপালন করিতে যে বলের প্রয়োজন, শক্তিরূপিণী বিশ্বজননীর নিকট সেই বল লাভের জন্য সত্যসত্যই যদি সরল প্রাণে প্রার্থনা করি, তবে তিনি প্রসন্না হইয়া আমাদিগকে অভীষ্ট বরদান করিবেন। তাঁহাব বরে আমরা সত্যরত হইয়া শক্তিশালী হইব। সত্য আমাদের ধ্যানের বিষয়, শক্তি আমাদের সাধনার বিষয় হইবে।

কি শিখিব?

শিখিব আমরা সত্যের সেবা করিতে। শিখিব আমরা সত্যরূপী শিবময় সুন্দর পুরুষকে ধ্যান করিতে।

পূজা ও সমাজ।

চতুর্থ খণ্ড।

বিরাটপুরুষ।

সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় মানব পশুতুল্য ছিল। কিন্তু ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া পাশবিক সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া বর্ত্তমান মানবসমাজে পরিণত হইয়াছে। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তি বা গুণের তারতম্য, এবং শ্রম ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে সমাজ মধ্যে স্থূলতঃ চারিপ্রকার শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক সভ্যসমাজেই কতকগুলি লোক চরিত্র, ধর্ম্ম ও জ্ঞানবলে অপর সকল লোকের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত; ইঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়। সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ইঁহাদের পুণ্যচরিত্রপ্রভায়, প্রতিভার দীপ্ত আভায়, জগৎ আলোকিত ও পুলকিত। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদের প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম একরূপ; তাঁহারা বাহুবলে বলীয়ান্ হইয়া বসুন্ধরাকে পাশব অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। তাঁহারা দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন প্রভৃতি কর্ম্মে স্বভাবতঃ নিযুক্ত। আর এক সম্প্রদায়ের লোক শস্যোৎপাদন, বস্ত্রবয়নাদি কর্ম্মে নিরত থাকিয়া, সমাজকে অন্নবস্ত্রাদি দান করিয়া আসিতেছে। অবশিষ্ট কতকগুলি লোক পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র, তাহাদের তেমন বিদ্যা বুদ্ধি নাই, মস্তিষ্ক ও মন নিস্তেজ, হীনশক্তি, সুতরাং তাহারা পরপরিচালিত, ও সেবাকার্য্যে স্বতঃ প্রবৃত্ত। সমাজ যতই জনসঙ্ঘসঙ্কুল ও জটিল হউক না কেন, তদন্তর্গত সকল লোককেই প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

আর্য্যসমাজে প্রথম শ্রেণীর নাম ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম ক্ষত্রিয়, তৃতীয় শ্রেণীর নাম বৈশ্য, ও চতুর্থ শ্রেণীর নাম শূদ্র। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল সমাজেই বর্ত্তমান আছে; কেবল নামমাত্র ভেদ অথবা নামাভাব। ঈশ্বরের এমনই বন্দোবস্ত যে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে ইহার অন্যথা দৃষ্ট হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" আমি ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ, গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) এবং কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছি। আমি (ঈশ্বর) এমন নিয়ম করিয়া রাখিয়াছি যে, সকল সমাজেই এই চারি শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান থাকিবে। সকল সমাজই শক্তি ও প্রবৃত্তি বশে প্রধানতঃ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই শ্রেণীবিভাগ ঐশ্বরিক বা স্বাভাবিক। ইহার পরে যাহা, তাহা কৃত্রিম, মনুষ্যকৃত। এ সম্বন্ধে অন্যান্য সমাজ হইতে হিন্দু সমাজের প্রভেদ এই যে, হিন্দু সমাজের শ্রেণীবিভাগ বংশপরম্পরায় আবদ্ধ, অন্যান্য সমাজে সেরূপ নহে।

শির-শিরা-কণ্ঠ-কেশ-অস্থি-চর্ম্ম-নখ-রোম প্রভৃতি লইয়া মানুষের শরীর। সব লইয়া এক। জীবিত ও সুস্থ মানুষের দেহ-যন্ত্রের ক্রিয়া অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সুন্দর নিয়মে নির্ব্বিরোধে চলিতে থাকে। অঙ্গে অঙ্গে, শিরায় শিরায়, সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া, একটা প্রাণশক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের যে কোন অংশে যখনই সামান্য একটু আঘাত লাগে, তখনই সমস্ত শরীরে কেমন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য, উদ্বেগ অনুভূত হইয়া থাকে। একটী সামান্য অঙ্গাবয়বেরও যদি অভাব ঘটে, তবে সমস্ত কলেবর বিকল, অপূর্ণ, অভাবগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

প্রত্যেক অঙ্গেরই উপযোগিতা আছে, নিষ্প্রয়োজনে কাহারো সৃষ্টি হয় নাই, এবং প্রত্যেকেই স্বস্থানে থাকিয়া সুন্দর। কিন্তু

শ্রেষ্ঠ স্থান কাহার? নিশ্চয়ই মস্তকের। এজন্যই ইহার এক নাম উত্তমাঙ্গ।

জ্ঞানের যতগুলি দ্বার আছে, সবগুলিই মস্তকে; কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় সর্ব্বশরীরব্যাপী, সাধারণ। মস্তক চালক, প্রভু; করচরণাদি তাহার সাহায্যকারী। মস্তকের দ্বারাই মনুষ্যের পরিচয়। মৃতদেহে মাথা না থাকিলে, চিরপরিচিত বন্ধুর দেহ হইলেও চিনিয়া লওয়া বা ছিনাক্ত করা কঠিন। শুধু মাথার ছবিতেই মানুষকে চেনা যায়। মস্তকশূন্য দেহের ছবি, মানুষের পরিচয় দিতে নিঃসংশয়রূপে সমর্থ নহে। পাশ্চাত্যদেশে পরীক্ষার জন্য বহুমূল্যে মনীষীর মস্তক ক্রীত হইয়া থাকে। মস্তক সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ, সকলের উর্দ্ধে অবস্থিত। মস্তক না থাকিলে দেহ প্রাণহীন, মৃত। আবার গ্রীবা প্রভৃতির সহিত সংযোগ না রাখিয়া মস্তক তিষ্ঠিতে পারে না। প্রত্যেক অঙ্গের সহিত উহার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় হৃষ্টপুষ্ট। কেহ কাহাকে তুচ্ছ করিতে পারে না। অবজ্ঞায় অমঙ্গল।

বালকবালিকা, যুবকযুবতী, বৃদ্ধবৃদ্ধা, ভদ্রাভদ্র, ছোটবড় সকল লোক লইয়া সমাজ। সব লইয়া এক। সমাজ মহান্ বিরাট্ পুরুষ। প্রত্যেক ব্যক্তিই এই বিরাট্ পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে বর্ত্তমান। প্রত্যেক সজীব-সুস্থ সমাজশরীরের অভ্যন্তরে এক মহাশক্তির ক্রিয়া বিদ্যমান। ইহার এক অঙ্গের আঘাতে ও ক্ষতিতে সমগ্র সমাজ-শরীরে বেদনা ও ক্ষতিবোধ স্বাভাবিক। এই বিপুল সমাজদেহের কেহ মস্তক, কেহ হৃদয়, কেহ বাহু ইত্যাদি। সমাজের মস্তক—পুরুষ; হৃদয়—নারী। প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য আছে, এবং কর্ত্তব্যপালনেই গৌরব ও সুখ।

বিরাট পুরুষের বিরাট কোলে ছোট বড়, নর নারী সকলেরই স্থান আছে, নাই কেবল অলস-অকর্ম্মণ্যের, অক্ষম-অযোগ্যের।

বিরাট পুরুষের পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাঁহারা বিরাট পুরুষের প্রকৃত উপাসক, পরম ভক্ত, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহারা যে পথে চলেন, সমাজ-রূপিণী মহাশক্তির যে ভাবে পূজা করেন, জনসাধারণও সে পথে চলিবে, সেই ভাবে পূজা করিতে শিখিবে।

এই পূজার মন্ত্র—কর্ম্ম; ফুলচন্দন—প্রেম; বলি—কাম-ছাগ; নৈবেদ্য—দেহ-মন; প্রতিমা—মাতৃভূমি। এই শিক্ষা যখন সর্ব্বসাধারণে শ্রেষ্ঠগণের নিকট পাইতে থাকে, তখন ইঁহাদের প্রাধান্য সার্থক।

একতা।

নানাঅঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট, বহুশিরাজালবেষ্টিত মানবশরীরের একটা সামান্য একত্ব বোধ প্রত্যেক মানবেরই আছে, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান অজ্ঞের নাই। আমার মাথা, আমার হাত, আমার পা, এই জ্ঞান সকলেরই আছে, কিন্তু শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া কোথায় কি ভাবে হইতেছে, ইহাকে দীর্ঘ কাল কি উপায়ে সবল রাখা যায়, বিকল হইলেই বা কি উপায়ে সংস্কার সম্ভবে ইত্যাদি জ্ঞান বিশেষজ্ঞেরই আছে, অল্পজ্ঞের নাই। পণ্ডিতের দৃষ্টান্তানুসরণে মূর্খ, স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম পালন করিয়া দেহ সুস্থ রাখিতে পারে। সেইরূপ বিরাট পুরুষের মস্তিষ্কস্থানীয় যাঁহারা, যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহারা সমাজ শরীরটাকে নিয়ন্ত্রিত, সবল-সচল রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত যে, এই সমাজ আমার, একের দুঃখে ও সুখে আমার দুঃখ ও সুখ, একের উন্নতি ও অবনতিতে আমার উন্নতি ও অবনতি। এই ভাবটা যখন আপামর সর্ব্ব সাধারণের সাধারণ হইয়া দাঁড়ায়, তখনই সমাজের প্রতি, তাহাদের একটা প্রাণের টান আসিতে পারে, অন্যথা নহে। তখনই একতা লাভের সম্ভাবনা।

বঙ্গসমাজে অজ্ঞের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কৃষক প্রভৃতি

নিরক্ষর লোকের এইরূপ ভাব মনে জাগে না। অথচ ইহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া শিক্ষিত দলের একতার প্রয়াস সম্প্রদায় সৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সর্ব্ব সাধারণের এই প্রকার একটা সাধারণ জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়া বিনা শিক্ষায় অসম্ভব। এই জ্ঞানকে স্বাভাবিক করিতে হইলে সৎ দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। অজ্ঞকে জ্ঞান দানই বিজ্ঞের লক্ষণ, অবজ্ঞা করা বিজ্ঞের লক্ষণ নহে। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের বলে যাঁহারা বলীয়ান্, তাঁহারা বোঝেন, প্রত্যেকেই বিরাট পুরুষের এক একটি অঙ্গ, বোঝেন একটি কেশ, একটি রোমের জন্মও নিরর্থক নহে। কৃষক, চণ্ডাল, ডোম সকলেই বিরাট পুরুষের অংশভূত, সকলেই সমাজের প্রয়োজন সাধন করিতেছে। হস্ত না থাকিলে আহার্য্য বস্তু মুখে দেওয়া যায়না, চরণ না থাকিলে চলা যায় না, নখ না থাকিলে কণ্ডুয়নাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। কৃষককুলের অভাবে অন্ন পাওয়া অসম্ভব, তাঁতিকুলের অনুন্নতিতে বস্ত্র পাওয়া কঠিন, এ সকল কথা বিজ্ঞেরা বিলক্ষণ বোঝেন, কিন্তু মূর্খের সে জ্ঞান নাই।

একত্ব সাধন পক্ষে জ্ঞান প্রথম সাধন। দ্বিতীয় উপায় অনুভূতি। মস্তিষ্ক ও হৃদয়, জ্ঞান ও প্রেম, উভয়েরই প্রয়োজন। মস্তিষ্ক বোঝে, হৃদয় আলিঙ্গন করে। জ্ঞান বিচার করে; প্রেম, পরকে আপনার করিয়া কোলে লয়। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংযোগে, জ্ঞান ও প্রেমের শুভ সম্মিলনে একত্বের দিব্যস্ফূরণ হইয়া থাকে। আগে একত্ববোধ, পরে একত্বের তীব্র অনুভূতি না জন্মিলে প্রকৃত একতা জন্মিতে পারেনা। মানবশরীরের মস্তক, হৃদ প্রভৃতির একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া নির্ব্বিবাদে যথোপযুক্ত পরিচালনা দ্বারা যেমন স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন হয়, সেইরূপ সমাজ শরীরের সকল অঙ্গ, সকল শ্রেণীর লোক নির্ব্বিরোধে উন্নতির দিকে ধাবিত হইলেই সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ।

একতাই বল, অনৈক্য দুর্ব্বলতা, সকলে এক হও ইত্যাদি একতার ভূয়সী প্রশংসা ও উপদেশ বহু গ্রন্থে, বহু প্রবন্ধে, বহু বক্তৃতায় দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, একতার পরিবর্ত্তে ঘোরতর অনৈক্যের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে! বর্ত্তমান নব্য শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকেই "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" এই ভাব প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন ভাবে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। সমাজের বার আনা লোক—যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদের সঙ্গে কোনরূপ সংস্রব রাখিতে ইহারা চান না। ইহারা স্বতন্ত্র। এই বিচ্ছেদ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। ইহারা অন্যের সহানুভূতি পান না। ইহাদের মুখে কিন্তু কখন কখন প্রয়োজনবশতঃ ঐক্যের মধুর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু,

মুখে দুটো মিঠে কথা কহিলে কি হয়?
মনে যদি মিঠে ভাব নাহি তব রয়?

মনের মিল না থাকিলে, হৃদয় এক না হইলে, বাহিরে মৌখিক বা বাচনিক একতা কোন কাজে আসে না।

প্রত্যেক মানুষের মুখাবয়ব যেমন বিভিন্ন, মনও তেমনি ভিন্ন-ভাবাপন্ন; তবে ঐক্যের আশা কোথায়? জ্ঞান ও প্রেমের শিক্ষা ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন মন গুলিকে এক করা অসম্ভব। উহাদিগকে এক ছাঁচে গড়িয়া না তুলিলে প্রকৃত একতা অলীক বাক্য।

বঙ্গসমাজে একতা শ্রুতিগোচরে ও অভিধানে বর্ত্তমান, কিন্তু কার্য্যতঃ লোপ পাইয়াছে। ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, শিক্ষিতে শিক্ষিতে, নিরক্ষরে নিরক্ষরে অনৈক্য। ধনী নির্ধনে, ধনবানে ধনবানে, দরিদ্রে দরিদ্রে অনৈক্য। আমরা আমাদের মহান্ জাতীয় স্বার্থ বুঝিনা, বুঝিলেও কার্য্যকালে ভুলিয়া যাই। মুখে ঐক্যের ভাণ, অন্তরে

বিষম অনৈক্য। সামান্য কাল্পনিক স্বার্থের সংঘর্ষে ভয়ঙ্কর বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠে। ইহার মূলে প্রেমের অভাব। বাঙালী বাঙালীকে আপনার জন বলিয়া ভাবিতে শিখে নাই, ভালবাসিতে শিখে নাই। এই টুকু শিখা চাই। প্রত্যেক বঙ্গবাসী আমার, আমি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর, এই ভাবটা সকলের মনে জাগিলে শিক্ষা চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে।

আজকাল ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে সামাজিক পদ-গৌরব লইয়া একটা কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় চলিতেছে। কায়স্থ, গোপ প্রভৃতি জাতি পৈতা গ্রহণ করিয়া উন্নতির পথে চলিতে বিলক্ষণ চেষ্টা করিতেছে। তাহারা দেখিতেছে—ব্রাহ্মণগণ পৈতার বলে সমাজে সম্মান অর্জ্জন করিতেছেন। কায়স্থকুল ক্ষত্রিয়ের সন্তান, তাহারা কেন যজ্ঞসূত্র মাত্র অবলম্বনে সম্মানের দাবী করিবেন না? গোপ প্রভৃতি জাতিও বৈশ্য-বংশধর,—তাহারাই বা কেন পৈতা গ্রহণ না করিবেন! পিতৃমাতৃবিয়োগে কেন একমাস অশৌচ ভোগ করিয়া এত ক্লেশ স্বীকার করিবেন? এত দীর্ঘকাল অশৌচ পালন করা বিড়ম্বনার একশেষ! বরং পঞ্চদশ দিবসের পর "অশৌচান্তাৎদ্বিতীয়েহহ্নি" বলিয়া শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারেন। ইত্যাদি অতি উৎকট সামাজিক সমস্যাই গ্রাম্য সামাজিকগণের আলোচনা ও গবেষণার বিষয় হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ইহার বিরোধী। সুতরাং সমাজমধ্যে একটা অস্বাভাবিক বলক্ষয়কর অন্তর্বিপ্লব চলিতেছে। একদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের বন্যায় ব্রাহ্মণের পৈতা ভাসিয়া যাইতেছিল, এখন সেই পৈতাকেই, সেই ত্রিগুণ-ত্রিসূত্রকেই উন্নতির সূত্ররূপে লোকে কণ্ঠহার করিবার জন্য ব্যস্ত! আহা! কালস্য কুটিলা গতিঃ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জীবিত থাকিয়া এ অবস্থা দর্শন করিলে, তিনি বোধ হয় অবাক্ হইয়া বলিয়া

ফেলিতেন—"কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্" ? ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ?

আজ উদার ইংরেজ কৃপায় এই দেশে উন্নতির সহস্র দ্বার উন্মুক্ত। ধর্ম্ম ও জ্ঞানার্জ্জনের পথ নিষ্কণ্টক। ধনাগমের পথ প্রশস্ত, মনুষ্যত্ব-লাভের পথ পরিষ্কৃত। উন্নতির পথে কোন কণ্টক নাই। ব্রাহ্মণেরা তাহাতে বাধা দিতেছেন না, বাধা দিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। তাঁহারা ঢোঁরা সাপের ন্যায় (কলির বামণ ঢোঁরা সাপ) নির্বীর্য্য। তবে এত দ্বেষাদ্বেষী, রেষারেষী, লম্ফন-কুর্দ্দন কেন ? কোন কোন নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি এবিষয়ে অশিক্ষিতদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছেন! ইহাতে নিজ ক্ষতি ভিন্ন ইষ্ট কিছুই হইতে পারে না। কোথায় সকলে এক হইয়া নিজেদের অভাব দূর করিয়া সমাজে শান্তি স্থাপন করিবেন, না কোথায় কেবল অনৈক্য, দ্বন্দ্ব-কলহ ও অশান্তির সৃষ্টি করিতেছেন।

প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা জানেন,—কেবল যজ্ঞসূত্রের উপর ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে। শম, দম, তপশ্চরণ, ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের উপরই ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠিত। কায়স্থ প্রভৃতি অপরাপর জাতি যজ্ঞসূত্র পাইয়াই যদি সন্তুষ্ট থাকেন, তবে তাহাতে ক্ষতি কি ? পুরোহিতকুলের বরং লাভই আছে। উপনয়নকালে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইবেই। আবার, অনেক ব্রাহ্মণ বংশধরের এখন উপনয়নের ব্যয় বহন করা ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই। এখন পূর্ব্বকালের শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য কিছুই নাই। উপাসনা, সন্ধ্যাবন্দনাদি নাই। ব্রাহ্মণবালক অন্য বর্ণের বালক হইতে আকারে আচারে সর্ব্ব প্রকারেই অভিন্ন। সূত্রই কেবল ব্রাহ্মণের চিহ্ন, অন্য কেহ এই চিহ্নে চিহ্নিত হইলে, লোকে ব্রাহ্মণকে কিপ্রকারে চিনিয়া লইবে ? এইরূপ আশঙ্কা করা ন্যায়সঙ্গত নহে। ব্রাহ্মণ বলিয়া যদি ব্রাহ্মণের

অভিমান থাকে, তবে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যকে কে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিবে?

যাহা হউক, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এখনও ব্রাহ্মণেরা সমাজে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আসনে উপবিষ্ট। কনিষ্ঠ ভ্রাতার দাবি-আবদার বা প্রার্থনা অর্থশূন্য হইলেও সমাজের অহিতকর না হইলে, তাহা পূর্ণ করা জ্যেষ্ঠের অকর্ত্তব্য নহে। বরং যাহাতে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠে মনোমালিন্য না ঘটে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রবীণের কর্ত্তব্য। সকলেরই বুঝা উচিত যে, এই প্রকার সহস্র অসার আত্মকলহে বিরাটপুরুষের অন্তরাত্মা অনুদিন ব্যথিত হইতেছে। নিজেরা অন্তঃসারশূন্য ও শক্তিহীন হইয়া লঘু হইতে লঘুতর হইতেছি। এই প্রকার আত্মদ্রোহিতায় সর্পদংশনের তীব্রতা না থাকিলেও বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা আছে, দাবাগ্নির চণ্ডতা না থাকিলেও তুষানলের ধিকিধিকি দাহ আছে।

প্রাচীন রোম নগরের অভিজাতবর্গ (Patricians) ও জনসাধারণের (Plebeians) বিবাদভঞ্জনার্থ বৃদ্ধ কন্সাল এগ্রিপার (Agrippa) সাহায্য প্রয়োজন হইয়াছিল। এক্ষেত্রে সেরূপ কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কারণ, সেই বিবাদে আর এই বিবাদে বহু বিভেদ। সেই বিবাদ মানব সত্ব লইয়া, তাহা শক্তির পরীক্ষা, পুরুষোচিত। কিন্তু অত্রত্য আত্মদ্রোহ অসত্য লইয়া, ইহা কাপুরুষোচিত, অক্ষমতার পরীক্ষা। তবে উক্ত কন্সাল (Consul) মহাশয়ের রূপক দৃষ্টান্তটী প্রত্যেক বাঙালীর হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকিলে, বোধ হয়, উপকার হইতে পারে। একদা মুখ, দন্ত, হস্ত, পদ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া উদরদ্রোহী হইল। বিদ্রোহের হেতু এই যে, উদর কেবল অলস হইয়া বসিয়া থাকে, নিজে কোন কাজই করে না। চরণ তাহাকে বহন করে, তবে সে চলে; নহিলে অচল। কর আহার যোগায়, বদন গ্রহণ করে, দশন চর্ব্বন করে,

গলা তাহা গিলিয়া উদরের কাছে উপস্থিত করে, উদর বসিয়া বসিয়া বিনাশ্রমে ভোগ করে। ইহাতে উদরের কেমন পুষ্টি ও স্ফূর্ত্তি! ইহারা সকলে মিলিয়া মন্ত্রণা আঁটিল, ব্যাটাকে জব্দ করিতে হইবে; আমরা কেহই আর ওর কাজ করিব না; এই বলিয়া সকলেই এক-যোগে নিজ নিজ কাজে বিরত হইল। ইহাতে উদর বেচারার যে দশা, হস্তপদাদিরও সেই দশা, অবশেষে শোচনীয় মৃত্যু। আত্ম-দ্রোহিতার পরিণাম ফল মৃত্যু।

আমরা জানি ও বলি "ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ"। কিন্তু পাঁচ জনে মিলিয়া একটা মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে, পাঁচ জনের পাঁচ মত, অনৈক্য, অমনি আরব্ধ কর্ম্মের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, পাঁচে পাঁচ। "দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ" দশে মিলিয়া কোন কাজে হাত দিলে, যদি কোন বিপদের আশঙ্কা হয়, তবে অমনি "চাঁচা আপন বাঁচা" বলিয়া আমরা সকলেই নিজ নিজ পথ খুঁজি।

বক্তা বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া বক্তৃতা দিয়া থাকেন—হিন্দুভ্রাতাগণ! তোমাদের সকলেরই ত এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক স্বার্থ। তোমরা সকলে একমত হও। এক হও। ভাই মুসলমান! তোমার ও হিন্দুর সমান স্বার্থ, সমান সুখ-দুঃখ। বঙ্গভূমি হিন্দুর জননী, তোমারও জননী। তোমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান। একই গ্রামে, নগরে, সমগ্র বঙ্গদেশে তোমাদের একত্র বসতি। তোমরা একই জলাশয়ে স্নান, একই নদীর জলপান, একই ক্ষেত্রের শস্য ভোগ করিয়া আসিতেছ। হিন্দু ও তোমার মধ্যে একমাত্র ধর্ম্মেই বিভিন্নতা দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহাতেও কি ঐক্য নাই? তুমি যে বিশ্বরাজ্যের রাজার উপাসনা কর, হিন্দুও তাঁহারই পূজা করে। প্রার্থনা এক, ভাবনা এক, উপাস্য এক। কেবল মন্ত্রের ভাষা ও ভজন-প্রণালী ভিন্ন। তোমরা অকারণ

ভ্রাতৃদ্রোহী হইলে উভয়েরই স্বার্থহানি ও বলক্ষয় হইবে। অশ্রুজলে জননীরও বুক ভাসিয়া যাইবে। জননীর অশ্রুজল দেখিলে কোন্ সুসন্তান ব্যথিত না হয়? কোন্ কৃতীপুত্রের নেত্রে জল না আসে? তোমরা উভয়ে ভ্রাতৃপ্রেমে মিলিত হইয়া নিজ নিজ উন্নতি সাধন কর; মায়ের মুখ উজ্জ্বল কর। ভগবান্ তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।

মৌলবীসাহেব উপদেশ দিয়া থাকেন—

আগর্ পের্‌দোস্ বর্‌ওয়ে জমিন্ আস্ত্।
হামিন্ আস্ত্ ও হামিন্ আস্ত্ ও হামিন্ আস্ত্॥

অর্থাৎ যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে এইখানে আছে, এইখানে আছে, এইখানে আছে। কবি যে স্থানকে লক্ষ্য করিয়াই কবিতাটী লিখুন না কেন, আমরা বলি, যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে জন্মভূমিই স্বর্গ, জন্মভূমিই স্বর্গ, জন্মভূমিই স্বর্গ। জন্মভূমির ন্যায় পুণ্য মনোরম স্থান জগতে আর কোথায় আছে? ভাই হিন্দু! ভাই মুসলমান! তোমরা সকলে স্বর্গীয়প্রেমে আবদ্ধ হইয়া বঙ্গভূমিকে পের্‌দোস্ (Paradise) করিয়া তোল।

মাষ্টার মহাশয়, কবি লে হাণ্ট (Leigh Hunt) এর 'আবুবিন' (Abu Bin Adhem) কবিতাটী ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া বলেন—প্রেমময়ের প্রিয়তম তিনি, যিনি মানবের প্রতি প্রেমবান্। যিনি সকল মানুষকে ভালবাসেন, ভাই ভাই বলিয়া কোলে নিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত।

'তৃণৈ গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।' তৃণরাশি রজ্জু হ'য়ে, বাঁধে মত্ত গজ। পণ্ডিত মহাশয় হিতোপদেশের এই উপমাটী লইয়া বুঝাইয়া থাকেন—একটা তৃণের দ্বারা কোন কাজই হয় না। তৃণ অসংখ্য হইলেও পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে, কোন কাজ হয় না। কিন্তু যখন উহাদিগকে

লইয়া রজ্জু তৈয়ার করা যায়, তখন রজ্জুতে পরিণত সেই তৃণরাশিদ্বারা মদমত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়। দেখ, একতার বল কত! তোমরা তৃণের মত হেয়-হীন হইলেও একতার বলে বড় বড় কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিবে। একজনের পক্ষে যাহা অসম্ভব, দশ জনের শক্তি একত্র হইলে তাহা সুসাধ্য।

এই সকল কথা শুনিতে বড়ই মধুর, বড়ই উত্তম, কিন্তু ফল বড় কিছু হইতেছে না। কারণ, লোকের হৃদয় হইতে প্রেম চলিয়া যাইতেছে, কাম সেই স্থান দখল করিতেছে। ভ্রাতৃপ্রেম ভ্রাতৃপ্রেম বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? দেহে রোগ জন্মাইয়া, ঔষধ না খাইয়া, ঔষধের নাম স্মরণ করিলে কি ফল? যে আপন ভাইকে ভালবাসিতে জানে না, সে পরের ভাইকে কেমন করিয়া ভালবাসিবে? যদি ভালবাসে, তবে সে ভালবাসা কৃত্রিম। যে সমাজে সোদরে সোদরে মতান্তর, মনান্তর, পিতাপুত্রে অনৈক্য-অপ্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; গর্ভধারিণীকে চোখের জলে ভাসাইয়া, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হইয়া পড়িতেছে, সেখানে স্বদেশপ্রেম কথামাত্রে পর্য্যবসিত। স্বদেশপ্রেম পরিজনপ্রেমের বিরাট সম্প্রসারণ। পরিবারস্থ সকলকে ভালবাসিতে, গুরুজনকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে না শিখিলে প্রতিবেশী, গ্রামবাসী ও স্বদেশবাসীর প্রতি প্রেম জন্মিতে পারে না।

একদিন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন—বল দেখি ভাই, প্রকৃত বল কিসে হয়? ভুজবলদৃপ্ত লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন—'বলং বলং বাহুবলম্'। বাহুবলই বল। প্রেমাবতার বীর রামচন্দ্র বলিলেন—না, তা নয়; 'বলং বলং ভ্রাতৃবলম্'। ভ্রাতৃবলই বল। কাহার কথা সত্য? আমরা কাহারো কথা উপেক্ষা করিতে পারি না।

সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন একটা ব্যক্তিত্ব-স্বাতন্ত্র্য থাকা

আবশ্যক, তেমনি সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-একত্ব থাকা দরকার। বাহুবলের সহিত যুক্ত ভ্রাতৃবল সোনায় সোহাগা। বাহুবলের অভাবে পদে পদে দুঃখ-নিগ্রহ। ভ্রাতৃবলের অভাবে আত্মদ্রোহ, স্বজাতিকলহ। লক্ষ্মণ বাহুবলের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহার ভ্রাতৃপ্রেম জগতে অতুলনীয়। তিনি স্ব-ইচ্ছায় কেবল ভ্রাতৃপ্রেমের অনুরোধে সর্ব্বত্যাগী, বনবাসী হইয়াছিলেন। এমন ত্যাগস্বীকার কে আর কোথায় দেখেছে? রামচন্দ্র বীরের বীর মহাবীর হইয়াও ভ্রাতৃভক্তিতে বিমুগ্ধ, ভ্রাতৃগতপ্রাণ। কিন্তু রামলক্ষ্মণের চরিত্র এখন আর আমাদিগকে ভ্রাতৃপ্রেম শিক্ষা দিতে পারে না! এখন আর এ সমাজে দাদা রাম, ভাই লক্ষ্মণ জন্মেনা! হায়! ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ আমাদের কাছে কে ধরিবে?

ভারতবাসীর বহির্দৃষ্টি নাই, অন্তর্দৃষ্টি আছে, একথা অনেকের মুখে শুনা যায়। 'আছে' না বলিয়া, 'ছিল' বলাই সঙ্গত। এখন অন্তর্দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে, বাহিরের দৃষ্টিও আশানুরূপ প্রসারিত হয় নাই। বাহির আমাদের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র আমাদের ভিতর। অন্তর্দৃষ্টি যদি থাকিত, তবে প্রেমের এত অভাব হইত না।

ভালবাসার কেন্দ্রস্থল 'আমি'। মানুষ 'আমি'কে যত ভালবাসে, এমন আর কাহাকেও নয়। আমি স্ত্রীকে ভালবাসি কেন? স্ত্রী আমার। পুত্রকন্যাকে ভালবাসি কেন? পুত্র আমার, কন্যা আমার। পুত্র অতি কুৎসিত, তবু সুন্দর দেখি! পরের হইলে, সুন্দর দেখিতাম না, ভালবাসিতাম না। তবেই ভালবাসার মূলপ্রস্রবণ 'আমি'। আমার এই অল্প কয়েকজন লইয়া আমি কত সুখী! এই 'আমি' ও 'আমার' যত বাড়ে, ততই সুখের মাত্রাও বাড়ে। বৃহৎ 'আমি' অতি বলবান্। ক্ষুদ্র 'আমি' নিরুপায়। বঙ্গের পুরুষগণ আমার ভাই,

রমণীগণ আমার ভগিনী। ইহাঁদিগকে লইয়া এক অতি বিপুল পরিবার গড়িতে পারিলে, না জানি কতই বল, কতই সুখ! আমরা বাল্যকাল হইতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে শিখিব—

Older, older as I grow,
Brighter, brighter light may glow ;
Country, Continent and the earth,
Be my happy home and hearth.

বয়োবৃদ্ধির সহিত আমার মনে জ্ঞানালোক উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হউক। দেশ, মহাদেশ, নিখিল ভুবন আমার প্রিয় ভবন হউক। বাল্যকাল হইতে ভগবানের নিকট এই প্রকার প্রার্থনা ও শিক্ষার ফলে জ্ঞান ও প্রেম বাড়িতে বাড়িতে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', বিশ্বজনকে আপনার জন করিয়া লইতে পারিলে, বিরাটপুরুষের পূজা সম্পূর্ণ হয়। এইরূপে 'আমি' মহামানব-সমুদ্রে ডুবিয়া গেলে, বিরাট্ দেবতার পূজা পরিসমাপ্ত হয়।

কর্ত্তব্য।

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।" (উপনিষৎ)

'এই পৃথিবীতে আসিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকিতে বাসনা করিবে'। আর্য্যঋষিগণ সবলসুস্থদেহে ন্যূনাধিক একশত বৎসর-কাল সানন্দ মনে কর্ম্মময় জীবন যাপন করিতেন, এবং তদীয় বংশধর আমাদিগকে সেইরূপ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কর্ম্ম করিতে হইবে। 'Labour is life,' শ্রমশীল জীবনই জীবন। কর্ম্মহীন জীবন, মরণ তুল্য।

পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন,—

"I slept and dreamt that life was beauty ;
I woke and found that life was duty."

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম—জীবন বিলাস-সৌন্দর্য্যময়, সখের জিনিষ ; জাগিয়া দেখিলাম—জীবন কর্ত্তব্যময়, সখের জিনিষ নয়। মানব যখন অজ্ঞান অবস্থায়, মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকে, তখন জীবনটা খেলার সামগ্রী বলিয়া মনে করে, কিন্তু মোহ ছুটিয়া গেলে বুঝিতে পারে—

এই পৃথিবী একটা বিশাল কর্ম্মশালা। এখানে সকল মানুষকেই

কর্ম্মের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। সেই আহ্বানে যে কর্ণপাত না করিবে, তাহাকে কোন না কোন প্রকারের দণ্ড ভোগ করিতেই হইবে।

মানব-জীবন কর্ত্তব্যসূত্রে গ্রথিত। 'লোকাহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ'। লোক-সমাজ কর্ম্মডোরে বাঁধা। ঋণজালে জড়িত। জন্মদিন হইতে মহাপ্রস্থানের দিন পর্য্যন্ত এই ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। আর্থিক ঋণ পরিশোধ করা যেমন মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য, সেইরূপ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাহা গ্রহণ করিয়া জীবন পরিপোষণ করে, তাহার প্রতিদান করিতে সে বাধ্য। সভ্যসমাজে পরের সাহায্য না লইয়া কেহই জীবন ধারণ করিতে পারে না। সেই সাহায্য-আদানই ঋণ। সমাজের নিকট সকলেই ঋণগ্রস্ত। সেই ঋণ শোধ করিতে সকলেই ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এবং ইহারই নাম কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যের নির্ণায়ক কে?

আমাদের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া দেয়,—এরূপ কর, ঐরূপ করিও না। পিতামাতা এত দুঃখ করিয়া আমাদের লালনপালন করিয়াছেন, ইঁহাদের দুঃখ দূর করা কর্ত্তব্য, ইঁহাদিগকে সকল রকমে সন্তুষ্ট করা উচিত। একথা প্রকৃতিস্থ সন্তানের মনে স্বতঃই উদয় হয়। অপর কেহ না বলিয়া দিলেও বাল্যে ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার কেমন একটা প্রাণের টান থাকে। কিন্তু এমন দুঃশীল ভ্রাতাও আছে, যে, ভ্রাতা ভগিনীর সহিত কেবল কলহ করে। তখন পিতামাতা সেই দুর্ব্বৃত্ত তনয়কে উপদেশাদিদ্বারা সৎপথে নিতে চেষ্টা করেন। সেইরূপ, গ্রামস্থ-দেশস্থ সকল লোকের প্রতি ভালবাসা মহাত্মাদিগের হৃদয়ে আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যবোধ যেমন সুসন্তানের

স্বাভাবিক, সেইরূপ জননী জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান মহতের মনে স্বতঃই জাগে। কিন্তু এইরূপ স্বাভাবিক জ্ঞান সকলের নাই। মহতের সাধুদৃষ্টান্তে তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগিয়া উঠে এবং বিস্তারলাভ করে। সাধারণ লোকেব ত কথাই নাই, সময়ে সময়ে বিজ্ঞেরাও কর্ত্তব্যনির্ণয়ে সন্দিহান হইয়া থাকেন। সুতরাং নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষী মহাপুরুষদিগের পদচিহ্ন ধরিয়া তাঁহাদের পথে বিচরণ করা সকলের পক্ষেই শ্রেয়ঃ। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। মহাজনগণ যে পথে বিচরণ করিয়াছেন বা করেন, সেই পথই প্রকৃত পথ।' ঈশ্বরানুপ্রাণিত শক্তিশালী মহা-পুরুষগণের উপদেশবাণী শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়া আমাদের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য করে।

মানবের কর্ত্তব্যগুলিকে এই কয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভগবান্ ও নিজের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কর্ত্তব্য।

ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য।

সকল দেশের ধার্ম্মিক সাধুগণ বলিয়া গিয়াছেন, বিশ্বমাঝে যে বিশ্ব-আত্মা বিরাজ করেন, তাঁহার পূজা, আরাধনা সকলেরই কর্ত্তব্য। ঈশ্বরে যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ঈশ্বর উপাসনায় আমাদের পাপরাশি ক্রমে বিদূরিত হয়। কিন্তু আমরা সে বিশ্বাস হারাইতেছি। এবং ভগবানের প্রতি, অবিশ্বাসীর কোন কর্ত্তব্য নাই। পাশ্চাত্যদেশের সংশয়বাদ এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' সন্দেহাত্মা লোক বিনষ্ট হয়। একথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। আমরা মনে মনে সংশয় পোষণ করিলেও সেকথা মুখে প্রকাশ করিতে সাহস পাই না। যেহেতু সংশয়টা তীব্র নহে,

বিশ্বাসও অস্তে যায় যায়। আমাদের মনের অবস্থাটা সন্ধ্যাকালের ঘোর-ঘোর, আধ-আধ ভাব; না-আলোক, না-আঁধার। কোন বিষয়েই আমাদের আট নাই। কোন কিছুই আমরা শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। মনের যেন পক্ষাঘাত রোগ জন্মিয়াছে। আগে ব্রাহ্মণগণ এরোগের চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এখন কি তাঁহারা উদাসীন থাকিবেন?

আজকাল লোকের আয়ু এতই অল্প যে, বৃদ্ধলোকের সংখ্যা খুব কম। যাহারা সৌভাগ্যবশতঃ বার্দ্ধক্যে উপনীত হন, তাহাদের নিকটও বালকেরা ধর্ম্মকথা শুনিতে পায় না। কিন্তু তাসপাশা খেলিতে শিখে।

'বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।'

বৃদ্ধ হইয়াও তাহারা বৃদ্ধ নয়, যাহারা ধর্ম্মকথা বলে না। ধর্ম্মের বক্তা বা শ্রোতা আজকাল দুর্লভ। কারণ ধর্ম্মকথা আমাদের ভাল লাগে না। যাহারা বৃদ্ধকালে ধর্ম্মার্জ্জন করিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, তাহারাও শিক্ষার অভাবে বা অভ্যাসের দোষে ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারে না। 'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে'। বিষয়চিন্তা করিয়া পুরুষ বিষয়ের প্রতি অতিমাত্র আসক্ত হইয়া পড়ে। তাহার মন কেবল বিষয় ভাবনাই করে। ঈশ্বর উপাসনা করিতে গিয়া বৃদ্ধের অবাধ্য মন নানা দিকে ধায়। টাকার কথা, মোকদ্দমার কথা, কত কথাই তাহার মনে পড়ে। বস্তুতঃ বাল্যকাল হইতে ঈশ্বর-আরাধনায় অভ্যস্ত না হইলে শেষে ধর্ম্মার্জ্জন সুকঠিন হইয়া পড়ে।

আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহা আছে, তাহা প্রাণহীন, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ। আমরা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য নিজে করিতে চাই না, অন্যের দ্বারা করাইয়া লই। শিক্ষকমহাশয় ছাত্রকে বলিয়া থাকেন—মন দাও, বিদ্যা নেও। বিদ্যার মূল্য মন, বেতন নহে। সেইরূপ ধর্ম্মগুরুর আদেশ এই যে—হৃদয়

দেও, ঈশ্বরপ্রসাদ নেও। ভগবানকে হৃদয়মাঝে বসাইয়া নিজে তাঁহার পূজা কর। তাঁহার উপাসনায় টাকা পয়সা কিছুই লাগেনা, পশুবলিরও প্রয়োজন হয় না। অহঙ্কারকে বলি দেও। নীরবে বিনা আড়ম্বরে গোপনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে ডাক। তাঁহার মহীয়সী শক্তিতে নির্ভর কর।

ঈশ্বরে ভক্তি-বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বালকদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ শুনাইতে হইবে, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আরাধনা করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার উপদেশ কয়জনে পালন করে?

নিজের প্রতি কর্ত্তব্য।

ভগবান্ আমাদিগকে স্নেহ, দয়া প্রভৃতি সংবৃত্তি দিয়াছেন। সেগুলির সংব্যবহার, সংরক্ষণ ও উৎকর্ষসাধন করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ও শক্তি দিয়া তিনি আক্ষুদ্র সকলশ্রেণীর প্রাণীকেই এখানে পাঠাইয়াছেন। আত্মরক্ষা প্রাণীমাত্রেরই ধর্ম্ম। কিন্তু আত্মরক্ষা ও আত্মত্যাগেই মানুষের মনুষ্যত্ব।

নিজের সহিত প্রকৃত পরিচয় হওয়া আবশ্যক। আমি কে, আমি কি, আমার কতটুকু শক্তি আছে, দোষ না গুণ কি, দুর্ব্বলতা কোথায়, ইত্যাকার বিচার পূর্ব্বক আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন। এবিষয়ে পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী নিজেই। নিজকে নিজের নিকট পরীক্ষা দিতে হইবে। এই পরীক্ষার উপযুক্ত পরিচালনা মনুষ্যত্বলাভে আনুকূল্য করিবে। পরচ্ছিদ্র অন্বেষণ না করিয়া আত্মচ্ছিদ্রান্বেষী হইলে বিশেষ লাভ আছে। নিজের শক্তির পরিচয় পাইয়া, সেই শক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে পারিলে, শক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে। আবার, আমি অশক্ত-অক্ষম, এই প্রকার যাহার ধারণা, শক্তি থাকিতেও সে শক্তিহীন। পরের

শক্তিতে কেহ কখনো শক্তিশালী হইতে পারে না। আত্মনির্ভর না থাকিলে কেহই মনুষ্যপদবীর অধিকারী নহে।

সকলেই যদি আত্মনির্ভরশীল হয়, তবে একতার বিঘ্ন জন্মিবে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। বরং আত্মনির্ভব না থাকিলেই লোকের মধ্যে একতার অভাব হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। স্বাবলম্বন আর সম্মিলন পরস্পরবিরোধী নহে, প্রত্যুত অনুকূল। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও নিজের সুখসুবিধার জন্য, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বনের প্রয়োজন। আবার দশের কাজে দশের সহিত ঐক্য-মিলন আবশ্যক। যে সকল জাতি আত্ম-নির্ভরশীল, তাহারা কেমন একতাপ্রিয়! যেখানে স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন, সেখানে সকলেই পৃথক্ পৃথক্। যেখানে একতার দরকার, সেখানে সকলে একজোট।

ভদ্রলোকের মানবক্ষা করা যেমন ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য, সেইরূপ নিজে ভদ্র বলিয়া জ্ঞান থাকিলে, আপনার মান রক্ষা করিবার ইচ্ছা আপনা হইতেই হয়। যাহার আত্মসম্মান বোধ আছে, তিনি পরের প্রাপ্য মানদানে কুণ্ঠিত নহেন; আবার, নিজের সম্মান রক্ষা করিতেও বদ্ধকক্ষ। পরকে মানদান করিবে, পরের নিকটও নিজের প্রাপ্য মান আদায় করিবে। মানুষ বলিয়া যাহার জ্ঞান আছে, তাহারই আত্মমর্য্যাদা আছে। কিন্তু অহঙ্কার থাকা অনুচিত। আত্মপরীক্ষার অভাবে অহঙ্কার আসিতে পারে। ইহা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভগবানে নির্ভর করিতে হইবে। আবাব, আত্মশক্তির উপর নির্ভর এবং আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানও থাকা চাই। ইহা বিসদৃশ কি না? শ্রীচৈতন্য উপদেশ দিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণ অপেক্ষাও নীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, মানশূন্য ও মানপ্রদ হইয়া, সদাকাল হরি কীর্ত্তন করিবে।

এ কথার সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত কথার মিল কোথায়?

নারায়ণ অনন্ত-শক্তি, আমি অতি ক্ষুদ্র শক্তি, অনন্তশক্তির কাছে আমার শক্তি তুচ্ছ, আমি তৃণ হইতেও হীনশক্তি। নারায়ণ আমাকে যত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া রাখুন না কেন, আমি অম্লানবদনে সহ্য করিব। নারায়ণ যিনি জগৎ পূজ্য, তাঁহার প্রতি ভক্তি সম্মান দেখাইব, তাহার পূজা করিব, তাঁহার কাছে আবার আমার মান কোথায়? এই প্রকার ভাব লইয়া ভগবানকে ভজিব। ভগবানের সেবায় এই ভাব, কিন্তু সংসারক্ষেত্রে এই দৈন্য কাপুরুষোচিত। আমি দীনহীন, অধম-অক্ষম, এইরূপভাব মনের মধ্যে সর্ব্বদা জাগিতে থাকিলে, মানুষের কর্ম্মক্ষমতা ও পুরুষত্ব ক্রমে লোপ পায়। আর, যে পর্য্যন্ত ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারা যায়, সে পর্য্যন্ত আত্ম নির্ভর থাকা আবশ্যক।

আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন।

পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়াই দলেদলে উমেদারদল তীর্থযাত্রীর ন্যায় বিদেশ-যাত্রায় বহির্গত হয়। বিদেশ বলিতে নিজের জেলা বা পার্শ্ববর্ত্তী দুই একটী জেলাই বুঝায়। কাহারো কাহারো প্রতি লক্ষ্মী এমনই অপ্রসন্ন যে,—অনাথ কুকুরের ন্যায়, ইহাদের 'ভোজনং যত্র কুত্রাপি শয়নং হট্টমন্দিরে'। ভোজন, এখানে-ওখানে, শয়ন হাটের দোকান-ঘরে। আজকাল অনেকেই ঘরের বাহির হইয়া চাকরি করিতে শিখিয়াছে বটে, কিন্তু সকলেই পদস্থ হইতে পারে না। কেহ কেহ যৎসামান্য চাকরি করিয়া দিন যাপন করে, স্ত্রীপুত্রাদি সঙ্গে রাখিতে পারে না।

বৎসরান্তে একমাস গৃহবাসী হইতে পারে। ইহাদের পারিবারিক জীবন নাই বলিলেই হয়, সুতরাং কর্ত্তব্যপালন নাই।

যাহারা উচ্চপদস্থ, অধিক আয়বান্, যাহারা বিদেশে কর্ম্মস্থলে পরিবার নিয়া থাকেন, তাহারাও পারিবারিক কর্ত্তব্যপালনে অবসর পান না। প্রায় সকলেই সকালবেলা গাত্রোত্থানের পর, চা-চুরট-পানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে, গৃহে আনীত আফিসের কাগজপত্র পরিদর্শনাদি কার্য্যে কিয়ৎকাল তৎপর থাকেন। তৎপর, কাকস্নান, গোগ্রাসে ভোজন, এবং নাটকীয় পাত্রের ন্যায় নেপথ্যবিধান পূর্ব্বক কর্ম্মশালা-অভিমুখে চঙ্ক্রমণ, অবশেষে গোধূলি-লগ্নে মন্থরগমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, ইত্যাকার দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালীই অনেকের জীবননির্ব্বাহ-প্রণালী দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ গৃহে ফিরিয়া গৃহিণী বা বন্ধু বান্ধবের নিকট আফিসের গল্প ও ঈশ্বরীয় কথার পরিবর্ত্তে মানবপ্রভুর কথা বলিয়া সায়ংকৃত্য সমাপন করেন।

আবার, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছতি।" বাড়ীই যাহাদের সাধের বৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবন ছাড়িয়া যাহারা এক পাও ফেলেন না, এমন ভদ্রলোকদের মধ্যে কেহ কেহ পরপিণ্ডোপজীবী, কাণ্ডজ্ঞানহীন। "ইহাদের কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই"। কেহ বা তাহাতে আরো দুই কর্ম্ম—তাসপাশাখেলা ও পরনিন্দা যোগ করিয়া কর্ম্মের সংখ্যা দ্বিগুণ করেন। ইহারা কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বচনে মারে পুঁড়ে'। আর এক শ্রেণীর জীব আছেন, তাহারা সুচতুর বুদ্ধিমান্ বলিয়া গ্রামদেশে খ্যাতিমান্। লোকদিগকে মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শ দেন, সাক্ষ্যদানে সহায়তা করেন, সামাজিকতায় সিদ্ধহস্ত। দলাদলির কলকাঠী তাঁহাদের হাতে। তাঁহারা শরণাগত প্রতিবেশীর অভয়দাতা, প্রতিদ্বন্দ্বীর সর্ব্বনাশকর্ত্তা। এমন কি, মৃত্যুকালেও তাহার লাঞ্ছনা করিতে

পশ্চাৎপদ নহেন। জীবদ্দশায় শত্রুকে অশান্তির অনলে দগ্ধ করিয়া অবশেষে তাহার মৃতদেহ যেন দগ্ধ না হয়, সেই বিষয়ে ও শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কার্য্যে বিঘ্ন জন্মাইতে যত্নের ত্রুটী করেন না। তাঁহারা এমনই কর্ম্মঠ যে, যে কোনরূপ অপকর্ম্মকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া সম্পাদন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। কোন কোন কবি গ্রাম্যজীবনের সরল সৌন্দর্য্যের মনোহর ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু হায়! সে সরলমাধুর্য্য কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে, খুজিয়া পাওয়া দায়!

সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেকের নিকট ঋণী, একথা বুঝা বড় কঠিন। বুঝিলেও আমরা কার্য্যদ্বারা বুঝাইতে পারি না। কিন্তু নিজ পরিবারস্থ সকলের সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য আছে, ইহা বেশ বুঝি। আমরা স্ত্রীকে গয়না দিতে শিখিয়াছি। যুবতী পত্নীকে বসাইয়া রাখিয়া হয়ত বৃদ্ধা জননীর উপর রান্নার ভার চাপিয়া দিয়াছি। খোকাবাবুকে ভাল ভাল পোষাক পরাইয়া বাবু সাজাইয়া থাকি। হয়ত ইহাদের চিকিৎসার জন্য গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছি।

সাধারণতঃ বাঙালীর গার্হস্থ্যজীবন ও সামাজিক জীবন একত্রে গ্রথিত, অভিন্ন। কারণ, দোকানদার, কৃষক, ভদ্রাভদ্র, শ্রমজীবী ও বাবুগণ সকলেই স্ব স্ব ক্ষুদ্রায়তন কর্ম্মক্ষেত্রেরই সহিত সংস্রব রাখেন। আমাদের সমাজ-জ্ঞানটা অতিক্ষুদ্র। সমাজটা মাত্র কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট লোক লইয়া। কেবল তৈল তণ্ডুল-চা চিনি-সেমিজ-কামেজ প্রভৃতি দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ই অব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীর নিত্যকর্ম্ম। ইহা ব্যতীত উচ্চতর কর্ত্তব্য জীবনে যে কিছু আছে, তাহা অনেকেরই ধারণা নাই, থাকিলেও সুব্যক্ত নহে।

প্রথমতঃ কর্ত্তব্যের জ্ঞান, পশ্চাৎ সাধন, অগ্রে সদসৎ বিচার, উচিত অনুচিত বোধ, শেষে অনুষ্ঠান। আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান লুপ্ত না হইলেও সুপ্ত। ইহাকে জাগাইতে হইবে। কেবল পারিবারিক ক্ষুদ্র কয়েকটী

কর্ত্তব্য প্রতিদিন পালন করাই জীবনের উদ্দেশ্য নহে। মহত্তর পরার্থ কর্ত্তব্যপালনেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। ইহাতেই ঊর্দ্ধগতি, উন্নতি। অতি নিম্নশ্রেণীর কর্ত্তব্য অথবা যাহা উন্নতব্যক্তির অকর্ত্তব্য, অক্ষম-অযোগ্য ব্যক্তি তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে।

আগে পরিবার বলিতে একত্রাবস্থিত পিতামাতা, খুড়-জেঠা, ভাই-ভগ্নী প্রভৃতি অনেক আত্মীয় স্বজনকে বুঝাইত। এখন কেবল স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়াই অনেক শিক্ষিত পরিবার গঠিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে পিতা-মাতাকেও বাদ দেওয়া হয়। এখন স্নেহ ঊর্দ্ধগামী না হইয়া কেবলই নিম্নগামী। পিতৃমাতৃভক্তি, সোদরপ্রীতি ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতেছে, এবং স্ত্রীভক্তি, অপত্যস্নেহ লোকহৃদয়ে ষোলআনা বিরাজ করিতেছে। এখন আর কুটুম্বভরণ, আত্মীয়পোষণ বড় নাই। গৃহস্থ জীবনের অনেক কর্ত্তব্যে বাধা পড়িয়াছে।

সমাজ সহস্র সহস্র বিভিন্ন পরিবারের বিরাট্-সমষ্টি; সুতরাং সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্য পারিবারিক জীবনের কর্ত্তব্যানুরূপ। স্নেহ-প্রেম-দয়া, ধৈর্য্য-শৌর্য্য, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতি গুণ উভয়ত্রই আবশ্যক।

মানবজীবনে অসংখ্য কর্ত্তব্য। তাহা আবার জাতিভেদে, সমাজভেদে, ব্যক্তিভেদে, সময়ভেদে বিভিন্ন। সুতরাং মানবের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা বড় কঠিন কার্য্য।

শাস্ত্রে যে সকল কর্ত্তব্যের কথা উল্লিখিত আছে, তাহার অনেকগুলিই এই দুইটী কথায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে। (১) পরের উপকার কর। যেমন দান, আতিথেয়তা ইত্যাদি। পরের অপকার (হিংসা প্রভৃতি) করিও না। (২) নিজের উপকার কর, অপকার করিও না।

দান।

সংসারের প্রায় সকল কার্য্যই দান-আদান, দেওয়া-নেওয়া, এবং আদান-প্রদান, নেওয়া-দেওয়ার উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছে। যাঁহার যাহা আছে, তিনি তাহা দান করেন। যাহার যাহা নাই, সে তাহা গ্রহণ করে। দাতা ও গ্রহীতা লইয়া সমাজ। দাতার প্রতি গ্রহীতারও কর্ত্তব্য আছে। দাতা উপকারী, শ্রদ্ধার পাত্র। পিতামাতা জন্মদাতা, সস্নেহে অন্নবস্ত্রাদি দিয়া শিশুসন্তানদিগকে লালনপালন করেন, তাঁহারা পুত্রকন্যার ভক্তিভাজন। প্রজাবৎসল রাজা ভয়ত্রাতা, অভয়দাতা। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ন্যায়ধর্ম্মের সংস্থাপন করিয়া প্রজার অশেষ উপকার করিয়া থাকেন। রাজভক্তি প্রদর্শন করা প্রজার কর্ত্তব্য। গুরু জ্ঞানদাতা, শিষ্যের ভক্তিভাজন। যিনি উপকারী, তাঁহার অনুগত-বাধ্য হওয়া, যথাশক্তি প্রত্যুপকার করা উপকৃতের অবশ্য করণীয়। অন্য কোন প্রকারের প্রতিদান করিতে না পারিলেও অন্তরের কৃতজ্ঞতা, ভক্তি-অনুরাগ দেখাইতে সকলেই পারে। সর্ব্বোপরি যিনি সর্ব্বমঙ্গলালয়, সর্ব্বসুখস্বরূপ, সেই ভুক্তিমুক্তিদাতা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিমান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

সমাজে অসংখ্য প্রকারের দান আছে। কিন্তু যিনি অকাতরে অর্থদান করেন, তিনিই সাধারণতঃ 'দাতা' নাম পাইয়া থাকেন।

দাতা বটে কোন্ জন ?
দেয়, কিন্তু চায়না কখন।

বাস্তবিক তিনিই দাতা, যিনি প্রতিদানে কিছুই চান না। যিনি দিয়াই সুখী, কিন্তু মান যশ উপাধি কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না কিম্বা পরের দ্বারে কখনো অর্থ বা অন্য কোন কিছু ভিক্ষা করেন না, তিনি দাতা।

যে যাচ্ঞা করে, সে ভিক্ষুক, দাতা নহে। অবশ্য জ্ঞান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে একথা খাটে না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাকারীকেও ভিক্ষুক বলা যায় না।

দানের জন্য ভারত চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু আজকাল দাতার সংখ্যা কমিতেছে। কারণ, আমাদের অভাব অনেক বাড়িয়াছে, মনটাও কৃপণ হইয়াছে। তথাপি শিক্ষার উন্নতিকল্পে কোন কোন মহাত্মা দান করিয়া আসিতেছেন। পুঁটিয়ার প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী, কাশিম-বাজারের দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী, বঙ্গের সৌভাগ্য বশতঃ, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া পুণ্যদানব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই বিপুল অর্থ পরার্থে ব্যয় করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

মহামনা ভূদেব মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি মহানুভব তারকনাথ পালিত ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ প্রত্যেকে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বহুলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই প্রকার বিপুল অর্থ দানের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, ফল বহুকালস্থায়ি, দেশব্যাপি। ভূদেবের দান তুলনায় অল্প হইলেও, আয়ের অনুপাত অনুসারে অতি বড়।

আতিথেয়তা।

'সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ'। অতিথির মধ্যে সকল দেবতার অধিষ্ঠান। 'অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে'। শত্রু হইলেও গৃহাগত অতিথির আদর অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিবে না। শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ অনেক আছে। আগে অতিথিসৎকার গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। অতিথির পূজা করিতে লোকের কত আগ্রহ ছিল, তাহা বৃদ্ধেরা জানেন। এখানে এক মহাত্মার কথা বলিতেছি। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরনিবাসী কালীকুমার দত্ত মহাশয় ময়মনসিংহে একজন

শ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। তাঁহার উপার্জ্জনের প্রায় সমস্তই অতিথি-সেবায়, কন্যাদায়গ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত দরিদ্রলোকের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইত। তাঁহার বাসাবাড়ী একটী অন্নসত্র বিশেষ ছিল। সেখানে থাকিয়া অনেক অনাথ উমেদার, অল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারী, দরিদ্র ছাত্র নিয়ত আহার পাইত। ইহার উপর, অনেক আগন্তুক অতিথি প্রায় প্রত্যহ আসিতেন। অতিথি-দিগকে তিনি অতিশয় আদর যত্ন করিতেন। তাহাদের জন্য অনেক প্রবস্ত বিছানা রাখিতেন। অভাব হইলে, নিজের বিছানাও তাহাদিগকে দিয়া নিজে সামান্য শয্যায় শুইতেন। তাঁহার নিকট দান চাহিয়া কেহই বিমুখ হয় নাই। এই জন্যই তিনি লোকের নিকট 'দাতা' উপাধি পাইয়াছিলেন। লোকমুখে শুনা যায়, তাঁহার এইরূপ নিয়ম ছিল যে—তিনি সকলের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিতেন। সকলে যাহা খাইতেন, তিনিও তাহাই খাইতেন। তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র পাক হইত না। একদিন ভোজন কালে সকলকেই দুধ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিজের দুধের বাটীতে দুধ কিছু বেশী পড়িয়াছে মনে করিয়া তিনি অতি দুঃখিত হইলেন। তারপর ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি অবাধ্য চাকর; তোমাকে স্পষ্ট বলিয়াছি, সকলকেই সমান দিতে হইবে। আমাকে কেন দুধ বেশী দিলে? চাকর বলিল—আজ্ঞে না, বেশী দেই নাই। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি চাকরটীকে জবাব দিলেন।

আগেকার লোকে এই প্রকারেই অতিথির সেবা করিতেন। কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই। আজকাল সকলেই নিজ উদরের সৎকার করিবার জন্য ব্যাকুল। অতিথি সৎকার করে কে? আমরা সার বুঝিয়াছি—'অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ।' কুলশীল জানিনা এমন অপরিচিত লোককে স্থান দিতে নাই। সহরে

ভদ্র পরিবারে আহারাদি শেষ হইয়া গেলে, অন্যের ত কথাই নাই, স্ত্রীর বাপ-ভাই আসিলেও বোধ হয় তাহাদের ভাগ্যে অন্ন জোটে না, মিষ্টান্ন জুটিতে পারে। কুটুম্বের কাছে হয়ত গিন্নী আসিয়া বলেন—কয়লার পাক, উনুন জ্বালান বড় কষ্ট, এবেলা না-হয় ভাত না-ই হইল। হায়! সভ্যতার খরতাপে, কয়লার জ্বালে রমণীহৃদয়ের কোমলবৃত্তিগুলিও শুকাইয়া যাইতেছে! পল্লীগ্রামেও প্রায় এই অবস্থাই দাঁড়াইয়াছে।

অহিংসা।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম। 'Harm not, hurt not.' কাহারো অহিত-অনিষ্ট করিও না। প্রায় সকল উদার শাস্ত্রেই এই নীতির কথা শুনা যায়। আমরা ব্যাঘ্রাদি পশুদিগকে হিংস্রক বলিয়া থাকি। কিন্তু পশুর যদি বাক্‌শক্তি থাকিত, তবে সে নিশ্চয়ই বলিত, 'মানুষের ন্যায় হিংসালু জীব দ্বিতীয় নাই। ব্যোমবিহারী কত বিহঙ্গ ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। জলসঞ্চারী ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত অসংখ্য মৎস্য প্রতিদিন ধীবরের জালে বদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়। ধনী, জমিদার, মৃগাবিৎ মৃগয়াচ্ছলে বিজন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বৎসর বৎসর কত মৃগমৃগীর প্রাণসংহার করেন। কত হংস-কবুতর, ছাগ-ছাগী অপত্যস্নেহে গৃহে পালিত হইয়া গৃহস্থ-ঘাতকের নির্ম্মমহস্তে নিহত হয়, কে তার সংখ্যা করে! ইহারা নিরীহ জীব। মানুষের বধ্য কেন? কোন্ অপরাধে ইহাদের প্রাণ নেওয়া হয়? হায়! দগ্ধোদর! তোমার জন্যই কি পশুর সৃষ্টি! তোমার জন্যই কি পক্ষীর জন্ম! যে গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া তুমি তৃপ্ত, সেও তোমার জন্য জীবন হারায়!

পশুপক্ষীকে ইতর জন্তু বলিয়া মানুষ ঘৃণা করে, মানুষকে নাকি খুব ভালবাসে। কিন্তু হায়! মানুষ মানুষকে যত হিংসা করে, এমন ত

আর কেহ করে না। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত যুদ্ধে, বিনা যুদ্ধে, মানুষের হাতে যত মানুষ মারা গিয়াছে, তার সহস্র ভাগের এক-ভাগও পশুজাতি বধ করে নাই। হিংসক কে? পশু, না মানুষ?

এমন লোক প্রায় দেখা যায় না, যে জীবনে কাহাকেও হিংসা করে নাই। সংসারে কেবল হিংসা আর প্রতিহিংসা। তাই বিশ্বকারুণিক মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন—জীবে দয়া পরম ধর্ম্ম।

অতি সংক্ষেপে অল্পকথায় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কর্ত্তব্য এই—বড় হও। গায়-পায় বড় হও। মাথাটা আর বুকটাকে বড় কর। আত্মীয় স্বজনকে লইয়া, নিজগ্রামের, নিজ দেশের সকলকে লইয়া বড় হও।

বড় কে?

আত্মাটা যাঁর বড়, তিনিই বড়। আত্মশক্তিবলে যিনি সংসারে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, তিনি বড়। নিজ শক্তিতে আমরা কে কত মহৎ কর্ম্ম করি, তাহা বর্ত্তমান সভ্যসমাজের কর্ম্মরাশি এবং আমাদের কৃত কার্য্যাবলীর তুলনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। বড় কর্ম্ম করিয়াই লোকসমাজ বড় হয়। কিন্তু আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখি নাই বলিয়া আমাদের কর্ম্ম ক্ষুদ্র। চীন-রমণী সৌন্দর্য্যের খাতিরে পাদুখানিকে ছোট করেন। ছোট হওয়ার দরুণ নিজ পায়ে দাঁড়াইতে না পারিয়া যদি সখীর স্কন্ধে ভর করিয়া চলেন, তবে তাহা তত লজ্জার বিষয় নহে, যেহেতু তিনি রমণী। কিন্তু পুরুষ হইয়া যদি কেহ নিজ পায়ে দাঁড়াইতে না পারে, তবে ইহা বড়ই লজ্জার কথা।

আমরা নিজকে নিরুপায় করিতে জানি, নিরুপায় হইয়া কেবল

কাঁদিতে পারি। কর্ম্মের পথ একটু পিচ্ছিল হইলেই অশ্রুজল ঢালিয়া আরো পিচ্ছিল করিয়া তুলি। কঠিন পাথর-মাটীতে হাটিতে যাইয়া পায়ের ব্যথায় কাঁদিয়া ফেলি। কিন্তু অশ্রুজলে পাষাণ গলে না, একথা ভুলিয়া যাই। ভুলিয়া যাই,—

রোদন আর অশ্রুজল,
অবলা জনেরই কেবল।

আমরা কাঁদি সত্য, কিন্তু একাকী, নিজের দুঃখে। পরকে লইয়া নয়, পরের দুঃখে নয়। যে পরের দুঃখে কাঁদে, সে পুরুষ। নিজের দুঃখে কাঁদে যে, সে কাপুরুষ। আমাদের কর্ম্মে পৌরুষের অভাব। পৌরুষহীন কর্ম্ম করিয়া কেহ বড় হইতে পারে না। বড় কর্ম্মই মানুষকে বড় করে।

বড় কর্ম্ম কি ?

যে কর্ম্মের ফলে বহুলোক বহুকাল সুখভোগ ও উন্নতিলাভ করে, তাহা বড় কর্ম্ম। যেমন কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার। বিত্তবিভব, পদগৌরব প্রকৃতপক্ষে বড়ত্বের কারণ না হইলেও আজকাল সভ্যজগৎ ধন-ঐশ্বর্য্যের বলে বড় বলিয়া মনে করে। জার্ম্মেণি প্রভৃতি দেশের লোকেরা বুদ্ধি-কৌশলে, কলে-কলে সাইকেল, দেশলাই, ঘড়ি ছড়ি কাগজ কলম প্রভৃতি কত কত জিনিষ তৈয়ার করিতেছে, আমরা এখানে বসিয়া বিনাশ্রমে মনের সুখে সে সব উপভোগ করিতেছি। বস্তুতঃ আমাদের আদান আছে, প্রদান নাই। ক্রয় আছে, বিক্রয় নাই। আমাদের বহির্বাণিজ্য নাই। বাণিজ্য অর্থ আদান-প্রদান, ক্রয়বিক্রয়। বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ধনবৃদ্ধি। সভ্যসমাজ প্রধানতঃ শিল্পদ্রব্য লইয়াই বাণিজ্য করে। তদ্দ্বারা প্রভূত ধন অর্জ্জন করে। আমরাও কল কারখানা করিয়া বহু

প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া জাহাজ নির্ম্মাণ বা ক্রয় করিয়া সাগর পার হইয়া দূর আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে যাইয়া বাণিজ্য করিব। ইহা বড় কর্ম্ম।

কিন্তু অত বড় আড়ম্বরের কথায় কাজ নাই। আমরা নিরীহ-নিস্পৃহ জাতি। দেশে থাকিয়াই যেমন পারি ব্যবসা বাণিজ্য করিব। বেশ কথা। নিজ সমাজের কাছে সকলেই সকলটা চাহিবে, সমাজও সকলের সকল অভাব দূর করিবে। ইহাও বড় কর্ম্ম। যে সমাজ, সকল লোকের অন্নবস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইতে পারে, সে সমাজও ধন্য। ইহারই জন্য সমাজে কর্ম্মবিভাগ আবশ্যক। কৃষক ও তাঁতিকুল অন্ন বস্ত্র যোগাইতে না পারিলে লোকসকল অন্য সমাজের মুখপ্রেক্ষী হয়। প্রতি ব্যক্তির ও প্রতিবর্ণের কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্যের অপালনে অধর্ম্ম ও অমঙ্গল। আজকাল সভ্যজাতি সমূহ শিল্পবাণিজ্য ব্যবসায়ী। আমাদেরও প্রধানতঃ সেইরূপ শিল্পী-বণিক্ হইতে হইবে।

বড় হওয়ার পথে কণ্টক।

হিতোপদেশকার বলিয়াছেন—অলসতা, রুগ্নতা, ভীরুতা, স্ত্রৈণতা, বিদেশগমনবিমুখতা এবং হীনাবস্থাতেও সন্তোষ এই ছয়টী দোষ মহত্ত্বের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। এই কয়েকটীর একটী থাকিলেই মহত্ত্বলাভ দুঃসাধ্য, সবগুলি থাকিলে ত আর কথাই নাই।

আলস্য ও রুগ্নতা।

কর্ত্তব্যসাধনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা। শরীরে বল না থাকিলে যেমন বলের কার্য্য করা অসম্ভব, সেইরূপ মনের দৃঢ়তা ও ইচ্ছার বল না থাকিলে, বৃহৎ কর্ম্ম আরম্ভ হইতে পারে, কিন্তু

শেষ হয় না। সাহস-উদ্যম, উৎসাহ-স্ফূর্ত্তি ও ইচ্ছা-আনন্দ কর্ম্মের প্রাণ। বলের অভাবে এই সকল গুণ থাকিতে পারে না। দুর্ব্বল ব্যক্তি বাছিয়া বাছিয়া ক্ষুদ্র কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে। উচ্চ, মহান্ কর্ম্মকে (যাহার সাধনে বল-বীর্য্য, পৌরুষ-সাহসের আবশ্যক) কর্ত্তব্যের তালিকা হইতে খারিজ করে। পুরুষোচিত শ্রমসাধ্যব্যাপারে উপেক্ষা ও পরাঙ্মুখতায় পুরুষত্ব ক্রমে স্ত্রীত্বে পরিণত হয়। পুরুষ তখন কর্ম্মের মহিমা ভুলিয়া জড়িমা লইয়া অচল হইয়া পড়ে।

আমরা অনেকেই যে রুগ্ন-দুর্ব্বল, আমাদের শরীরটাই তার সাক্ষী। দেহের ভিতরে দুই একটা রোগ বাড়ী-ঘর করিয়া বসে নাই, এরূপ বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প। অন্য কোন রোগ না থাকিলেও দুর্ব্বলতা-রোগ প্রায় সকলেরই আছে। ইহা দূর করা বড় কর্ম্ম।

অলসতা সকল অনর্থের মূল; সর্ব্বদোষের আধার, নরকের দ্বার। ইহা সুখস্বাচ্ছন্দ্য, এমন কি জীবনশক্তিকে পর্য্যন্ত হরণ করে। রোগ-শোক, দুঃখ্য-দারিদ্র্য ইহার সহচর। অলসের মন সয়তানের প্রিয় নিকেতন। আজকাল আমরা বাবু হইতে শিখিয়াছি। বাবু নামে আমাদের বড় আনন্দ। কিন্তু 'বাবু মরে ভাতে আর শীতে'। অলস-বিলাসীর ভাতও জোটে না, শীতকালের শীতও ছোটে না। কেহ কেহ বলিবেন, এখন আর আমাদের পূর্ব্বকালের জড়তা নাই। বড় বড় সহরে গেলে আমারা দেখিতে পাই, পিপড়ের জাঙ্গালের মতন লোক সকল কেবল নানাদিকে যাতায়াত করিতেছে। সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত; কেহই পরের কথা মুহূর্ত্তকালও চিন্তা করিতে অবসর পায় না। কিন্তু এত যে ব্যস্ততা ও কর্ম্মকোলাহল, এত যে ছুটাছুটী, তার ফল অতি সামান্য। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। পর্ব্বতের মূষিকপ্রসব। সারানিশি জাগিয়া থিয়েটার ঘরের দ্বারে বসিয়া পানের খিলি বেঁচিয়া, সারাদিন

দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মুড়ী-মুড়কী-মিঠাই বেঁচিয়া, অথবা এইরূপ ক্ষুদ্রকর্ম্ম করিয়া, কিম্বা চাকরি করিয়া কোন সমাজই বড় হইতে পারে না।

ভীরুতা ও স্ত্রৈণতা।

আমরা যে ভীরু সেই সার্টিফিকেট আমরা অনেক দিন পাইয়াছি। বড় কর্ম্ম করিতে গেলেই সাহসের প্রয়োজন। সাহসের কর্ম্মে ভীরু কেবল বিপদ্ গণে, সুতরাং বিরত থাকে, বড়ও হইতে পারে না।

আমাকে ভীরু-অলস বলিলে তত দুঃখ হইবে না, কিন্তু স্ত্রৈণ বলিলে গালি মনে করিয়া রাগ করিব। এ অবস্থায় কে কারে স্ত্রৈণ বলিতে যাবে ? কিন্তু এ কথা সত্য যে, দুর্ব্বলের প্রতি কাম বিলক্ষণ বলপ্রকাশ করে এবং কামে স্ত্রীপরায়ণতা জন্মে। লোক কামান্ধ হইলে কর্ত্তব্যজ্ঞান হারায়, হীনশক্তি হইয়া পড়ে, সুতরাং বড় হইতে পারে না।

বিদেশগমন-বিমুখতা।

আজকাল বিদেশ ও সমুদ্রের নামে আমাদের মনে আতঙ্ক হয় না বটে; কারণ, আমরা ভূগোল পড়িয়া পৃথিবীর অনেক দেশ ও সমুদ্র কণ্ঠস্থ করিয়াছি। মানচিত্রেও সে সব দেখিয়াছি। কিন্তু বাস্তব সমুদ্রের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে, সুদূর দ্বীপে যাইতে প্রাণ কাঁপে। বাড়ী-মুখো বাঙালী, এ কথা আমাদের মুখেই শুনিতে পাই। বাস্তবিক হিন্দুর বাড়ী বড়ই শান্তিপ্রদ। আমরা যাহাতে এই সুখে বঞ্চিত না হই, সেই জন্যই বোধ হয় প্রাচীন তন্ত্রের লোকেরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, জাতি যাওয়ার ভয় দেখাইয়া সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিতেছেন।

যাহা হউক, নানাদেশ পর্য্যটনে, আলো ও বায়ুর সাহায্যে চক্ষু ফোটে, অভিজ্ঞতা জন্মে। বৈদেশিক সমাজের অবস্থা দর্শনে নিজসমাজের

প্রকৃত অভাব-ত্রুটী বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। তখন নিজেদের অভাব দূর করিবার একটা ইচ্ছা জাগে ইত্যাদি উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিদ্যার্থী যুবকেরা কেহ কেহ সাগর পার হইয়া বিদেশে যাইতেছেন সত্য, তথাপি বলিতে হইবে আমরা বিদেশগমনে বিমুখ। ঘরে বসিয়া কে কবে বড় হইয়াছে? বড় হইতে হইলেই বিদেশ গমন আবশ্যক।

সন্তোষ।

শাস্ত্রে আছে—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥

অর্থাৎ সন্তোষরূপ অমৃতপানে পরিতৃপ্ত, শান্তচিত্ত মহাত্মাগণের যে সুখ, সেই সুখ তাহারা কোথায় পাইবে, যাহারা ধনলোভে নানা দিকে ছুটাছুটী করে?

আবার,

Man wants but little here below,
Nor wants that little long.

এই পৃথিবীতে মানুষের অভাব অল্পই বটে, সেই অল্প অভাবও অধিক-কাল স্থায়ী নহে।

সন্তোষ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। শান্তচেতা, বিষয়বিতৃষ্ণ মহাশয়ের পক্ষে সন্তোষামৃত পান সম্ভবপর বটে, কিন্তু অশান্ত চিত্ত সন্তোষের অধিকারী নহে। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের ন্যায় নিস্পৃহ লোক আজকাল কয় জন আছেন? আমাদের অভাব বিলক্ষণ জাগিয়াছে। সুতরাং

সেই অভাব দূর করিতে না পারিলে কিছুতেই মনের শান্তি হইতে পারে না। ক্ষুধা খুব জন্মিয়াছে, কিন্তু ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য কোন উপায় না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় কি? সন্তোষামৃত পান করা যায় কি? ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ইহা সম্ভব হইলেও সমাজের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের অভাবের অভাব নাই, কিন্তু বলের অভাবই সকল অভাবের মুখ্য ও মূল অভাব। বড় হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই মূল অভাবটা দূর করা আবশ্যক। নিজে নিশ্চেষ্ট হইয়া পরের সাহায্যে বড় হওয়ার আশা করা মূর্খতা।

কর্ম্মে আনন্দ।

প্রফুল্লতা চিত্তের বলাধান, ভগবানের একটী সুন্দর দান। ইহা সংসারে সুখের উৎস। ইহার অভাবে কর্ম্ম ক্লেশকর ভার বলিয়া বোধ হয়। আনন্দ লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম করিয়া আনন্দ লাভ করিতে হইবে। ভিতর হইতে যখন আনন্দ উথলিয়া ওঠে, তখনই কর্ম্মী কর্ম্মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ। আমরা নানা অভাবে চিত্তের সেই প্রফুল্লভাব হারাইতেছি। সুতরাং কর্ম্মে বিশেষতঃ পুরুষোচিত বৃহৎ কর্ম্মে আনন্দ-স্ফূর্ত্তি পাই না।

একই রকমের পৌনঃপুনিক একঘেয়ে কর্ম্ম, নিরাশ-নীরস শ্রম, পর-চালিত, অনিচ্ছাকৃত কর্ম্ম অপ্রীতি ও অহিতকর। সর্ব্বদা অনিচ্ছায়, দায়ে ঠেকিয়া কর্ম্ম করিলে, সেই অনিচ্ছাকৃত কর্ম্ম কেবল দুর্ব্বহ ভারবৎ ক্লেশাবহ। কর্ম্মে রসানুভব ও আশার সঞ্চার করা কর্ত্তব্য। 'বাড়্তে বাড়্তে বাড়ে কি? আশা; কম্তে কম্তে কমে কি? আয়ু।' বীণারধ্বনি যেমন কর্ণে মধু বর্ষণ করিয়া সমস্ত হৃদয়টাকে নাচাইতে থাকে, সেইরূপ আশার বাণী যাহার হৃদয়কে নাচাইতে পারে, সে কর্ম্মে রস পায়। অলস-অকর্ম্মণ্যের এ হেন আশাও ফুরাইয়া যায়, আবার

আয়ু থাকিতেই সে মরিয়া থাকে। সুরাপায়ী সুরার মধ্যে ও কর্ম্মী কর্ম্মের মধ্যে রস পায়। তা না হ'লে মত্ততা জন্মিতে পারে না। মদ-মত্ততার ফল অবসাদ। কর্ম্ম-মত্ততার ফল চিত্ত-প্রসাদ।

ভোগী বিলাসীরা মনে করে, এই শরীরটা ভোগের সাধন মাত্র। অতএব ভোগ করাই শরীর ধারণের সার্থকতা। কিন্তু বস্তুতঃ কর্ম্মের দ্বারাই সুখ ভোগ। মিত, নিয়মিত ও স্বেচ্ছাকৃত শ্রমে কর্ম্মশক্তি বাড়ে ও আনন্দ জন্মে। শ্রমবিমুখতায় নিরানন্দ।

কর্ম্মফল।

ইহকালে বা পরকালে, এখানে বা সেখানে, তুমি চাও, আর না-চাও, কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। কোন কোন কর্ম্মের ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়। কর্ম্মেই অবনতি, কর্ম্মেই উন্নতি, একথা হিতোপদেশকার সুন্দর উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন।

> যাত্যধোঽধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
> কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারকঃ॥

অর্থাৎ কূপখননকারী খনন করিতে করিতে ক্রমেই নীচে নামিতে থাকে। সেইরূপ মানুষ নিজকর্ম্মদ্বারা নীচে আরো নীচে যায়। পক্ষান্তরে প্রাচীর-নির্ম্মাতা রাজমিস্ত্রি ইট গাঁথিতে গাঁথিতে কেবল উপরেই ওঠে। সেইরূপ নিজ কর্ম্মদ্বারা মানুষ ঊর্দ্ধে আরো ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে।

কর্ম্মের সার নিষ্কামকর্ম্ম। কিন্তু ইহা এখন আমাদের কাছে 'আদি কালের বাতিল কথার মতন হইয়াছে। ইহা পুরাতন শাস্ত্রের পুরাতন কথা। সংসারী হইয়া একালে কে আর সেকালের নিষ্কামকর্ম্ম করিতে পারে? ইহা অসম্ভব। অসম্ভব নয়, একথা এ যুগের প্রাতঃস্মরণীয়া মহা-

রাণী শরৎসুন্দরী ও 'দয়ার সাগর সেই বিদ্যার-সাগর' ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মাগণ নিজ নিজ জীবনে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

আমরা সকলে মিলিয়া গা-ঝাড়া দিয়া বড় বড় কর্ম্মে লাগিয়া যাইব। কর্ম্ম করিয়া বিরাটপুরুষের ও ভূমানন্দ ভগবানের পূজা করিব।

সংস্কার।

উত্তম কৃষাণ অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে উপযুক্ত সার দিয়া জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে অথবা ক্ষেত্রমধ্যে জঙ্গাল জন্মিলে তাহা উৎপাটন করিয়া থাকে, নচেৎ সুশস্যের ব্যাঘাত হয়। গৃহস্বামী বাসগৃহের খুঁটী নষ্টপ্রায় হইলে, তাহা বদলাইয়া নূতন খুঁটী দিয়া সেই ঘর রক্ষা করিয়া থাকে। এই প্রকার ঘর মেরামত করে না এরূপ মূর্খ কে আছে? আবর্জ্জনারাশি দূর করিয়া ঘরখানিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে এরূপ সকল পরিবারেই দেখা যায়। যুবা-বৃদ্ধ (আজকাল অজাতশ্মশ্রু বালকও মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, ক্ষৌরকর্ম্ম করাইয়া থাকেন। নির্দ্দিষ্ট দিবস অতীত হইলে চিবুক ও গণ্ড কণ্ডূয়ন আরম্ভ হয়। পরিধেয় মলিনবস্ত্র ধৌত করাইবার প্রথা সভ্যসমাজে বিদ্যমান। শরীরে রোগ জন্মিলে তৎপ্রতীকারার্থ ঔষধ সেবন এবং রোগ শান্তির পর দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য বলকারক ঔষধ ব্যবহার করাই প্রচলিত রীতি। ইহারই নাম সংস্কার। সংস্কার অর্থে অসার, অসুন্দর, অহিতকর অংশের উদ্ধারপূর্ব্বক সারবান্, সুন্দর, বলকর অন্য কিছুর সংযোজন। সংস্কার শব্দের আভিধানিক অর্থও শোধন, পরিষ্করণ, অলঙ্করণ। এরূপ সংস্কারকার্য্য বহুকাল হইতেই সমাজে চলিয়া আসিতেছে।

ক্ষেত্রের জঙ্গাল ফেলিতে যাইয়া শস্য কাটিয়া ফেলা, কিংবা ঘরের খুঁটী বদলাইতে গিয়া সুকাঠের উত্তম খুঁটীর পরিবর্ত্তে আকাঠা অসার

খুঁটী তৎ স্থানে স্থাপন করা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য। আবার, বৃদ্ধি-প্রাপ্ত অপ্রয়োজনীয় নখাগ্রচ্ছেদন কালে সম্পূর্ণ নখ বা নখার্দ্ধ ছেদন করিলে ক্ষৌরকারের অনিপুণতা প্রকাশ পাইবে ও অপরাধ হইবে। ব্যাধির উপশম করিতে যাইয়া চিকিৎসক যদি রোগ নির্ণয় করিতে ভুল করেন ও রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধির ও অবশেষে জীবন নাশের হেতু হন, তবে তিনি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। সেইরূপ সমাজ-শরীরে ব্যাধির উৎপত্তি হইলে ব্যাধির প্রকৃত মূলকারণ নিয়র্ণপূর্ব্বক তাহা সমূলে নির্ম্মূল করিতে উদ্যোগী ও যত্নবান হওয়া ধীমানের কার্য্য। সমাজরূপ বিরাটপুরুষের যখনই যে কোন অঙ্গে যে দুষ্ট ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করে, তখনই তাহা অপনয়ন করিতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। সমাজশরীরের উৎকট জটিল ব্যাধির নির্ণয়ে ও দূরীকরণে সুচিকিৎসকের সৎবিবেচনা, বিচক্ষণতা ও সহানুভূতি চাই। সমাজক্ষেত্রের আগাছা উপড়াইয়া ফেলিতে সুকৃষকের সাবধানতা, শ্রমশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রয়োজন। বাগানের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে বটে, কিন্তু দেখিতে হইবে সেই সঙ্গে যেন ফুল ও ফলের গাছ কাটা না যায়। প্রাচীন প্রাণীদেহে যেমন রোগের আধিক্য ও প্রাবল্য সম্ভাবিত, সেইরূপ প্রাচীন হিন্দুসমাজে এমন অনেক মহৎ দোষ জন্মিয়াছে, যাহার সংস্কার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সমাজ-সংস্কার অত্যাবশ্যক। আবশ্যক হইলেও মানুষের বুঝিবার দোষে কিম্বা স্বার্থহানির আশঙ্কায় কেহ কেহ বা কোন কোন সম্প্রদায় সংস্কার-বিরোধী। কেহ কেহ এবিষয়ে উদাসীন, কেহ কেহ ইহার পক্ষপাতী। বিরোধীদল হয় অজ্ঞ, না হয় স্বার্থান্ধ। অজ্ঞতা বা অন্ধতা বশতঃ তাহারা দোষ দেখিতে পায় না, কিংবা দোষকে গুণ বলিয়া বোধ করে। আজন্ম একটা মন্দ জিনিষের সহিত নিত্য পরিচয়ে কেমন একটা ভালবাসা জন্মে। সেই জন্যই দেশ মধ্যে বহুকাল প্রচলিত কুরীতি, কুনীতি

কদাচার প্রভৃতিও সাধারণ লোকের নিকট আদর পাইয়া থাকে। লোকে এগুলিকে সহজে ছাড়িতে চায় না, ছাড়িতে হইলে মর্ম্মে আঘাত লাগে। ইহা কুসংস্কার। কুসংস্কার দূর করিতে জ্ঞানই মহৌষধ।

পিতামহ ভ্রমক্রমে অমৃতবৃক্ষের চারা লাগাইতে বিষবৃক্ষের চারা রোপণ করিয়া মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন। তারপর পিতা বিষবৃক্ষ জানিয়াও হয়ত কাটিতে ভুলিয়া গেলেন। এখন নিজে ঐটীকে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ভ্রাতা বা পুত্র বা অপর কেহ কাটিতে গেলে, এই বলিয়া নিষেধ করেন যে, এই গাছটী বাপ দাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন, ইহার প্রতি আমার বড়ই মমতা জন্মিয়াছে। এরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিষবৃক্ষ পোষণ করা মূঢ়ের কর্ম্ম নয় কি? আবার, যাহারা অলস উদাসীন, তাহাদের বোধ হয় মনের ভাব এই যে, সময়স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে একটা গতি হইবেই। দোষ আপনা হইতেই শোধরাইয়া আসিবে, আমাদের চেষ্টার কি প্রয়োজন? কালের গতি ফিরাইতে কে পারে? তাহারা ইহা মনে করেন না যে, যদিও প্রকৃতিতে রোগ উপশম করিবার শক্তি আছে, যদিও পশুপক্ষী সম্পূর্ণ-রূপে প্রকৃতির নিয়মাধীন থাকে বলিয়া প্রকৃতিই তাহাদের চিকিৎসার ভার লইয়াছে; তথাপি, মানুষ স্বাধীনভাবে চলে সুতরাং অনেক আত্মকৃতব্যাধিযন্ত্রণা ভোগ করে, এবং ইহার প্রতীকার-চেষ্টা মানুষেরই করা আবশ্যক।

নব্যসম্প্রদায়ের লোকই প্রায়শঃ সংস্কারকার্য্যে ব্রতী। ইহারা বর্ত্তমান সভ্যতার পক্ষপাতী। বর্ত্তমান ছাত্রবৃন্দের মধ্যে যাহারা উত্তরকালে সংস্কারক হইবেন, তাহাদের সর্ব্বাগ্রে আত্মসংস্কার করা দরকার। তাহারা সকলেই নিজ নিজ পরিবারে সংস্কারকার্য্য সম্পাদন করিলে সমাজ-সংস্কার সহজ হইয়া আসিবে।

সংস্কারক দলের কার্য্য গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ। তাহারা অন্যের নিকট হইতে স্বীয়সমাজে যাহা আনিতে চান, তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষণীয়। যেমন, মুসলমানের নিকট প্রাপ্ত স্ত্রীজাতির অবরোধপ্রথা যদি হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ না করিত, তবে বর্ত্তমান সংস্কারকদিগের এখন সে প্রথা রহিত করিতে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। মন্দ যাহা আসে, তাহা দূর করা শেষে অনেক দিন পরে প্রাচীন রোগের ন্যায় দুঃসাধ্য, কোন কোন স্থলে অসাধ্য হইয়া পড়ে। আর একটী কথা তাহাদের ভাবিবার বিষয় বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান সভ্যতার কুহকে, বাহ্য-আড়ম্বরে ও চাক্‌চিক্যে অনেকেই ভ্রমে পতিত হন, এবিষয়ে নিতান্ত সাবধানতা আবশ্যক। যেমন, এখন মাম্‌লা মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে, কুটিল কলহপ্রিয় লোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে। আবার, এখন দুগ্ধ পরীক্ষার কল সৃষ্টি হইয়াছে, আগে ছিল না। অর্থাৎ পূর্ব্বে কেহ দুধে জল মিশাইত না, কলেরও প্রয়োজন ছিল না। এখন দুধে জল ও কল উভয়ই পাওয়া যায়। এই দুই অবস্থাকে উকীল-মোক্তার, কলওয়ালা ও গোয়ালারা সভ্যোন্নত অবস্থা মনে করিতে পারেন। কিন্তু কূটবুদ্ধি ও কৃত্রিমতা যদি সভ্যতার লক্ষণ হয়, তবে এই প্রকার মনে করা অসঙ্গত হইবে না। সংস্কারকেরা প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক, সংসাহসী, পাপদ্বেষী, কুসংস্কারবর্জ্জিত ও স্বার্থশূন্য না হইলে তাহা-দের কেবল পণ্ডশ্রমই হইবে।

কেহ কেহ কৃত্রিম স্বদেশপ্রীতির ভাণ করিয়া থাকে। তাহারা পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতিমাত্র পোষণ করিয়া মহিমামণ্ডিত অতীত যুগের দোহাই দিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন মহাত্মাকেই আদর্শ ধরিয়া তাঁহার পথে চলে না। সকলেরই বুঝা উচিত যে, যে জাতির জাতীয়-চরিত্র অলসতা,

অকর্ম্মণ্যতা ও দুর্ব্বলতায় কলঙ্কিত, সে জাতির উত্থান জাতীয়-চরিত্র-সংস্কার ভিন্ন আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। ঘুণ প্রবেশ করিয়া আমাদের জাতীয়চরিত্রকে শতচ্ছিদ্র ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। এই চরিত্রটাকে বদলাইয়া বলিষ্ঠ চরিত্র আনিয়া সেই স্থানে বসাইতে হইবে। ইহা সংস্কারের মধ্যে সংস্কার।

পুরাতনের নামে কেহ কেহ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন, কেহ কেহ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। দুই দলে বিষম সংঘর্ষ। প্রথম দল পুরাতন-বিদ্বেষী, নূতনে অনুরাগী। দ্বিতীয় দল পুরাতনপ্রিয়, নূতনে বিতৃষ্ণ।

সমাজের রীতিনীতি যাহাই পুরাতন তাহাই মন্দ, অথবা তাহাই ভাল, আবার যাহা কিছু নূতন তাহাই ভাল, বা তাহাই মন্দ, এরূপ কথা হইতে পারে না। পুরাতনের মধ্যেও ভাল-মন্দ, নূতনের মধ্যেও ভাল-মন্দ থাকিতে পারে। ইহা বিচার-সাপেক্ষ। পরীক্ষায় যাহা মন্দ বলিয়া স্থির হইবে তাহা অবশ্যই বর্জ্জনীয়, যাহা ভাল তাহা আদরণীয়।

———

শিক্ষা।

শিক্ষার উপরই সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল, উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের আবশ্যক। সুশিক্ষকের উপর শিক্ষার ভার ন্যস্ত হইলেই শুভ ফল, অন্যথা কুফল। ভগবান্ মানবশিশুর দেহ-মাটীতে মনুষ্যত্বের বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত, পরিপুষ্ট ও ক্রমে ফুলে-ফলে পরিশোভিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহান্ বৃক্ষে পরিণত করাই শিক্ষকের কর্ম্ম। কুম্ভকার যেমন কাঁদামাটী লইয়া, গড়িয়া-পিটিয়া মনোমত মনোহর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শিক্ষকও শিশুর কাঁচা দেহ-ও-মন-মাটী লইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি গড়িবেন, এবং সেই মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। শিক্ষককে সুদক্ষ মালী, কুম্ভকার ও পুরোহিত হইতে হইবে। পশুত্ব ঘুচাইয়া মনুষ্যত্ব প্রদান করা, মানুষ করিয়া তোলা, শিক্ষকের কর্ম্ম!

শিশু পৃথিবীতে আসিয়া কেবলই জানিতে চায়। যাহা দেখে, তাহাই আশ্চর্য্য বোধ করে। জানিবার এই আকাঙ্ক্ষা কৌতূহল, এই স্বাভাবিক জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করা শিক্ষকের কর্ম্ম। অবোধ শিশু আগুন দেখিয়া আগুনে হাত দিতে যায়, চূণ দেখিয়া চূণ মুখে দিতে হাত বাড়ায়, তখন শাসন বারণ আবশ্যক, নহিলে বিপদ্। জ্ঞানবর্দ্ধন ও শাসন বারণ শিক্ষকের কর্ম্ম। শিশু যে কেবলই জানিতে চায়, শিখিতে চায়, সে শিক্ষার ভার কাহার উপর ন্যস্ত? যিনি জ্ঞানবৃত্তি দিয়াছেন, তিনিই ইহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি এই শিক্ষাকার্য্যে জননীকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট এই স্বাভাবিক কর্ত্তব্য কয়জন বঙ্গীয়জননী সুচারুরূপে সম্পাদন করেন? কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে? সমাজ রমণীদিগকে যত্নপূর্ব্বক অজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছে,

এমন কি দায়িত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছে। এই গুরুকর্ত্তব্যের অপালনে যে গুরু অপরাধ তাহা অন্ধ সমাজের, অজ্ঞ বালিকা-জননীর নহে।

গৃহ-শিক্ষা।

"মা হওয়া কি মুখের কথা ?
কেবল প্রসব করলে হয় না মাতা।" (রামপ্রসাদ)

বাস্তবিক মা হওয়া মুখের কথা নয়। প্রসব করিলেই, অথবা দুই এক বৎসর স্বভাবের প্রেরণায় তির্য্যক্‌জননীর ন্যায় সন্তান-পালন করিলেই, মাতার কর্ত্তব্য শেষ হইল না। ইহার অতিরিক্ত কর্ত্তব্য আছে। শিশুর মন অনুকরণপ্রবণ। সে প্রতিদিন যেরূপ আচরণ চক্ষে দেখে, সেরূপ করিতে ভালবাসে। বাস্তবিক শিশুর জন্মদিন হইতেই শিক্ষাকার্য্য আরব্ধ হয়। শিশু স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে মাতার সমগ্র অন্তর-প্রকৃতিটাকেও যেন পান করিতে থাকে। তাহার কোমল মনে মাতার দোষগুণ প্রস্তর-রেখার ন্যায় চিরতরে অঙ্কিত হইতে থাকে। জননী মুখে উপদেশ না দিলেও তদীয় দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া যাহা শিখে, তাহাই শিশুর সংস্কার হইয়া দাঁড়ায়, এবং এই সংস্কারই কালে অভ্যাসের পরিপাক বশতঃ স্বভাবে পরিণত হয়। মাতার চিন্তা, চরিত্র, ভাব-স্বভাব সন্তানে অলক্ষিতভাবে সংক্রমিত হইয়া থাকে। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে শিশু, জননীর নিকট শিক্ষা পাইতে থাকে এবং নিজকে গড়িয়া তোলে।

বাড়ীই প্রাথমিক শিক্ষার আলয়। এখানেই সর্ব্বপ্রথম শিশুচরিত্র গঠিত হয় এবং উত্তরকালে তাহা সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে। শিশুর কাছে নির্দ্দোষ, উন্নত আদর্শচরিত্র রাখা চাই। জননীই

শিশুর নিত্যআদর্শ। এই আদর্শের তারতম্যানুসারে শিশুর ভাবী জীবন ভাল বা মন্দ হইয়া থাকে। যে পরিবারে প্রতিদিন সদনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রীতি বিরাজমান, এবং নিত্যনৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের সম্যক্ পালন হইয়া থাকে, সেই পরিবারস্থ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সুখময় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পক্ষান্তরে অবিদ্যা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার ও বর্ব্বরতার মধ্যে শৈশব অতিবাহিত হইলে, শিশু অজ্ঞাতসারে সেই সব অনুকরণ করিয়া একটী নরপশু হইবে। জর্জ্জ হার্ব্বাট বলেন, "One good mother is worth a hundred school masters." এক সুমাতাই শত শিক্ষকের সমান। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি বলিতেন, "The future good or bad conduct of a child depended entirely on the mother." শিশুর সু বা কু চরিত্র সম্পূর্ণরূপে মাতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই সমাজে এই সব কথা অনেকেই হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন।

বস্তুতঃ গৃহরূপ এই প্রাথমিক শিক্ষালয়ে মাতা প্রথম শিক্ষক, পিতা দ্বিতীয় শিক্ষক। কিন্তু মাতার নিকট শিশু কি শিখে? কিছুই না। কিছুই-না যদি শিখিত, তবে বরং ভাল হইত! কিছু অবশ্যই শিখে। যাহা শিখে, তাহা প্রায়ই মনুষ্যত্বের অন্তরায়! শিখে ভীরুতা, ক্ষুদ্রতা, দুর্ব্বলতা! মাতাপিতা উপযুক্ত সংশিক্ষক না হইলে শিক্ষাকার্য্য ব্যর্থ। সাধুপরিবার অত্যুৎকৃষ্ট স্বাভাবিক শিক্ষালয়, আবার অসাধু পরিবার কুশিক্ষার আগার। মাতৃকুলের সুশিক্ষা ভিন্ন শিক্ষাসংস্কার অসম্ভব। সমাজের কর্ত্তব্য ইঁহাদিগকে উত্তম শিক্ষয়িত্রী করিয়া লওয়া। যে সমাজে মাতৃকুল, সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতার মধ্যে আবদ্ধ, অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমগ্ন, শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার আধার, সেখানে শিক্ষাসংস্কার ও জাতীয় চরিত্র সংস্কার চেষ্টা নিষ্ফল। 'Home makes the man'. পারিবারিক

শিক্ষাই শিশুকে মনুষ্যত্বে বা পশুত্বে পঁহুছিবার পথ করিয়া দেয়। একথা যদি আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তবে স্ব স্ব পরিবারে সৎশিক্ষা বিধান অত্যাবশ্যক।

বিদ্যালয়।

শিক্ষার দ্বিতীয় স্থান বিদ্যালয়। মাতাপিতা স্বভাবনির্দ্দিষ্ট শিক্ষক হইলেও অযোগ্যতা, অনবকাশ বা অসুবিধা বশতঃ শিক্ষার জন্য বালককে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। দীনদরিদ্র চাষাও ছেলেটীকে স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেয়, আশা—স্কুলে পড়িয়া ছেলে মানুষ হবে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, অভদ্র সকলেই পুত্রদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত, নিজেরা সমর্থ হইলেও সন্তান শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। সকলেরই আশা পুত্রগণ বিদ্যালয়ে গেলে মানুষ হইতে পারিবে। ছাত্রেরা বিদ্যার বিপণিতে মাসিক দুই চারি পাঁচ টাকা দিয়া পুস্তকের পণ্যবস্তু কিনিতে আসে ও কিনিয়া লইয়া যায়। আসল জিনিষ চায় না। আমরা ক্ষুদ্র জীব, ক্ষুদ্র আমাদের আশা। মানুষ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা শিক্ষক মহাশয় করিয়া দেন। তিনি ছাত্রকে পাশ পাইবার যোগ্য করিয়া তোলেন। পাশ পাইলেই পিতামাতা, গুরুশিষ্য সকলেরই আশা ফলবতী হয়।

প্রজাহিতৈষী দয়ালু গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার বিস্তারকল্পে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া আসিতেছেন। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ কার্পণ্য দেখা যায় না। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুবিধা সকলের হইয়া উঠে না, আবার, যাহারা বিদ্যালয়ের ছাত্র, তাহারাও অতি অল্পকালের জন্য বিদ্যা-গ্রহণ করিতে আসে। ফলতঃ সামাজিকতা শিক্ষার ভার সমাজের হস্তে ন্যস্ত।

শিক্ষকের আসন অতি উচ্চ। এই উচ্চ আসনে বসিবার উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করা সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি প্রাথমিক শিক্ষাগুরু মাতা ও পিতা এবং তৎপরে বিদ্যালয়ের গুরু। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ইহারা কেহই স্ব স্ব দায়িত্ব বুঝিয়া পূর্ণ শিক্ষাদানে ব্রতী

নহেন। অন্নহীনকে অন্নদান, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, আতুরকে ঔষধদান পরম ধর্ম্ম। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান চরিত্রদান, মনুষ্যত্বদান। বিদ্যালয়ের শিক্ষক চরিত্রদান করিতে পারেন না। তিনি পুস্তকের বিদ্যা দান করিতে আসিয়াছেন, পুস্তকের বিদ্যাই দান করেন। এদেশের মাতৃকুল প্রাণহীন; এঅবস্থায় তাঁহারা কিপ্রকারে সন্তানকে প্রাণদান করিবেন? সুতরাং শিক্ষা-বিষয়ে গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিয়া সমাজ সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে বদ্ধপরিকর হইলেই সুফলের আশা করা যায়। শিক্ষাসংস্কার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। ইহা সকল সংস্কারের অগ্রগণ্য।

চিকিৎসা।

কালের গতিতে এদেশে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি, রোগের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন ও নূতন নূতন রোগের আমদানী হইতেছে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ অপরিবর্ত্তনীয়। আমরা অপরিবর্ত্তনকে বড় আপনার করিয়া বুঝিয়াছি। কিন্তু বুঝিতে চাই না যে,—ভগবানের রাজ্যে পরিবর্ত্তন ভিন্ন অপরিবর্ত্তনীয় আর কিছুই নহে। ভগবানের শাস্ত্রে পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু আমাদের গড়া শাস্ত্রগুলির পরিবর্ত্তন করিতে নাই। কোন বিষয়ে উন্নতিসাধন করিতে গেলেই তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা প্রণালীর উৎকর্ষসাধন একান্ত বাঞ্ছনীয়। দেশী চিকিৎসার প্রতি অনেকের অনুরাগ থাকিলেও কতকগুলি কারণে উহার প্রতি নব্যশিক্ষিত-দিগের শ্রদ্ধা নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেশী চিকিৎসা হয় না, উহাতে অস্ত্র চিকিৎসা নাই। অভাবাত্মক এই দুইটী প্রধান কারণের অপসারণ করা অসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। অধিকন্তু কবিরাজ মহাশয়কে বহুরূপী সাজিতে হয়। একটা প্রাণীকে উদ্ভিদবিদ্যায় অভিজ্ঞ, রাসায়নিক, সংস্কৃতভাষাবিৎ, শিক্ষক, ঔষধনির্ম্মাতা ও চিকিৎসক হইতে হইবে। কিন্তু এমন প্রতিভাশালী বলিষ্ঠ কর্ম্মী কয়জন হইতে পারেন? সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন, এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয়?

কর্ম্মবিভাগ না থাকিলে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার উন্নতিসাধন অসম্ভব। হোমিওপ্যাথির ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থী মনস্বী ছাত্র প্রায় জোটে না এবং শিক্ষাদান কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। ছাত্রগণ পুস্তকের পাঠ গ্রহণ করে, কিন্তু বস্তু বা বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় তাহাদের অতি অল্পই হয়। নিদানের কয়েকটা শ্লোক তোতাপাখীর মত মুখস্থ করিয়া কত কবিরাজের সৃষ্টি হইতেছে! আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা প্রধানতঃ বৈদ্যের জাতীয়

ব্যবসা। কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে ক্ষৌরকারও অনধিকারী নহে। তিনি ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে করিতে হঠাৎ মনে ভাবিলেন, আমি কবিরাজ হইব। অমনি তূণ হইতে ক্ষুর-নরুণ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সরাইয়া রাখিয়া, তাহাতে ঔষধের বড়ি পুরিয়া, দূর অজ্ঞ পল্লীতে চিকিৎসার্থ বহির্গত হইলেন, আব "সহস্রমারী চিকিৎসক:" হইয়া পড়িলেন। তিনি শুধু কবিরাজ নন, সার্জ্জনও হইলেন। কারণ কাটাছেঁড়ার অভ্যাসটা তাহার পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এই প্রকার কবিরাজ পল্লীগ্রামে এখনও আছে।

ইহার উপর কৃত্রিমতা। খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় ঔষধে কৃত্রিমতা মারাত্মক। অজ্ঞ, অল্প-আয়বান্ কবিরাজের ঔষধে অঙ্গহীনতা ও কৃত্রিমতার বাহুল্য বোধ হয় অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। কবিরাজ মহাশয় পাচনের জায় দিলেন, পসারি দোকানে মান্ধাতার আমলের আমলকী অথবা যা তা মিলিল; পাচন খাওয়াতে ফলও তেমনিই হইল। কবিরাজের ব্যবস্থায় মধু অনুপান, দোকানদারের ব্যবস্থায় "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ," গুড়ের ফেনিল জল।

রোগী ও রোগ সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুচিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রাচীন রোগে প্রাচীন প্রণালীর অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদসম্মত চিকিৎসা প্রশস্ত ও সমধিক ফলোপধায়ী বলিয়া অনেকের ধারণা। যে বাহ্যপ্রকৃতি আমাদের শরীরটাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে, যাহার সহিত আমরা নিত্য পরিচিত, তাহাতে জাত ও বর্দ্ধিত উদ্ভিজ্জাদি আমাদের রোগ উপশমের অনুকূল, ইহা ধ্রুব। অতএব দেশী চিকিৎসার উন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধি আবশ্যক। এবিষয়ে সংস্কারকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই বলিলেই হয়।

কবিরাজিতে অস্ত্রচিকিৎসার প্রবর্ত্তনা, মৌলিক গবেষণা, ঔষধের মূল্যহ্রাস ও কৃত্রিমতা দূর হইলে, এবং প্রধান প্রধান নগরে বড় বড় ঔষধ-

বৃক্ষের বাগানসৃষ্টি ও আদর্শ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপনার্থ সহৃদয় ধনী ও সংস্কারকদিগের শুভদৃষ্টি পতিত হইলে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার শ্রীবৃদ্ধি হইবে আশা করা যায়।

বিবাহ সংস্কার।
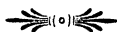
ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ।

জন্মদিন হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত হিন্দু নর-নারীর বহু সংস্কার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে উপনয়ন ও বিবাহ সংস্কার প্রধান। যে উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকারগণ উপনয়ন সংস্কারের বিধান করিয়াছিলেন, তাহা এখন আর সাধিত হইতেছে না। এখন আচার্য্য মহাশয়, 'ধর লক্ষ্মণ' বলিয়া যাই উপবীত প্রদান করেন, বালকও অমনি আর্য্যের লক্ষণ বলিয়া চিরকাল তাহা ধারণ করিয়া থাকে। ধারণের কি অর্থ বোঝে না। বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্যও করে না। ইহাতে পিতামাতার নিরর্থক অর্থব্যয়ই সার। ব্রহ্মবিদ্ গুরুর নিকটে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন, ব্রহ্মের আরাধন, চরিত্র গঠন, পশুত্ব ছাড়াইয়া মনুষ্যত্বে উপনয়নই যে উপনয়নের মুখ্য-উদ্দেশ্য, সে ধারণা অনেকেরই নাই।

উপনয়ন-সংস্কার কেবল হিন্দুর, বিবাহসংস্কার পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। জীব-জগতে স্বাভাবিক নিয়মে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইয়া থাকে। মিলন ব্যতিরেকে ভগবানের সৃষ্টিরক্ষা বা

প্রজাবৃদ্ধি হয় না। এই স্বাভাবিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া মানবজাতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে সমাজের কল্যাণতরে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রীয় বিধির প্রণয়ন পূর্ব্বক স্ত্রীপুরুষের মিলন বিধান করিয়াছেন। ইহারই নাম 'বিবাহসংস্কার'। জন-সমাজে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না জন্মাইয়া নির্ব্বিরোধে যেন প্রজাবৃদ্ধি ও সুখসমৃদ্ধি হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে।

সৃষ্টিরক্ষা ও প্রজাবৃদ্ধি ভগবানের অভিপ্রায়। জাতীয় বলাবল কতকটা লোকসংখ্যার উপর নির্ভর করে, কিন্তু অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দুর আশানুরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে না। আবার, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলেই যে সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে, এমন কোন কথা নয়। দুর্ব্বল, রুগ্ন স্ত্রীপুরুষ লইয়া যে সমাজ গঠিত হয়, সে সমাজে শ্রীবৃদ্ধির আশা করা বাতুলতা মাত্র। বাঙালীর দুর্ব্বলতা চিরপ্রসিদ্ধ হইলেও ইদানীং তাহা দ্রুতপদে বাড়িয়া যাইতেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে অকালমৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছে। ক্রমোন্নতি যদি প্রাকৃতিক নিয়ম হয়, তবে দুর্ব্বলতা বাধা না পাইলে, উন্নতি লাভ করিবে, ইহা নিশ্চয়। বঙ্গসমাজে তাহা হইতেছে। এই দুর্ব্বলতার অন্যতম কারণ বাল্যবিবাহ।

বিবাহের বয়স।

বিবাহ শব্দের অর্থ (বি—বহ্+ঘঞ্) স্ত্রীপুরুষের পরস্পর দম্পতিরূপে মিলন। এস্থলে 'বহ্' ধাতু প্রাপণার্থক। মিলনের এই প্রকৃত কাল প্রকৃতিই নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই যখন পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণেন্দ্রিয় হয়, তখনই বিবাহের উপযুক্ত কাল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অপূর্ণ অবস্থায় মিলন অকাল। প্রকৃতির এই নিয়ম উদ্ভিজ্জ ও তির্য্যগ্ জাতি পালন করিয়া থাকে। মানবের পক্ষেও অবশ্যপালনীয়।

পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের মতানুসারে পুরুষ প্রায় ২৩ বৎসর এবং স্ত্রী ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। From 15 to 20, boys begin again to increase more rapidly than girls, and complete their growth at about 23. After 15, girls grow more slowly and practically reach their full height and weight at 20." (PP 39 Medical Jurisprudence for India by LB Lyon CIE & C, & LA Waddell CB, CIE & C.)

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও আছে,—"বিবর্দ্ধমানধাতুগুণং পুনঃ প্রায়েণানবস্থিত-সত্ত্বম্ আত্রিংশৎবর্ষমুপদিষ্টম্।" (চরক, বিমানস্থান)। চরকের মতে পুরুষের ত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত ওজোধাতু প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। অতিপ্রামাণিক বৈদ্যকগ্রন্থ সুশ্রুতের মতে—

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্, নারী তু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥

পঁচিশ বৎসর বয়সে পুরুষ ও ষোল বৎসর বয়সে নারী সমবীর্য্যবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ সেই সেই কালে ইহাদের রসাদিধাতু পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। তবেই এসম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, নব্য ও প্রাচীন শাস্ত্রে বিশেষ অমিল নাই। এখন বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আর্য্যঋষিগণ কি বলিয়াছেন দেখা যাউক।

বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"গৃহীতবিদ্যো গুরবে দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্।
গার্হস্থ্যমিচ্ছন ভূপাল! কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্॥"

হে রাজন্! যিনি গৃহী হইতে ইচ্ছুক, তিনি কৃতবিদ্য হইয়া গুরু-দক্ষিণাপ্রদানান্তর দারপরিগ্রহ করিবেন। পূর্ব্বকালে শিক্ষা পরিসমাপ্ত

করিয়া বিবাহ করিবার রীতি ছিল। এবং শিক্ষা সমাপ্ত করিতে ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে অনেক ছাত্রই পারিতেন না। মহর্ষির মতে ছাত্রাবস্থায় অর্থাৎ প্রায় ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা অসঙ্গত।

মনু বলিয়াছেন—

"ত্রিংশৎবর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।"

ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। মহাভারতকার বলেন—ত্রিংশৎবর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্। ত্রিশবৎসরের যুবক অনাগতার্ত্তবা অর্থাৎ অরজস্বলা ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে।

ইঁহারা উভয়েই পুরুষের পক্ষে ত্রিশবৎসর বয়ঃক্রম বিবাহের কাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

কন্যার পক্ষে মনু বার, মহাভারতকার ষোল বৎসর বয়স নিরূপণ করিয়াছেন।

উদ্বাহতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন কয়েকটী শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কন্যার পক্ষে বিবাহের কাল সাত হইতে এগার বৎসর পর্য্যন্ত প্রশস্ত। ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই কন্যাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে। কিন্তু কন্যা, বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইলে দোষ কি ?

মনু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

কন্যা ঋতুমতী হইয়া পিতৃগৃহে অনূঢ়া অবস্থায় আমরণ থাকিবে, তথাপি তাহাকে নিগুর্ণ বরের নিকট বিবাহ দিবে না। ইহাই সহজ ও ব্যাপক

অর্থ; সকল বর্ণ ও সকল জাতির পক্ষেই এ উক্তি প্রযোজ্য। এই বচনটী উদ্বাহতত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। টীকাকার গুণ-হীন শব্দের অর্থ করিয়াছেন "গায়ত্রীহীন", কাহারো কাহারো মতে "অর্থযুক্ত গায়ত্রীহীন"। কারণ, গুণ শব্দে সূত্রকেও বুঝায়। শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিচারে প্রয়োজন নাই। আমাদের স্থূল দৃষ্টি সহজ অর্থই দেখিতে চায়। টীকাকারের মতানুসারে চলিলে আজকাল অনেক ব্রাহ্মণবালকের বিবাহ করা দায় হইবে। কারণ, কয়জন বালক গায়ত্রী ও তার অর্থ জানে? কয়জনই বা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে?

যতদিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যতদিন পাঠ্যাবস্থা থাকে, ততদিন বিবাহ করা সঙ্গত নয়, মনে করিয়াই শাস্ত্রকারগণ পুরুষের পক্ষে বিবাহের বয়স ত্রিশ করিয়াছেন। এবিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রের সহিত প্রাচীনকালের স্পার্টার আইনের বিলক্ষণ মিল আছে। মহাত্মা লাইকর্গাস (Lycurgus) প্রণীত আইন অনুসারে ত্রিশবৎসরের পূর্ব্বে কোন স্পার্টাবাসী পুরুষ বিবাহ করিতে পারিতেন না। "A spartan was not considered to have reached the full age of manhood till he had completed his thirtieth year. He was then allowed to marry." কিন্তু রমণীরা সচরাচর বিশবৎসর বয়ঃক্রম কালে পরিণীতা হইতেন। "At the age of twenty, a spartan woman usually married." আমরা কিন্তু কুড়ি হইলেই বৃদ্ধার মধ্যে গণ্য করি। কিন্তু স্পার্টার রমণীকুল কুড়ি বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইয়া কেমন বলিষ্ঠ সন্তান প্রসব করিতেন। একদা ভিন্নদেশীয় কোন স্ত্রীলোক লিওনিদসের পত্নীকে বলিয়াছিলেন,—কেবল স্পার্টার রমণীরাই পুরুষদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তদুত্তরে লিওনিদস-পত্নী বলেন,—স্পার্টার রমণীরাই কেবল পুরুষরত্ন প্রসব করিয়া থাকে। When a woman of another country said to gorgo, the wife of Leonidas,

"The spartan women alone rule the men." She replied, "the spartan women alone bring forth men." (Smith's Hisiory of Greece.)

অপূর্ণ, অপুষ্ট অবস্থায় বিবাহ হইলে দোষ কি? এই প্রশ্নের উত্তর সুশ্রুতে পাওয়া যায়,—

ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে ॥
জাতোঽপি ন চিরং জীবেৎ, জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।

(সুশ্রুত, শারীরস্থান।)

পঁচিশবৎসরের ন্যূনবয়স্ক পুরুষের সহবাসে ষোলবৎসরের কম বয়সের স্ত্রী গর্ভধারণ করিলে, সন্তান গর্ভে নষ্ট হয়। প্রাণ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইলেও অধিককাল বাঁচে না। বাঁচিলেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়।

শাস্ত্রের এই কথা যে সত্য, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা প্রায় ঘরে ঘরেই পাইতেছি। সুশ্রুতের মতে ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে পুরুষ ও ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্বে স্ত্রীর মিলন বা সহবাস অনিষ্টকর, সুতরাং নিষিদ্ধ।

সবল-সতেজ গাছ জন্মাইতে হইলে পরিপুষ্ট বীজ ও সুক্ষেত্র চাই। অপকৃষ্ট ভূমিতে সুপুষ্ট বীজ অথবা উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে অপুষ্ট বীজ বপন করিলে চারাগাছ সম্যক্ বৃদ্ধি পায় না। আবার উপযুক্ত জল, বায়ু, ও আলো না পাইলে বড় একটা বাড়িতে পারে না। পশুপক্ষী এবং মানবের দেহও এই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। একই নিয়মে সকলেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ণাবয়ব বীর্য্যবান্ পুরুষ ও পুষ্টকলেবরা বলবতী স্ত্রীর সন্তান, কারণান্তর অভাবে অবশ্যই তদনুরূপ বলবান্, এবং রুগ্ন দুর্ব্বল স্ত্রীপুরুষের সন্ততি তদনুরূপ বা ততোধিক রুগ্ন-দুর্ব্বল হইবে। 'যদ্বীর্য্যস্তৎপরাক্রমঃ।' একথা মিথ্যা নয়। ব্যাঘ্র ও বিড়াল একজাতীয় হইলেও বিড়ালী বিড়ালই

প্রসব করে; বাঘ প্রসব করে না। ব্যাঘ্রশাবক ও বিড়ালশাবকে যে প্রভেদ, পাশ্চাত্যশিশু ও বাঙালীশিশুতে সেই প্রভেদ। কেন? বাঙালী-পিতামাতার দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। বঙ্গীয়শিশু পৃথিবীতে আসে দৈহিক ক্ষুদ্রতা ও খর্ব্বতা লইয়া। বাল্যে বিবাহ হয় বলিয়াই ত বালকবালিকার সন্তান জন্মিয়া থাকে, এবং সেই সন্তান ক্ষুদ্রকায় ও দুর্ব্বল হয়। বাল্য-বিবাহ যে বাঙালীর দুর্ব্বলতার একটী কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যুক্তি ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট ফলের সহিত শাস্ত্রোক্তির মিল থাকিলে, শাস্ত্র মানিতে কাহারো আপত্তি থাকিতে পারে না। যুক্তি বলিতেছে,—যৌবনই বিবাহের প্রশস্ত কাল, বাল্য নহে,। সুশ্রুতাদি শাস্ত্রও সেই কথাই বলিতেছে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

'অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তা মসপিণ্ডাং যবীয়সীম্। অরোগিনীম্।' ইত্যাদি। অর্থাৎ অধ্যয়ন সমাপন করিয়া যুবক অরুগ্না যুবতীর পাণিগ্রহণ করিবে। সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি অনেক সতীনারীর যৌবনেই বিবাহ হইয়াছিল।

কেহ কেহ হয়ত রুষিয়া-গর্জ্জিয়া শাসাইবেন, কি! দেশাচারের বিরুদ্ধে কথা! কিন্তু তাঁহারা জানেন—কত কুলীন কন্যাকে ঋতুমতী হইয়া পিতৃগৃহে অবিবাহিতাবস্থায় থাকিতে হয়! কেহ কেহ পাত্রের অভাবে চির-কুমারী। কেহ বা অচিরে বৈধব্যযন্ত্রনা ভোগের জন্যই অতিবৃদ্ধ 'বয়সে বাপের বড়' হেন বরের গলে মাল্যদান করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন! যে বরের—

"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
কর-ধৃত-কম্পিত-শোভিতদণ্ডং"
আর, কাশিতে কাশিতে সরে শোণিতখণ্ডম্।

আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, কুলীনগণের কুলাচারে রজোদর্শনের পর কন্যার বিবাহে দোষ নাই। অন্য কামিনীর বেলায় দোষ হইবে কেন?

আমরা যেরূপ ক্ষীণায়ু-ক্ষীণজীবী, তাহাতে বিবাহের বয়স যদি পুরুষের পক্ষে শাস্ত্রানুসারে ত্রিশ করা হয়, তবে সংসার-ধর্ম্ম আর কয়দিনের জন্য? এই বলিয়া অনেকে হয় ত দুঃখ করিবেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে নিরাশার কথা কিছুই নাই।

ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর কোন সভ্য দেশেই শিশুবিবাহের প্রচলন নাই। বর্ত্তমান সভ্যদেশবাসী পুরুষেরা অনেকেই পূর্ণ যৌবনে বিবাহ করিয়া থাকেন। তাহাদের গার্হস্থ্যজীবন কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত বলিয়া তাহারা মনে করেন না। ফলতঃ আমরা যদি যৌবনটাকে দীর্ঘ করিতে পারি, তবেই ভোগকালও দীর্ঘ হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদমতে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত মানুষের যৌবন থাকে। যে সমাজে ত্রিশ পার হইলেই জরা আসিয়া পুরুষের যৌবন কাড়িয়া লয়, সে সমাজের লোক আয়ুর্ব্বেদের একথা অলীক বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য কথা। অর্জ্জুন যখন কুরুক্ষেত্র সমরে অবতীর্ণ, তখন তাঁহার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। তখন তিনি পূর্ণ যুবক। প্রাচীনকালের কথাই বা বলি কেন? বর্ত্তমান সময়েও ইয়ুরোপ প্রভৃতি ভূখণ্ডের লোকেরা অনেকেই সুদীর্ঘযৌবন। আমরাও চেষ্টা করিলে ঐরূপ দীর্ঘযৌবন লাভ করিতে কেন পারিব না?

বিবাহের অধিকারী।

বহ্ ধাতুর এক অর্থ বহন করা। তবেই বিবাহ শব্দের আর একটী অর্থ হয়,—বিশেষভাবে (ভার) গ্রহণ করা। এইরূপ ব্যুৎপত্তি গ্রহণ

করিলে বিবাহের অধিকারী কে, তাহা বুঝা যায় এবং যুক্তির সঙ্গেও মিলে। যিনি অন্ন বস্ত্রাদি যোগাইয়া ভার্য্যার সকলপ্রকার ভার বহনে সম্পূর্ণ সমর্থ, শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম, তিনি বিবাহের অধিকারী। দুর্ব্বল অক্ষমের সে অধিকার নাই। যে দরিদ্র হইয়াও অর্থ উপার্জ্জন করে না, করিতে পারে না, সে যদি বিবাহ করে, তবে তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যার দুঃখের আর অবধি থাকে না। মূর্খ, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, পঙ্গুর বিবাহ নিষিদ্ধ। কারণ, যে ব্যক্তি আত্মরক্ষায় অক্ষম, সে ভার্য্যাকে রক্ষা করিবে কেমন করিয়া? এ হেন পুরুষের বিবাহে, পরিবারে কেবল অশান্তি ও দারিদ্র্যই বৃদ্ধি পায় এবং ভিক্ষুকের দল সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সমাজে এইরূপ লোকের বিবাহ অবাধে চলিয়াছে। পুরুষের বিবাহের কোন কালাকাল নাই। ১০ বৎসর বয়সে হইতে পারে, ৬০ বৎসর বয়সেও হইতে পারে। সে এক বিবাহও করিতে পারে, একশ বিবাহও করিতে পারে। ভার্য্যাকে ভরণপোষণ করিতেও পারে, না করিতেও পারে। এরূপ স্বেচ্ছাচার বা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা সমাজের পক্ষে নিতান্ত অমঙ্গল ও ব্রীড়াজনক।

কন্যাপণ।

বিবাহ পবিত্রপ্রণয়বন্ধন। ইহাতে অর্থসম্বন্ধে যে কোনরূপ চুক্তি (contract) নিতান্ত অবৈধ ও অহিতকর। পূর্ব্বে কন্যাপণ ছিল। পিতা কন্যাকে পণ্য দ্রব্যের ন্যায় ১০০০৲, ১২০০৲ টাকায় বিক্রী করিতেন। দাসপ্রথা প্রচলিত থাকা কালে প্রভু, দাস দাসী পোষণ করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যদাতার নিকট (to the highest bidder) বিক্রী করিয়া লাভবান্ হইতেন। কন্যাবিক্রয়ী পিতাও সেই

প্রভু অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহেন। পিতা কন্যারত্নলাভে নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া অধীরচিত্তে এক দুই করিয়া কন্যার বয়স গণনা করিতেন এবং অষ্টম বর্ষে ৮০০৲, নবমবর্ষে ৯০০৲ টাকায় কন্যাদান করিয়া গৌরীদান বা রোহিণীদানের ফল পাইতেন। ইহার ফলে কত বংশ বিবাহ করিয়া নিঃস্ব হইয়াছে, কত বংশ বিবাহ করিতে না পারিয়া নির্ব্বংশ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করে? ব্রাহ্মণদের মধ্যেই পণের মাত্রাটা খুব চড়িয়াছিল। তাহারা যে সকল বিষয়েই পথপ্রদর্শক! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণ 'ভরার মেয়ে' বিবাহ করিয়া সমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

খলপ্রকৃতিক লোকের একটা ব্যবসা হইয়াছিল যে, তাহারা দূর স্থান হইতে নীচ অস্পৃশ্য জাতির মেয়েগুলিকে গণ্ডায় গণ্ডায় নৌকায় ভরিয়া অন্যত্র নিয়া ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে ব্রাহ্মণের নিকট বিবাহ দিত। এই সকল মেয়েরাই 'ভরার মেয়ে' বলিয়া পরিচিত হইত। ইহাতে কন্যাপক্ষ, বরপক্ষ ও ঘটকপক্ষ তিন পক্ষেরই আর্থিকলাভ হইত। মনে করুন, কন্যার মূল্য ৫০০৲ টাকা। কন্যাপক্ষ ৩০০৲ টাকা ও ঘটকপক্ষ ২০০৲ টাকা এইরূপ ভাগ হইল। পাত্রপক্ষ ১০০০৲ টাকা স্থলে ৫০০৲ টাকায় কন্যা পাইল, সুতরাং তাহারও ঠক হইল না। বর-পক্ষ সমাজের নিকট কিয়ৎকালের জন্য কখন কখন লাঞ্ছিত হইত। কিন্তু এই প্রকার বিবাহের নিবারণ জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা হইত না। সুখের বিষয়, এই ভীষণ কুপ্রথা আপনা হইতেই সমাজ হইতে চলিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, তৎস্থানে ততোধিক অশুভজনক আর একটী কুপ্রথা সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। কন্যাপণ চলিয়া গিয়াছে, পাত্রপণ সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

পাত্রপণ।

পূর্ব্বে কন্যার জন্মে মাংসবিক্রয়ী পিতার মনে কত আনন্দ হইত! এখন কন্যার জন্মে দরিদ্রপিতার মুখ শুকাইয়া যায়! কন্যা যতই বড় হইতে থাকে, পিতার উদ্বেগের মাত্রাও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দশবৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই কন্যাকে কি প্রকারে পাত্রস্থ করিতে হইবে, এই চিন্তায় রাত্রিতে তাহার ঘুম হয় না। গৃহিণীও পতির চিন্তানলে ইন্ধন যোগাইতে ত্রুটি করেন না। দরিদ্র হইলেও পণ্ডিত পিতা জানেন,—

'আদৌ তাতো বরং পশ্যেৎ ততো বিত্তং ততঃ কুলম্।
যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ কিং ধনেন কুলেন কিম্॥'

পিতা সর্ব্বাগ্রে পাত্রের পাত্রত্ব খুঁজিবেন, তার পর বিত্ত, তার পর কুল। বর যদি নির্গুণ হয়, তবে ধনেই বা কি হইবে? কুলেই বা কি হইবে?

পিতা সৎপাত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া যাহা দেখেন, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির। সৎপাত্র বলিতে আজকাল পাশ করা ছেলেই বুঝায়। স্বাস্থ্য, সৎস্বভাব প্রভৃতি গুণ সৎপাত্রের লক্ষণ বলিয়া এখন আর কেহ বড় মনে করেন না। কালিদাস বুঝিয়াছিলেন,—

'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

চন্দ্রের কলঙ্ক তদীয় কিরণজালে যেমন ডুবিয়া যায়, তেমনি বহুগুণের মধ্যে একটীমাত্র দোষ ঢাকা পড়ে। আমরা বুঝিয়াছি,—পাত্রের পাশ-মাত্র গুণ থাকিলে সকল প্রকার দোষ অগ্রাহ্য। এক গুণে সব দোষ ঢাকিয়া যায়। পিতা দেখিতে পান, একটা পাশের মূল্য পাঁচশত টাকা।

একটি বি,এ পাশ পাত্রের মূল্য ১৫০০৲। স্বর্ণাভরণ ১০০০৲ অন্ততঃ ৫০০৲, দানসামগ্রী ৫০০৲। এই প্রকারে তাহার কমপক্ষে ৩০০০৲ টাকার একান্ত আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি তিনি আরও দুই চারিটী কন্যার পিতা হন, তবে তাহার যে কি দশা, তাহা তিনি ভিন্ন আর কে বুঝিবেন? কন্যাদায় যে কেমন দায় তাহা তিনিই বুঝেন। পাত্রের পিতার কোন দায় নাই। তিনি হয়ত বলিবেন, পুত্র পাঁচ বৎসর পরে বিবাহ করিবে। এখন বিবাহের কোন ঠেকা নাই। কিন্তু পাত্রীর পিতার বড় ঠেকা। ঋতুমতী কন্যাকে অবিবাহিতাবস্থায় ঘরে রাখিলে, তাহার জাতি কুলমান সব যাইবে, চৌদ্দপুরুষ নরকে যাইবে। এ যে বড় দায়। অবশ্য একথা এস্থলে না বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে যে, কুলীনকন্যা আজীবন পিতৃগৃহে অনূঢ়া অবস্থায় থাকিলেও তাহার পিতার কুলমান সবই বজায় থাকে। সেই কুলের কাহারও নরকদর্শন হয় না। ইহার উপর, কন্যা যদি শ্যামাঙ্গী হয়, তবে দায়ের উপর দায়। কারণ, পাত্রীর গুণের পরীক্ষা হয় রূপের দ্বারা, বর্ণের দ্বারা।

'রূপং বরয়তে কন্যা, মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥'

কন্যা রূপের ও মাতা বিত্তের পক্ষপাতিনী, পিতা বিদ্যার এবং জ্ঞাতিরা কুলের পক্ষপাতী, অপর সাধারণ লোকে মিষ্টান্নেই তুষ্ট। যদি দরিদ্র পিতার এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা হয় যে, তিনি এই সকলেরই ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন, অর্থাৎ রূপবান্, বিত্তশালী, সদ্বংশজাত, বিদ্বান্ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, তবে তাহার ন্যায় অবিজ্ঞ আর কে হইতে পারে? তার সাধ্য কি, এমন পাত্রের পিতার কাছে ঘেঁসিতে পারেন! তার উপর আবার কত বৃথা ব্যয়-বাহুল্য, নাচগান, আতসবাজি, বন্দুক! কেবল তমোগুণেরই ছড়া-

ছড়ি। ইহাতে কন্যার পিতার সর্ব্বস্বান্ত হয় হউক, আমোদের কাজে আমোদ থাকা চাই।

গল্পে আছে,—একদা কতিপয় বালক কোন এক হ্রদের জলে প্রস্তর-খণ্ড লইয়া ছিনিমিনি খেলা খেলিতেছিল। জলাশয়ে অনেক ভেক বাস করিত। প্রস্তরের আঘাতে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া তাহারা বড়ই ফাঁপরে পড়িল, অবশেষে এক সাহসী, বৃদ্ধ ভেক মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিল, বালকগণ! তোমরা এই অল্প বয়সে এত নিষ্ঠুরতা কোথা হইতে শিখিলে? ইহা তোমাদের কাছে আমোদ বটে, কিন্তু আমাদের মৃত্যু। কন্যার পিতা আজকাল ভেকজাতীয়, নিরীহ, নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছেন। যদি বৃদ্ধভেকের ন্যায় কোনও কন্যার সাহসী বৃদ্ধজনক পাত্রের পিতাকে বলেন,—মনে করিয়া দেখুন, আপনি নিজে ১০০০৲ টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, এখন আপনার পুত্রেরই পণ ১০০০৲ টাকা চাহিতেছেন। এত অল্পকালের মধ্যেই কি ঘোর পরিবর্ত্তন! আর বৃথা আমোদ উপলক্ষে নিরর্থক ব্যয় করাইয়া আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিবেন না। একটু দয়া করুন। তখন পাত্রের পিতা হয়ত গর্জ্জিয়া বলিবেন,—'আমি ১০০০৲ পণ দিয়াছি সত্য, এখন কন্যার পিতা যেই হউক না কেন, তাহার নিকট হইতে সুদে আসলে সমস্ত আদায় করিব, তবে ছাড়িব। বিশেষতঃ আমি সম্প্রতি কন্যার বিবাহে কত টাকা খরচ করিয়াছি, তাহাতে ঋণ হইয়াছে। এখন পুত্রের বিবাহে অন্ততঃ সেই টাকাটা না পাইলে ধার শোধ কি করিয়া হয়?

কন্যাপণের ন্যায় পাত্রপণপ্রথা বিনা চেষ্টায় দূর হইবার নহে। কারণ, কন্যা-বিক্রেতাকে সমাজের কাছে হেঁটমুখে থাকিতে হইত, কিন্তু বর-বিক্রয়ী বরের বিবাহে পণ লইয়া গৌরব বোধ করেন। পাত্রের যেরূপ দর চড়িতেছে, তাহাতে হয়ত এমন দিন আসিবে, যখন দরিদ্র পিতা, কন্যার

বিবাহ দিতে আদৌ সমর্থ হইবেন না। তখন সমাজে অনেক কন্যা অবিবাহিতা থাকিবে। ইত্যাদি কারণে বিবাহসংস্কারের সংস্কার আবশুক। অনেকেই পাত্রপণ উঠাইয়া ব্যয়সঙ্কোচ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। এবিষয়ে একটা সহজ পন্থা আছে বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক বিবাহার্থী যুবক যদি দৃঢ়পণ করেন, 'আমি ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে অন্ততঃ ষোড়শ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা পাত্রীর পাণিগ্রহণ করিব না,' পণ গ্রহণ করিব না, এবং প্রাণপণে এই পণ রক্ষা করেন, তবে আর সভাসমিতি আন্দোলন আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন থাকে না। 'Our remedies oft in ourselves do lie' আমাদের দোষের প্রতীকার প্রায়শঃই আমাদের হাতে রহিয়াছে; কবি সেক্ষপিরের একথা স্মরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই কৃতকার্য্যতা লাভ সম্ভবপব।

অলঙ্কার।

বঙ্গীয় রমণীসমাজে স্বর্ণাভরণের অতিমাত্র সমাদর। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ মণ্ডনপ্রিয় বটে, কিন্তু পৃথিবীর আর কোন দেশের কোন নারীসমাজই এরূপ স্বর্ণালঙ্কারে পক্ষপাত প্রদর্শন করেন না। এই কৃত্রিম অলঙ্কার অঙ্গনাগণের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি বা রূপের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না, একথা যিনি বলিবেন, রসিক যুবকগণ তাঁহাকে অরসিক বলিয়া উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে রসজ্ঞ রাজা দুষ্মন্ত কি সাক্ষ্য দিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন—অহো মধুর মাসাং দর্শনম্!

> "শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্থ।
> দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥"

আহা! ইহাদের (শকুন্তলা, প্রিয়ংবদা ও অনুসূয়ার) কি মধুর রূপ! আশ্রমবাসিনী হইয়াও, ইহাদের এই রূপ, অন্তঃপুরচারিণীগণের দুর্লভ; তবেই বলিতে হয়, উদ্যানলতা গুণে বনলতার নিকট পরাজিত। শকুন্তলা ও তাহার সখীদ্বয়ের অঙ্গে কোন অলঙ্কার ছিল না। রাজান্তঃপুর-বাসিনী কামিনীগণ মণিমুক্তাহেমমণ্ডিতা হইয়াও রূপে বনবাসিনীগণের নিকট পরাভূত। তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী।" এই কৃশাঙ্গী (শকুন্তলা) বল্কল পরিধান করিয়াও অতীব মনোহারিণী।

মেঘদূতের নির্ব্বাসিত যক্ষ, যক্ষরমণীদিগের কিরূপ সৌন্দর্য্যজ্ঞান ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন।

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং,
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

অলকাপুরীতে যক্ষললনাদিগের হস্তে লীলাকমল, অলকে নববিকসিত কুন্দকুসুম, মুখশ্রী লোধ্রপুষ্পের পরাগে পাণ্ডুবর্ণ, কেশবন্ধে নবকুরুবক, কর্ণে মনোহর শিরীষপুষ্প এবং সীমন্তে তোমার (মেঘের) আগমন জনিত কদম্বপুষ্প শোভা পায়।

অলকানগরী যক্ষরাজ কুবেরের রাজধানী। সেখানে ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। গৃহে গৃহে অক্ষয় নিধি, তথাপি যক্ষকামিনীরা স্বর্ণাভরণে স্পৃহা না রাখিয়া কুসুম-ভূষণে সাজিতেন।

পূর্ব্বকালে সংস্কৃত কবিরা নানা অলঙ্কারে কবিতাসুন্দরীকে সাজাইতেন, কিন্তু এখন বঙ্গকবিগণ ইংরাজকবিগণের অনুসরণে এরূপ কার্য্য সুরুচিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। স্ত্রী-কবি, পুরুষ-কবি কেহই আর অতিরিক্ত অলঙ্কারে বাঙ্গালা কবিতাকে সাজাইয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু এ সব ত কাব্যের কথা। কোন আইনজ্ঞ বিচারক ও আইন-ব্যবসায়ীর নিকট এরূপ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না সত্য, তবে রসিক যুবকগণের প্রাণটা নাকি রসে ভরপুর, হৃদয়টা কাব্যময়; তাহারা স্বর্ণাভরণের মধ্যে কত সৌন্দর্য্য, কত কাব্য দেখিতে পায়। কাব্য তাহারা ভালবাসে; তাই কাব্য-কথার উল্লেখটা নিতান্ত অসঙ্গত হইল বলিয়া বোধ হয় না।

কল্পনা ছাড়িয়া বাস্তব জগতে আসিলেও দেখিতে পাওয়া যায়,—মণিপুর প্রভৃতি স্থানে কামিনীরা ফুলের গয়না পরিয়া সাজিতে ভালবাসেন, ইহাতে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় বলিয়া তাহাদের ধারণা নাই। ফুলের গয়না!! সে কি!! সে ত একদিনেই শুকাইয়া যায়! যুবক যুবতিগণ! তোমরা ফুলের ভাষা জান; ঐ শোন বনে ও উদ্যানে কত ফুল ফুটিয়া হাসিয়া কি বলিতেছে। বলিতেছে না কি?—আমাদের যে দশা, তোমাদের ঐ যৌবন-ফুলেরও সেই দশা। আমাদিগকে উপহাস করা কি সহৃদয়তার কার্য্য? আমাদের রূপ ক্ষণস্থায়ী সত্য, কিন্তু কার রূপ চিরস্থায়ী? আমরা নিজের সৌন্দর্য্য লইয়াই সুন্দর। ধার-করা সৌন্দর্য্যের কোন ধার ধারি না। বঙ্গের কুলকামিনীগণ! তোমাদিগকে আর একটা কথা বলি। আমাদের মতন তোমাদের শরীরটা কোমল, প্রাণটা কোমল। এই দুর্ব্বল দেহ আমাদেরই ভার বহন করিতে সমর্থ। কেন তোমরা নাসা-কর্ণ-বেধ করিয়া সোণার কঠিন ভার বহন করিয়া দেহটাকে জর্জ্জরিত কর? ইহাতে কি সুখ?

বুদ্ধিমতী প্রৌঢ়া রমণীগণ 'স্ত্রীধন' বলিয়া স্বর্ণালঙ্কারের পক্ষপাতিনী। স্ত্রীধনের ভাগ নাই। ইহা রমণীর নিজ সম্পত্তি, ইহাতে তাহার পূর্ণ অধিকার। এ দেশের রমণীগণ পৈতৃকধনে বঞ্চিত। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার নাই। আবার স্বামীর সম্পত্তিতে পুত্রেরই অধিকার। কাজেই কোন কালেই রমণীদিগের নিজস্ব কিছুই থাকে না। সুতরাং তাহাদের একটা নিজ সম্পত্তির ব্যবস্থা থাকা ভাল, সন্দেহ নাই।

এখন লাভালাভের গণনাটা আসিতেছে। আচ্ছা, একটা হিসাব ধরা যাউক। মনে করুন, ৫০০৲ টাকার গয়না গড়ান হইল। কমপক্ষে এক-চতুর্থাংশ সেকরাকে দিতে হইল। তবেই ৫০০৲ টাকায় ৩৭৫৲ টাকার জিনিষ ঘরে আসিল। পরন্তু শতকরা ১৲ টাকা হিঃ মাসিক সুদ

ধরিলে ৫০০৲ টাকার স্তদ ১০ বৎসরে ৬০০৲ টাকা, সুদে আসলে ১১০০৲ টাকা হইবে। কিন্তু গয়নাতে আছে ৩৭৫৲ টাকা। দশ বৎসরে ৭২৫৲ টাকা, বিশ বৎসরে ১৪৫০৲ টাকা লোকসান। স্বামী যদি বাজারে যাইয়া এক টাকা ভাঙ্গাইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বার আনা ঘরে আনেন, তবে তাহাকে আহাম্মক বলিবার অধিকার অন্যের না থাকিতে পারে; কিন্তু গিন্নী তাহাকে মূর্খ, বোকা বলিয়া ভৎ'সনা করিতে ছাড়িবেন কি? কিন্তু যখন ৫০০৲ টাকা দিয়া ৩৭৫৲ টাকা, ১০০০৲ টাকা দিয়া ৭৫৯৲ টাকা, ২০০০৲ টাকা দিযা ১৫০০৲ টাকা তিনি ঘরে নিয়া আসেন, তখন গিন্নী শতমুখে তাহার বুদ্ধির সহস্র প্রশংসা করিবেন! বাস্তবিক ইহাতে সম্পত্তি করা হয়, না সম্পত্তি খোয়ান হয়? ইহার উপর দস্যু তস্করের ভয়, আগুনের ভয় ত আছেই। কিন্তু এত হিসাব-নিকাশ কে করে? আমরা শাস্ত্রের কটমট ভাষা শুনিলেই কাণে আঙ্গুল দেই, কাব্যের কথা কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেই। আবার হিসাবের বেলায় অত কড়া ক্রান্তির গণনা নীচতা এই বলিয়া উদারতা দেখাই।

আগে ধনী রমণী ১০০৲ টাকার গয়না পাইলেই নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন। তখন রূপার গয়নার আদর ছিল। এখন রূপা রূপ হারাইয়াছে; রূপসীদিগের পায়ের যোগ্যও নহে। এখন ১০০৲ টাকার সোণার গয়না অতি সামান্য। ইহাতে দরিদ্র রমণীরও মন উঠে না। ১০০০৲,১২০০৲ টাকার গয়না অনেক ভদ্রমহিলারই আছে। তা না হ'লে তাহার মান থাকে না, ভদ্রতা রক্ষা হয় না, নিমন্ত্রণসভায় বড় আসন মিলে না। তাই অঙ্গনাগণ 'অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ'। টাকা থাকুক্ আর নাই থাকুক্, কেবল দেও দেও, গয়না দেও, এই রবে দরিদ্রপতিকে অধীর-অস্থির করিয়া তোলে। পতিও চাকুরী পাইয়াই সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। দুঃখের

বিষয়, চিরজীবনেও ঋণ শোধ হয় না। অল্পবেতনভোগী ভর্ত্তা স্ত্রীঋণে মুক্তিলাভের আশায় কত আর্থিক কষ্টভোগ করেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কেহ কেহ ঋণ করিয়া স্ত্রীর অলঙ্কার দিয়া থাকে; কাহাকেও বা সেই ঋণের দায়ে কারাভোগ করিতে হয়।

যুক্ত পরিবারের সকল পুরুষই সমান উপার্জ্জনশীল নহেন। যিনি অধিক উপার্জ্জনক্ষম, তিনি হয়ত নিজ পত্নীকে অনেক টাকার গয়না দিলেন। অযোগ্য অক্ষমের স্ত্রীর ভাগ্যে যৎসামান্য গয়না জুটিল। ইহাতে কথন কথন বধূগণের মধ্যে মনোমালিন্য অবশেষে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। অলঙ্কারে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই, লাভের মধ্যে দারিদ্র্য ও অশান্তি বৃদ্ধি। অলঙ্কার প্রকৃতপক্ষে সৌন্দর্য্যের হেতু নহে। কিন্তু মানিলাম তাই বটে। শুধু একটু সৌন্দর্য্যের খাতিরে এতগুলি অপকার সহ্য করা সমাজের পক্ষে শুভজনক নহে। বহু অনর্থের মূল অলঙ্কার উঠাইয়া দিতে ধনী কি দরিদ্র কাহারো কোন আপত্তির অনিবার্য্য কারণ নাই। এই আত্মকৃতব্যাধির প্রতীকার না হইলে সমাজের দারিদ্র্য দুর্গতি কেবল বৃদ্ধিই পাইবে। পাত্রপণের সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কারের দাবিতে কন্যাপক্ষ নিপীড়িত। কিন্তু যুবতীরা যদি প্রতিজ্ঞা করেন,—আমরা গয়না চাই না। তবেই তাহাদের পিতৃকুল ও পতিকুল স্বস্তি পাইবে। তাহারা যদি বোঝেন, অলঙ্কারে মানসিক বা আত্মিক উন্নতি হয় না। ইহা শরীরে বল দেয় না অথবা দুর্ব্বলতাদূর করে না। যদি বোঝেন বলই সৌন্দর্য্য, যৌবনে যখন বল বৃদ্ধি পায়, তখন দেহ সুন্দর; কিন্তু জরা আসিয়া যখন বল হরণ করে, তখন আর সৌন্দর্য্য থাকে না, কোটি টাকার গয়না পরিয়াও জরতী, যুবতীর কান্তিলাভ করিতে পারে না। আর যদি বোঝেন,—চরিত্র-মহিমাই, অমূল্য মণ্ডন, স্বর্ণাভরণ তাহার নিকট অতি তুচ্ছ, হেয়। বুঝিয়া যদি প্রতিজ্ঞা করেন, সামান্য সোণার অলঙ্কার আর গ্রহণ করিব না, আর

পরিব না, বিমল উজ্জ্বল চরিত্র-রত্নের কিরণ চতুর্দ্দিকে ছড়াইব, তবেই তাহারা ধন্য, বঙ্গদেশ ধন্য হইবে। আর যুবকেরাও যদি অঙ্গীকার করেন,—আমরা গয়না দিয়া আর রমণীদিগকে ভুলাইয়া রাখিতে চাই না। চাই না আর তাহাদিগকে ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত রাখিতে, তবেই সমাজের কলঙ্ক দূর হইবে, কল্যাণ হইবে।

বঙ্গমহিলা।

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য ও সাম্য উভয়ই আছে, উভয়ই স্বাভাবিক। স্ত্রীজাতি হৃদয় প্রধান; অবলা, কোমলা, স্নেহশীলা। পুরুষ মস্তিষ্ক প্রধান, দৃঢ়, বলবান্। এক হিসাবে ইহাদের কর্ত্তব্য পৃথক্। শিশুকে স্তন্যদান জননীর কার্য্য। শিশুর অন্নবস্ত্রাদির সংস্থান পিতার কর্ত্তব্য। পুরুষের কাজ রমণীর সাজে না, রমণীর কাজ পুরুষের সাজে না। সত্য বটে, রেজিয়ার ন্যায় কোন কোন রমণী পুংপ্রকৃতিক। আবার, কোন কোন পুরুষ স্ত্রীস্বভাবাপন্ন। কিন্তু স্ত্রীর স্ত্রীত্বই শোভা ও সৌরভ, পুরুষের পুরুষত্বই স্বভাব ও গৌরব। কেবল পৌরুষ-কাঠিন্যে সংসার উষরভূমি। কেবল স্ত্রীসুলভ পেলবতায় সংসার মানব বাসের অযোগ্য জলাভূমিতে পরিণত হয়। যে সমাজে স্ত্রীভাবাপন্ন পুরুষের সংখ্যা অধিক, সেই সমাজের বড় দুর্ভাগ্য।

যেমন বৈষম্য, তেমনি সাম্যও আছে। পুরুষও মানুষ, স্ত্রীও মানুষ, মনুষ্যের হিসাবে উভয়েরই সমান অধিকার। মানুষের মধ্যে যে পশুভাব আছে, তাহা ঘুচাইয়া মনুষ্যত্বে উপনীত হওয়া যেমন পুরুষের কর্ত্তব্য, স্ত্রীর পক্ষেও তাহা বাঞ্ছনীয়। আবার, পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তু ও নরনারী সকলেই প্রাণী; এই প্রাণীর হিসাবে সকলেরই একটা সাধারণ ধর্ম্ম ও অধিকার আছে। ক্ষুৎপিপাসা সকলেরই আছে এবং তাহা চরিতার্থ করা সকলেরই আবশ্যক।

আমরা নারীদিগকে চক্ষু থাকিতে অন্ধ, পদ থাকিতে পঙ্গু, প্রাণ থাকিতে প্রাণহীন করিয়া রাখিয়াছি। এমন কি, পৃথিবীতে তাহাদের

যে একটা অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব আছে, সমাজে তাহাদের মনুষ্যরূপে কোন প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা আমরা যেন স্বীকার করিতে চাই না, তাহাদিগকেও বুঝিতে দেই না। ভগবান্ বায়ু ও আলো সৃষ্টি করিয়াছেন সকলেরই জন্য, সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার, সকলের পক্ষেই দরকার। তিনি ইহা বলেন নাই যে, এই যে আমি বায়ু ও আলো সৃষ্টি করিয়াছি, ইহা সকলেই স্বাধীনভাবে ভোগ করিবে; কেবল বঙ্গের ভদ্র-মহিলাগণ পারিবে না।

বঙ্গের কুলকামিনীরা অসূর্য্যম্পশ্যা; সূর্য্য তাহাদের মুখ দেখে না, তাহারা সূর্য্যের মুখ দেখে না। যাহারা সহরে স্বামীসঙ্গে বিদেশে প্রবাসে থাকেন, তাহারা প্রাচীর-বেষ্টিত, ছটাক-পরিমিত, রুদ্ধবায়ু ভবনে চিররুদ্ধ। বাহিরের আলো ও বিমলবায়ু তাহাদের কোমল দেহের পক্ষে অনুপযোগী বলিয়াই কি এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে? যে বায়ু জীবের প্রাণ, তাহা শরীরে লাগিলে বুঝি তাহাদের প্রাণরক্ষা হইবে না? কিন্তু প্রকৃতকথা এই যে, পুরুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে যদি অঙ্গচালন, অম্লজান ও আলো হিতকর হয়, স্ত্রীজাতির স্বাস্থ্যের পক্ষেও তাহার অন্যথা হইতে পারে না। শারীর-শ্রম না করিয়া ঘরে বসিয়া বসিয়া দিন কাটাইলে কাহারো স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে না, মন ভাল থাকে না, স্ফূর্ত্তি জন্মে না। এরূপ ভাবে যাহার দিন কাটাইতে হয়, সে (বুঝুক আর নাই বুঝুক) দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি'। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। বাল্যে পিতার, যৌবনে পতির, বৃদ্ধকালে পুত্রের আশ্রয়ে নারীর থাকা আবশ্যক। কিন্তু তা বলিয়া ইহাদিগকে মুক্ত স্থানের বিশুদ্ধ বায়ুসেবনে, অগ্নিবৃদ্ধিকারক শ্রমে, স্বাস্থ্যের নিয়মপালনে বিরত রাখা, পিতা, পতি বা পুত্রের কর্ত্তব্য হইবে না।

মানুষ, পশু হইতে শ্রেষ্ঠ—জ্ঞানে (Reason)। এই জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলন স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই আবশ্যক। বহুদর্শনে জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করে। বাহিরের আলো ও ভিতরের আলো, সূর্য্যালোক ও জ্ঞানালোক মনুষ্যজীবনে আবশ্যক। কিন্তু বঙ্গঅবলার বহির্দর্শন নাই, বহুদর্শন নাই। উচ্চাঙ্গের অধ্যয়ন নাই। অন্তরের অন্ধকার দূর হইবে কিসে? বালিকারা বিবাহের পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে কিছু লেখাপড়া আরম্ভ করে বটে, কিন্তু অকালে বিবাহিতা হইলেই বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিতে বাধ্য হয়। পতিগৃহে যাইয়াই তাহাদিগকে অবগুণ্ঠনবতী, অসূর্য্যম্পশ্যা হইতে হয়। তখন উভয় প্রকার আলোই তাহাদের পক্ষে দুর্ল্লভ। এই অবস্থার জন্য বাল্যবিবাহ কতকটা দায়ী।

স্ত্রী, স্বামীর জীবনসঙ্গিনী। যাহাকে নিয়া চিরজীবন একত্র বাস করিতে হইবে, তাহাকে মূর্খ করিয়া রাখা কি বিজ্ঞের কার্য্য? মূর্খের সংসর্গ মূর্খের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, বিদ্বানের নহে। বিদ্বান্ বিদ্বানেরই সঙ্গ কামনা করে। মূর্খের সহবাস তাঁহার নিকট বিষতুল্য। অবিদুষী ভার্য্যাকে জীবনসঙ্গিনী করিয়া কোন্ বিদ্বান্ সুখী ও উপকৃত হইতে পারেন? আজকাল মেয়েদের মধ্যে লেখা পড়ার কিছু চর্চ্চা হইতেছে সত্য, কিন্তু সে চর্চ্চা কিছু-না অপেক্ষা বেশী কিছু নয়। তাহাতে মনের আঁধার ঘোচে না, মালিন্য দূর হয় না।

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥

ইন্দুমতীর আকস্মিক মৃত্যুতে অজ বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন—নিষ্করুণ যম তোমাকে হরণ করিয়া আমার কি না হরণ করিল! প্রিয়ে! তুমি আমার গৃহিণী, সচিব, সখী ও সঙ্গীত প্রভৃতি ললিত কলাবিদ্যায়

প্রিয়শিষ্যা ছিলে! হায়! তোমাকে হারাইয়া আমি এই সবই হারাইয়াছি। এরূপ কথা কয়জনে বলিতে পারে? এরূপ পত্নী কয়জনের ভাগ্যে মিলে? মিলিতে পারে, কিন্তু আমরা চাই না। ইন্দুনিভাননা, ইন্দীবরলোচনা ইন্দুমতী মহারাজ অজের কেবল নর্ম্মসখী ছিলেন না। তিনি অজের মন্ত্রী ছিলেন। বস্তুতঃ ভার্য্যাকে ভর্ত্তার মন্ত্রী করিতে হইলে তাহার সেইরূপ গুণ জন্মান আবশ্যক! অজ্ঞের মন্ত্রণা নিয়া কাজ করিলে অশুভ ভিন্ন শুভ হইতে পারে না।

'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিনী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে।

গৃহকে গৃহ বলা যায় না, গৃহিণীই গৃহ। এই গৃহিণীর সহিত সর্ব্ব প্রকার পুরুষার্থের সেবা করিবে। মনুষ্যজীবনে যত প্রকার প্রয়োজন আছে, সমস্তই স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সাধন করিতে হইবে। সকল বিষয়েই স্ত্রী, স্বামীর সহায় হইবেন। কিন্তু স্ত্রীর নিকট কয়জন পুরুষ উন্নত কর্ত্তব্যের পথে হাঁটিতে সাহায্য পাইয়া থাকেন? পুরুষার্থ সাধিতে যিনি সহায় হইবেন, তাঁহার মধ্যে সৎ-সাহস, উদার কর্ত্তব্যবুদ্ধি, কর্ম্মতৎপরতা প্রভৃতি গুণ না থাকিলে, তিনি কি প্রকারে স্বামীর সাহায্য করিবেন?

'অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য যঃ সভার্য্যঃ স বন্ধুমান্॥' মহাভারত।

ভার্য্যা মনুষ্যের অর্দ্ধেক, ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যা ত্রিবর্গের মূল। ভার্য্যা পরমবন্ধু।

ভার্য্যা যেমন স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ, ললনাকুল সেইরূপ সমাজের অর্দ্ধাংশ। ভার্য্যাকে লইয়া স্বামী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। নচেৎ তিনি অপূর্ণ। অঙ্গনাদিগকে বাদ দিয়া সমাজ অপূর্ণ, তাহাদিগকে লইয়া পূর্ণ। অর্দ্ধাংশকে বাদ দিয়া কোনও সমাজ অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে না। যত

দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন অর্দ্ধাঙ্গ-রোগীর ন্যায় অচল। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মূলে ভার্য্যা। তিনি স্বামীর যাবতীয় কর্ত্তব্যকর্ম্মে সহায় হইবেন। আমরা রমণীদিগকে ত্যাগ ও তিতিক্ষা শিক্ষা দিতে সর্ব্বদা লালায়িত। ত্যাগ করিতে করিতে তাহারা সবই হারাইয়াছে। প্রাণটা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহারা জড় কাষ্ঠ-পুত্তলিকায় পরিণত হইয়াছে এবং পুরুষেরাও সেই পুত্তলিকার সাজ-সজ্জা লইয়াই ব্যস্ত। পুরুষ নিজে অত্যাগী হইয়া ভার্য্যাকে ত্যাগ শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক!

বঙ্গনারীর নিজস্ব কোন্ বিষয়ে আছে? বেদে উপনিষদে বা দেব পূজায়, বা অন্য কোন উচ্চবিষয়ে কোন অধিকার নাই। নিজের চিন্তা নাই, স্বাস্থ্য নাই—নাই বলিতে কিছুই নাই। শরীরে বল নাই, মনের বল নাই, আত্মার বল নাই। সকল প্রকারে বলহীন করিয়া তাহা-দিগকে যে কোথায় কোন্ আঁধার-কোণে লুকাইয়া রাখিব, তাহা ভাবিয়াই আমরা ব্যাকুল। যিনি আমাদের জীবনসখা, প্রাণের বন্ধু, তাহার নিকট আমরা কি উপকার পাই? পাই দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, ক্ষুদ্রতা। দুর্ব্বল পুরুষেরা রমণীদিগকে বলশালিনী করিতে চায় না, পাছে রমণী-দিগের উপর তাহাদের প্রভুত্ব ছুটিয়া যায়। কিন্তু যেমন ভর্ত্তার বলে ভার্য্যার বল, তেমনি ভার্য্যার বলেও ভর্ত্তার বল। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বলিষ্ঠ হইলে তাহাদের সন্তানগণ বলিষ্ঠ হইবে। স্ত্রীজাতিকে বলশালিনী করা আমাদের স্বার্থ। ইহাদের দুর্ব্বলতা পতি-পুত্রের মধ্যে সংক্রমিত হইয়া সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া তুলে।

'To be weak is miserable'.

দুর্ব্বলতাই দুঃখের নিদান।

সম্পূর্ণ।

OPINIONS

OF

Eminent Scholars of Europe and India on Kavitakorakam, a poem by Pandit Abinash Chandra Chakraverti.

From the RIGHT HON'BLE PROFESSOR F. MAX MULLER K, M. :—

8th July 1900, Oxford.

DEAR SIR,

Though my long illness has left me weak and unable to do much beyond what I must do, a look at your book has given me much pleasure, as showing both your unusual knowledge of Sanskrit and the excellency of the sentiments which you express in that by no means easy language. Accept my best thanks. Believe me,

Yours very truly,

(Sd.) F. MAX MULLER.

From Professor Herman Jacobi, Ph.D., the great German Scholar and Professor of Sanskrit in the University of Bonn, Germany :—

Bonn, 28, IX *oo*,

DEAR SIR,

I beg to offer you my best thanks for kindly presenting me with your कविताकोरकम् (Kavitakorakam) which

I have read with pleasure, at least the Sanskrit part, for I have but an indifferent acquaintance with Bengali. The whole is a proof of your पाण्डित्य (scholarship), and some parts, especially those about the seasons may rank as fair specimens of कविता (poetry).

Yours truly,
(Sd.) H. JACOBI.

From M. Auguste Barth of Paris, one of the greatest Sanskrit Scholars in Europe :—

AUDIERNE (FINISTÈRE)
22nd September, *1900*.

DEAR SIR,

Accept, I pray, my best thanks for the kind sending of your *Kavitakoraka*. I have read it with a great pleasure, though I must confess, modern Sanskrit poetry has not for us the same interest as it does for your countrymen. With us, it is no poetry at all, but only a proof of mastership over the difficuities of the Sanskrit language. But even such a proof is interesting, especially, as it is the case with your litlle book, when it is so convincing and so ably done. I have received and read your *Kavyas* here, where I am staying on the sea side, without the assistance of any book or lexicon, and so I must fear I have not been able of getting into all its niceties. For there is, with us, the great drawback of Sanskrit and especially of modern Sanskrit poetry: the unavoidable temptation

to the author of involving the plainest thought in the most intricate and far-fetched language. Yourself did not always, methinks, escape from it, though I am glad to say that you are relatively sober and moderate in this respect. Especially in the choice of your subject-matter, you have fortunately kept clear from those must dangerous lanks, the worn out stuff of Sanskrit mythology and Sanskrit commonplace. Even when, as in your little *Ritusamhara* and your Yuva, you get nearer of them, you have succeeded in taking a modern and human view of the matter.

Accept once more, Dear Sir, my best thanks, and believe me.

Yours very truly,
(Sd.) A. BARTH.

From Professor Sitaram Dinkar Ghate, Professor of Sanskrit, Holkar College:—

HOLKAR COLLEGE,
15th August, 1900.

DEAR SIR,

I have read your book *Kavitakorakam* and am greatly delighted to say that it is endowed with many excellences such as the consistency of sense, grammatical purity, flawlessness of the metres used, charming words and rhetorical embellishment. My

opinion about the poem may be best stated in the following verse composed by me :—

बोध्यार्थं सदृशं सुसङ्गतमसंस्कारच्युतं वाङ्मयं
वृत्तं चास्खलितं पदं सुललितं सालङ्कृतिं चाकृतिम् ।
काव्यं नव्यमपीह सुज्ञरसिकैः सेव्यं तु गव्यं यथे-
त्येतत् संमनुते हि मोदितमना घण्टापदोपाधिकः ॥

From Mahamahopadhyaya Nilmani Mukerjea, M.A., B.L., Late Principal, Sanskrit College, Calcutta :—

The 18th May, 1900.

DEAR SIR,

I have to thank you for the present of a copy of your poetical reader entitled *Kavitakoraka*. The book is written in Sanskrit verse with a Bengali translation, and contains many moral lessons. The language is simple, flowing and well adapted to the topics treated in the book, and the translation appended is appropriate and conveys the meaning of the text with clearness.

From Babu Bidhubhshan Gosvami, Professor of Sanskrit, Hugli College :—

CHINSURA,
The 15th July, 1900.

DEAR SIR,

I thank you sincerely for your kindly presenting me with a copy of your nice little book the

Kavitakorakam. 'In these days any attempt at original Sanskrit metrical composition should be welcome. It goes without saying that a book of the nature of *Kavitakorakam* will be highly welcome. I am glad to say that the book on the whole is well written and that you have handled several metres with admirable success. The piece 'युवा' (Youth) evinces sentiments which are calculated to hold up high principles of action to both young and old.

Your Bengali version of the pieces is very good, and in many places shows what the original should have been.

From Babu Umacharan Banerjea, M.A., Principal, Burdwan Raj College:—

I have glanced at certain portions of *Kavitakorakam* by Babu Abinash Chandra Chakravarti, a teacher, in the High School, Dhuri, Assam, and can unhesitatingly declare the work creditable to the Author.

2. The perusal of some stanzas has given me great pleasure, for the purity, both of matter and the style, which they undoubtedly exhibit.

3. The writer shews himself quite at home in the technicalities of metrical compoasition both in Sanskrit and Bengalee. Besides, his verse appears to be characterized by simplicity, sweetness and naturalness.

4. The author deserves encouragement at the hands of the patrons of Sanskrit scholarship.

From the Hon'ble Justice Gurudas Banerjea, M.A.:—

NARIKELDANGA,

Calcutta, 23rd April, 1900.

SIR,

I thank you for your kind present of a copy of your ‘कविताकोरकम्’ (Kavitakorakam) The verses are simple and sweet, and I have read them with great pleasure.

From Babu Banamali Chakravarti, M.A., Offg. Principal, R. C. College, Barisal :—

August 15th 19[illegible].

SIR,

I thank you for the copy of *Kavitakorakam*, which you have been pleased to present to me. I have gone through portions of the book and think that they do great credit to you. The book is instructive, and the language is good. To write in elegant verse in a dead language, such as Sanskrit. is a difficult work, and I congratulate you heartily on your success. I shall be glad to see you prospering as an author.

From Babu Annada Prasad Mukerjea, the renowned Editor of Anandakanan : —

BENARES

6th December.

I have read with great interest, Babu Abinash Chandra Chakravarti's Kavitakorakam.* The stanzas of the poem

both Sanskrit and Bengalli are not only composed in an exquisitely beautiful style, but are expressive of excellent moral lessons. There is no monotony throughout versification of the poem. In short, all lovers of Sanskrit and Bengalli instructive poems, will find it a very useful piece for their occasional literary entertainment.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA
June 27, 1900.

Kavitakorakam, by Babu Abinash Chandra Chakravarti.— This Book is divided into two parts. The first portion contains a few poems in Sanskrit on youth, all the seasons save one, father and mother and the second part contains poems in Bengalli on those very subjects. Of course an attempt to compose poems in Sanskrit at the present day is surely commendable, and we hope the author would receive encouragement from the public. So far as we could judge the verses appeared to us to be excellent.

From Mahamahopadhyaya Chandrakanta Tarkalankara of Calcutta ;—

কবিতাকোরকের রচনা সরল ও প্রাঞ্জল। স্থানে স্থানে রচয়িতার সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। পিতৃমাতৃভক্তি প্রীতিপ্রদ। ১৪ জ্যৈষ্ঠ।

From Babu Krishna Kamal Bhattacharya, B.L., Principal, Ripon College, Calcutta :—

11-16-00

আমি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কবিতাকোরক পড়িয়াছি—তাহাতে আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে সংস্কৃতভাষার চর্চ্চাতে আপনি বিশিষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্লোক-রচনা-বিষয়েও বিলক্ষণ পারিপাট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। * * * আপনার যুবা নামক প্রবন্ধের চরমাংশটুকু পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। আবার উহার বাঙ্গালা অনুবাদটুকু আমার মূল সংস্কৃত অপেক্ষাও সুন্দরতর বোধ হইয়াছে।

From Mahamahopdhyaya Kailas Chandra Siromani, Professor, Sanskrit College, Benares :—

श्रीअविनाशचन्द्र-चक्रवर्त्तिनामा कविताकोरकनामकं खण्डकाव्यं विरचय्य निजकाव्यनिर्म्माणशक्तिं प्रकाशितवान्। तद्दृष्ट्वाऽहं सन्तुष्ट आशासे चासौ एवंविधानेकं काव्यं निर्म्मायानेककीर्त्यास्पदं भूयादिति विज्ञापयति।

From Pandits Jaykrihna Vidyasagar, Jayram Vedantavagisa and Bijay Krishna Vidyanidhi of Benares :—

श्रीविश्वेशो विजयते।

श्रीयुतेनाविनाशचक्रवर्त्तिना विरचितं कविताकोरकाभिधानं खण्डकाव्यं माधुर्य्यादिगुणशालित्वात् रसभावादि-

सम्यग्वत्तयानुपमोपमाद्यलङ्कृतत्वेन च प्राचां लेखानुकारितया समधिकं सहृदयहृदयं विनोदयतीति मन्यामहे ।

From Pandit Jadavesvar Tarkaratna of Rungpur :—

রংপুর, ৩০শে আষাঢ়।

* * * নিম্নে সংস্কৃতে যে কবিতাকোরকের সমালোচনাটী পাঠাইলাম, তাহা প্রকাশ করিবেন। আমি বহিখানি পড়িয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি।

कथयति कः कोरकमिति कवितालनितमालतीलतिकासु ।
पुष्यन्तीव कुसुमानि प्रायो नायमन्यया भणति ।

From Babu Sarat Chandra Gupta, Professor of Sanskrit, Victoria College, Kuch-behar :—

আপনার রচিত কবিতাকোরক পাঠ করিয়া বড় প্রীতিলাভ করিলাম, কবিতাগুলি সরল, উপদেশপূর্ণ, সুকুমারমতি বালকগণের পাঠ্য। বঙ্গানুবাদগুলি গ্রন্থকারের কবিত্বের পরিচায়ক। আশা করি, গ্রন্থকার আরও নূতন নূতন কবিতা লিখিয়া পাঠকগণের প্রীতিসম্পাদন করিবেন।

From Pandit Sibnarayan Siromani, Professor, Sanskrit College, Calcutta :—

মহাশয়,

আপনি সুললিত সংস্কৃত ভাষায় "কবিতাকোরক" নামে যে খণ্ডকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করি-

লাম। শ্লোকগুলি অতীব শ্রুতিমধুর হইয়াছে। ভরসা করি, এইরূপ প্রসাদ ও মাধুর্য্য গুণসম্পন্ন শ্লোক রচনায় আপনার প্রগাঢ় অভিনিবেশ অবিচলিত হইলে কালক্রমে অবিনাশ-কীর্ত্তি সংসারে অবশ্যই অন্বর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। ইতি ১৪ই ফাল্গুন ১৩০৭ সাল।

From Pandit Panchanan Sahityacharyya, Professor, Sanskrit College, Calcutta:—

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রণীত "কবিতাকোরক" নামক পুস্তকখানি দেখিয়াছি। ইহাতে যদিও সংস্কৃত কবিদের ন্যায়, রস, ভাব, গুণ ও অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, সংস্কৃত শব্দের ও সংস্কৃত ক্রিয়াপদের আড়ম্বর নাই, তথাপি ইহার প্রশংসা করিতে হয়। লেখক বাঙ্গালা কবিতার বাঙ্গালা ভাব ইহাতে কৌশলের সহিত সংস্কৃত ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছেন। সকলেই ইহার প্রশংসা করিতেছেন। ইতি ২০শে ফাল্গুন ১৩০৭ সাল।

From Pandit Kamakhya Nath Tarkavagisa, Professor, Sanskrit College, Calcutta:—

শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়-প্রণীত "কবিতাকোরক" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানি সরল এবং সুললিত ভাষায় রচিত এবং সদুপদেশগর্ভ। ইহা পাঠ

করিলে সুকুমারমতি বালকগণ যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। ইতি তাং ৯ই ফাল্গুন ১৩০৭ সাল।

From Pandit Gaur Gavinda Ray Upadhaya, the renowned author of Gita-Samanvaya-Bhashya &c. —

'কবিতাকোরক'-প্রণেতা মিত্রাক্ষরে কবিতাগুলি নিবদ্ধ করিয়াছেন। সংস্কৃত মিত্রাক্ষরের প্রবর্ত্তনার আমি পক্ষপাতী নহি। মিত্রাক্ষরে ভাবের অব্যাহত গতি অবরুদ্ধ হয়, রচনায় প্রযত্ন-সাপেক্ষতা প্রকাশ পায়, ইহাতে কাব্যশরীরের শোভার ক্ষতি হয়। 'কবিতাকোরক'-প্রণেতার কবিত্ব আছে, রচনাচাতুর্য্য আছে, কিন্তু মিত্রাক্ষরে লিখিতে গেলে যে দোষের সম্ভাবনা, তাহা হইতে আপনাকে তিনি সর্ব্বথা মুক্ত করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তাঁহার রচনা প্রশংসনীয় এবং আশা করি উহা পণ্ডিত-মণ্ডলীতে আদৃত হইবে।

From Babu Jogindra Nath Basu B.A., the renowned biographer of the great Bengali Poet Michael Madhusudan Dutt :—

দেওঘর, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯০০।

আমি মুক্তকণ্ঠে আপনার কবিত্বের প্রশংসা করি। আধুনিক সংস্কৃত-কবিতালেখকদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই বোধ হয় এমন সরল অথচ মধুর কবিতা লিখিতে পারেন। আপনার অনুবাদও অতি সুন্দর হই-

য়াছে। বীণাপাণির প্রদত্ত এই শক্তি জন্মভূমির সেবায় উৎসর্গ করিয়া আপনি ধন্য হউন।

From Pandit Adyanath Nyayabhushan of Assam :—

মহাশয় !

আপনার কবিতাকোরক পুস্তকখানি আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। শ্লোকগুলির রচনা ও ভাব অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে কবিত্বের পরিচয় বিলক্ষণ রহিয়াছে। ১৩০৭। ২৮শে ভাদ্র।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন কাব্যগ্রন্থ মুকুল মূল্য ॥৹ আনা,। বাধাই ॥৵৹ আনা। মোহমুদগার মূল ও পদ্যানুবাদ। মূল্য ／৹ আনা। উভয়পুস্তকেরই ছাপা বাধাই ইত্যাদি খুব ভাল।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"মুকুলে"র কবিতা মধুরভাষায় রচিত ও গম্ভীর ভাবপূর্ণ। "মোহমুদগারে" বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে।"

সুপ্রসিদ্ধ "নব্যভারত" লিখিয়াছেন— * * পুস্তক [মুকুল] পাঠে গ্রন্থকারের কবিতা লিখিবার বিশেষ ক্ষমতার প পাইলাম * * "মোহমুদগারে"র লেখা প্রাঞ্জল এবং স গৃহে গৃহে এই অমূল্য গ্রন্থ প্রচারিত হউক।"

শিলচর "সারস্বতীলাইব্রেরী"তে, "সুরমা" কার্য্যালয়ে ও কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে উভয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।